গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী—৮

বর্ত্তমান জগৎ

প্রথম ভাগ

মিশর

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ,
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ, কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩২১

PUBLISHED BY CHINTAHARAN GOOHA OF THE
GRIHASTHA PUBLISHING HOUSE.
AND
PRINTED BY ASHUTOSH BANERJEE,
THE INDIA PRESS,
24, MIDDLE ROAD, ENTALLY, CALCUTTA.

 [মূল্য এক টাকা আট আনা মাত্র।

নিবেদন।

ডায়েরীর ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। ইতি—

৭ই আগষ্ট,
১৯১৪।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এ,এম্,,

বর্ত্তমান জগৎ

প্রথম অধ্যায়

মিশরের পথে

জাহাজ-জীবন

ভারতবর্ষ অদৃশ্য হইতেছে। বোম্বাই বন্দরের কোলাহল আর শুনা যায় না। অট্টালিকার চূড়াগুলি দেখিতে পাইতেছি না। কেবল মাত্র ভারতের পশ্চিম-প্রাচীর-স্বরূপ পর্ব্বতসমূহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে এই দেওয়ালগুলি কিছুকাল দেখা গেল। পরে তাহাও আর দেখা গেল না। আমরা অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।

আকাশে মেঘ নাই—অথচ বায়ু-মণ্ডলী সম্পূর্ণ নীলবর্ণও নয়! সমুদ্রের গাঢ় নীল রং দেখিয়া পুলকিত হইতে লাগিলাম। সমুদ্রতীর হইতে এই অসীম নীলিমারাশির ধারণা পূর্ব্বে কখনও করিতে পারি নাই।

জাহাজে ভারতবাসীর সংখ্যা কম নয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ—চারি শ্রেণীতেই ভারতবাসী দেখিতে পাইলাম। বাঙ্গালী,

হিন্দুস্থানী, পার্শী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী, মুসলমান—নানা প্রকার ভারত-সন্তানই এই জাহাজের আরোহী। মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ এডেন পর্য্যন্ত যাইবেন—কেহ কেহ পোর্ট সৈয়দে নামিয়া মিশরে যাইবেন। ইহাঁরা প্রায়ই তীর্থ-যাত্রী। আর অন্যান্য সকলে ইউরোপ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন—অধিকাংশই বিলাত পর্য্যন্ত। কেহ ব্যবসায় উপলক্ষ্যে, কেহ স্বাস্থ্যের জন্য, কেহ বা বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে বিলাত যাইতেছেন।

আমাদের প্রথম শ্রেণীর সহযাত্রীদিগের মধ্যে ভারতের একজন সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত অন্যতম। তিনি বাঙ্গালী—বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশে সুইজর্ল্যাণ্ডে যাইতেছেন। সেখানে বসিয়া কিছু সাহিত্য-চর্চ্চা করিবেন ইচ্ছা আছে। তাহার সঙ্গে কয়েক বাক্স পুস্তক চলিতেছে আর একজন বোম্বাইয়ের ব্যারিষ্টার—বিখ্যাত পার্শীর সন্তান। বোম্বাই সহরে ইহাঁরা ব্যবসায়-শিক্ষালয়ের প্রবর্ত্তক। ইনি সর্ব্বসমেত ৮৯ বার ইউরোপে যাওয়া আসা করিয়াছেন। আর একটি পার্শী পরিবার আমাদের সঙ্গে চলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ টাটা-প্রতিষ্ঠিত লৌহ কারখানার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক তাঁহার ভ্রাতার সন্তান সন্ততিকে কলেজে ভর্ত্তি করিবার জন্য বিলাতে লইয়া যাইতেছেন। বিলাতে কয়েক দিন থাকিয়া ইনি আমেরিকা, জাপান, ম্যানিলা, ফিলিপাইন হইয়া ঘরে ফিরিবেন। শাকচীর কারখানায় তৈয়ারী লৌহ ও ইস্পাত সর্ব্বদেশে প্রচলিত করিবার জন্য এ যাত্রায় তিনি বাহির হইয়াছেন।

প্রকাণ্ড জাহাজ কিন্তু চৌড়ায় আমাদের পদ্মার "য়্যালিগেটর," "ক্রোকোডাইল," "কণ্ডার" প্রভৃতি ষ্টীমার অপেক্ষা বোধ হয় বেশী বড় নয়, লম্বায় প্রায় ইহাদের পাঁচ খানার সমান। জাহাজের মালিক ফরাসী কোম্পানী—কুলী, খালাশী, ইত্যাদি সকলেই ফরাসী ভাষায় কথা বলে। দুই চারিটা ইংরাজী কথা ইহাদের কাহারও কাহারও

বুঝিবার শক্তি আছে। প্রায় সকলেই ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ। বড় বড় কর্ম্মচারীদের মধ্যে ২।১ জন ইংরাজী বলিতে ও বুঝিতে পারে। বাঙ্গালী যতটুকু হিন্দী জানে বা বুঝে ফরাসী ততটুকু ইংরাজী জানে না বা বুঝে না। আবার তথাকথিত শিক্ষিত ইংরাজেরাও ফরাসী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ! ভাষা হিসাবে ফরাসী জাহাজে ভারতবাসীর যে অসুবিধা, ইংরাজদিগেরও সেইরূপই অসুবিধা। খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে ভাষার জন্য ভারতবাসী ও ইংরাজ উভয়েরই-সমান গোলযোগ। কোনরূপে ইসারায় ইঙ্গিতে আমরা কাজ চালাইয়া লইতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গে যে বাঙ্গালী পণ্ডিত রহিয়াছেন তিনি ফরাসী সাহিত্যের প্রাচীন আধুনিক অনেক গ্রন্থই পড়িয়া যাইতে পারেন এবং সেগুলি সহজেই বুঝিতেও পারেন। কিন্তু ফরাসী ভাষার উচ্চারণ-গুলি তাঁহার 'রপ্ত' হয় নাই—কাজেই কথা বলিতে তিনি সম্পূর্ণ অপারগ।

জাহাজের খালাশীগিরি করিতে বিশেষ কুস্তীগিরি পালোয়ান হওয়ার আবশ্যকতা নাই। ফরাসী নাবিকদিগকে দেখিয়া ধারণা হইল যে, যে কোন লোকই এ সব কাজ করিতে পারে। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী ইত্যাদি যে কোন জাতির পক্ষেই জাহাজে চাকরী করা অসম্ভব নয়। ফরাসী খালাসীদের মধ্যে খুব হৃষ্ট পুষ্ট, গোলগাল, লম্বাচৌড়া লোক প্রায়ই নাই। অধিকাংশই বেঁটে খাট, পাতলা রোগা। ভারতবাসীর শারীরিক দুর্ব্বলতা যতই হউক না কেন, সে বিনা কষ্টে জাহাজের কাজ করিতে পারে। সুযোগ পাইলে বোধ হয় এখনও সম্ভব। তবে বহুকালের অনভ্যাসে এখন আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াছি। আর বুলি শিখিয়াছি যে, চাটগেঁয়ে মুসলমানদের মত শরীর না থাকিলে কি অত কষ্টকর কার্য্য করা যায়? বস্তুতঃ জাহাজের নাবিক হইবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি সাধারণ বাঙ্গালীর আছে।

আর একটা ভুল বিশ্বাস আমাদের মাথায় ঢুকিয়াছে। কথায় কথায় আমরা শুনিতাম—ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত শৃঙ্খলাপ্রিয়,—তাহারা বেশ প্রণালীবদ্ধরূপে কাজ করে। সত্য কথা,—ইহারা ভারতবাসীর মতই মানুষ—কুলীগিরি, খালাসীগিরি, কেরাণীগিরি—ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর কাজগুলি ইহারা আমাদের লোকজন অপেক্ষা বিশেষ ভাল রকম সমাধা করে না। অসাধুতা, অসত্যপ্রিয়তা, অবাধ্যতা, ইত্যাদি সকল দোষই ইহাদের আছে। ফাঁকী দিতে পারিলে কেহ ছাড়ে না—এবং ঘুস ও বক্‌শিষ পাইলে ইহারা করিতে পারে না এমন কাজ নাই।

জাহাজ চলিতেছে—পদ্মাবক্ষে ষ্টীমার যেরূপ চলে প্রায় সেইরূপই চলিতেছে। বিশেষত্ব কিছুই বুঝা যাইতেছে না। ঢেউগুলি ততবেশী ভীতিজনক নয়। পদ্মায় আরও বড় বড় ঢেউ দেখা যায়। জাহাজ বেশী ওলট পালট হইতেছে না। বোধ হয় প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা যে অংশে থাকে সেই অংশে ঢেউএর ফল বেশী ভোগ করিতে হয় না। সম্মুখ ভাগ এবং পশ্চাৎ ভাগ সর্ব্বদা উঠে বসে—ইহাকে পিচ্ "pitch" বলে। ইহার প্রভাবেই লোকের গা বোমি বোমি করে—sea-sickness বা সমুদ্র-পীড়া হয়। কিন্তু মধ্যভাগ প্রায় স্থির থাকে—এই অংশেই প্রথম শ্রেণীর কাম্‌রাগুলি এবং বেড়াইবার ও বসিবার স্থান। এজন্য এখানকার লোকদিগের কষ্ট বেশী হয় না। জাহাজ কেবল সামান্য মাত্র rolling বা "এ পাশ ও পাশ" নড়া ভোগ করিতে হয়। বড় বড় নৌকায় চড়িয়া নদীতে গেলে এই গতি বুঝিতে পারা যায়।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে—নৈশভোজনের পর সকলে যার যার কামরায় আশ্রয় লইলেন। ঘোরতর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া জাহাজ স্বীয় পথে চলিতে লাগিল—জলের কল কল ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বিদেশ যাত্রার সরঞ্জাম

ব্যবসায়ী ব্যারিষ্টার মহাশয়ের নিকট বিলাতী, ফরাসী ও জার্ম্মাণ জাহাজ কোম্পানীগুলির অভদ্রতাচরণের গল্প শুনিলাম। কলিকাতা এবং বোম্বাই প্রভৃতি নগরে যে সকল ব্যাংকিং কোম্পানী বিদেশ যাত্রীদিগের যাতায়াতের ব্যবস্থা করিবার ভার লয় তাহারা "স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ।"

কুক্ কোম্পানী, গ্রিণ্ড্‌লে কোম্পানী, কিং কোম্পানী—প্রায় সকল ব্যাঙ্কওয়ালারাই অসাধু। ভারতবাসীদিগের সঙ্গে ইহারা কখনই ভাল ব্যবহার করে না—বেশী পয়সা আদায় করিয়া খারাপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইহাদের সাহায্য না লইয়াই টিকেট কেনা এবং জাহাজ বা রেল ভাড়া করা ভাল। তবে টাকা জমা রাখিবার জন্য কোন না কোন ব্যাঙ্কের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। না লইলেও ক্ষতি নাই।

দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলাম—জাহাজে পোষাক পরিচ্ছদের কোন বিশেষ আয়োজন না করিলেও চলে। পার্শীরা স্বজাতীয় পোষাকে চলিয়াছেন—হিন্দুস্থানীরা গলার বোতাম লাগান কোট ও পায়জামা ব্যবহার করিতেছেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতটি চোগা চাপকান ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকেন না। মুসলমানেরা আলখাল্লা পরিয়াই আছেন। কাহারও মাথায় পাগড়ী, কাহারও মাথায় গুজরাতী টুপি ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী—কোন শ্রেণীতেই পোষাক পরিচ্ছদের জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেইরূপ করিতে পারে।

কামরার ভিতরে দিনে থাকা অসম্ভব—অত্যন্ত গরম—অতি সামান্য মাত্র বাতাস আসে। প্রথম শ্রেণীর কামরাও এবিষয়ে বিশেষ ভাল নয়

কেবল জাহাজের মধ্য খানে অবস্থিত হওয়ায় প্রথম শ্রেণীর লোকেরা 'পিচ্'—নড়া কম সহ্য করে। অধিকাংশ সময়ই জাহাজের দোতলার বা তেতালার 'ডেকে'র উপর বসিয়া দাঁড়াইয়া বা বেড়াইয়া কাটাইতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগেরও সেই অবস্থা। তৃতীয় শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা এ হিসাবে বড় বেশী কষ্ট ভোগ করে না। তবে জাহাজের যে অংশে তাহারা স্থান পায় সে অংশটায় 'পিচ্' নড়া খুব বেশী। অর্থাৎ জাহাজ সর্ব্বদা উঠিতে ও নামিতে থাকে। এজন্য ওদিকে গা বোমি বোমি কিছু বেশী করে।

ভারতীয় ছাত্রদের চতুর্থ শ্রেণীর আরোহী হওয়াই ভাল। ইহাদিগকে "ডেক্" যাত্রী বলে। খোলা পাটাতনের উপর ইহাদিগকে থাকিতে হয়—মাথার উপর তাঁবু দিয়া ঢাকা—প্রথম শ্রেণীর ডেকের উপরেও এইরূপই তাঁবু।

চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রীরা সর্ব্বদা হাওয়া খাইতে পায়। এই হাওয়া খাইবার জন্যই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরাও নিজ কামরা ছাড়িয়া সর্ব্বদা ডেকের উপরে পায়চারি করেন বা বসিয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণীর অনেক যাত্রী রাত্রিকালে ডেকের উপরেই বিছানা আনাইয়া শুইয়াও থাকেন। সুতরাং চতুর্থ শ্রেণীর আরোহী হওয়া কোন অংশেই খারাপ নয়। সমুদ্রের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে করিতে ১৫।২০ দিনের মধ্যে স্বাস্থ্যের উন্নতিও যথেষ্ট হইতে পারে।

চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে নিজে রাঁধিয়া খাইতে পারে। ঘর হইতে চাউল, ডাইল, তরকারী, শাকশব্জী, ফলমূল ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে আনিলেই হইল। আমার বিশ্বাস এইরূপে খরচ অর্দ্ধেক কমান যায়। ভারতবর্ষের অনেক ছাত্র এ সকল কথা জানেন না। জানা থাকিলে তাঁহারা অল্পব্যয়ে বিদেশ গমনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া

লইতে পারিতেন। আমাদের ব্যারিষ্টার বন্ধুটি বলিলেন, তিনি ১৫বৎসর পূর্ব্বে প্রথম বিলাতে যাইবার সময়ে স্বহস্তে রন্ধনাদির সরঞ্জাম লইয়া জাহাজে চড়িয়াছিলেন। তাঁহার পিতার যথেষ্ট অর্থ ছিল—তথাপি তিনি তাঁহার পুত্রকে ছাত্রোচিত কষ্টভোগের ভিতর দিয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। আজ এই পুত্র নানা প্রকার অভিজ্ঞতার ফলে কষ্ট-সহিষ্ণু পরিশ্রমী ও ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

জাহাজে কাল রংএর একটা কোট, এবং যে কোন রংএর একটা পায়জামা থাকিলেই চলিয়া যায়। চারিটা শার্ট, চারিটা কলার এবং কয়েকটা রুমাল ও গেঞ্জি সঙ্গে থাকা আবশ্যক। বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিতে আর বেশী কিছু লাগে না বুঝিতে পারা গেল। তবে পোষাকটা প্রথম হইতেই শীত কাটাইবার উপযুক্ত গরম থাকিলেই ভাল হয়। কারণ ইউরোপে পৌছিবার পরক্ষণ হইতে শীত লাগিতে থাকে। ডেক্ যাত্রীদের সঙ্গে দুইটা কম্বল ও একটা ছোট বালিশ দরকার। সুতরাং ছোট একটা বাক্সের ভিতর সমস্ত আসবাবই লওয়া যাইতে পারে। আর একটা হ্যাণ্ডব্যাগের ভিতর তোয়ালে, সাবান, কামাইবার সরঞ্জাম ও দুএকখানা বই লইলেই কাজ চলিয়া যায়। তারপর, ছাত্রেরা যে দেশে যাইতেছে সেই খানে পৌঁছিয়া তথাকার ফ্যাশন মত পোষাক তৈয়ারী করিয়া লইতে পারে।

আজকালকার বিজ্ঞানসেবী, সাহিত্যসেবী, সম্পাদক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি ব্যক্তিগণের মধ্যে দলাদলি রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরশ্রী-কাতরতার ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই দ্বন্দ্ব প্রায়ই যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত। কে বড়, কে ছোট, কাহার সম্মান বেশী, কাহার সম্মান কম,—ইত্যাদি বিষয় লইয়াই আজকালকার সমিতি গঠন, ও দলপ্রতিষ্ঠা। ইহাতে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। এই স্তর পার না হইয়া গেলে নিরপেক্ষভাবে দলগঠন সম্ভবপর হইবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা কীর্ত্তির লোভে সাহিত্যসেবায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোক আকৃষ্ট করিতে পারিতেছি। এই সকল দিকে কার্য্যের পরিমাণও আজকাল নিন্দনীয় নয়। ক্রমশঃ যখন এক এক বিভাগে বহুলোকের আবির্ভাব হইবে, তখন ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর থাকিবে না, কারণ ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেই তখন নিজ নিজ যশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন। তখনকার সমিতিগুলি কোন ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন চিন্তাপ্রণালী ও কর্ম্মপ্রণালী প্রচারের জন্যই স্থাপিত হইবে।

কাব্যে জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা কিরূপে প্রচারিত হইতে পারে এ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবরের সঙ্গে আলোচনা হইল। জার্ম্মাণ কবি হাউপ্টমান, সুইডেনের ইবসেন এবং রুশ-সাহিত্যের কথা উঠিল। ইনি বলিলেন, "সত্যই, এ হিসাবে রুশ-সাহিত্য সর্ব্বপ্রধান। সুইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্কের আধুনিক সাহিত্যেও জনসাধারণের বাণী বেশ শুনিতে পাইবে। এই সকল সাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচিত হওয়া আবশ্যক।"

আজ গুড্‌ফ্রাইডে—জাহাজে খ্রীষ্টান নাবিক বা আরোহী কেহই কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেন না।

মানব ও প্রকৃতি

কাল পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছিল। রাত্রে জাহাজের সকল লোকই আকাশের শোভা দেখিতে লাগিল। ফরাসী, ইংরাজ, জাপানী, পার্শী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী সকলেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দাস। অসংখ্য জাতিগত বৈচিত্র্যের মধ্যেও সাধারণ মানবতার ঐক্য সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

সমুদ্র প্রায় একখানা সমতল নীলবস্ত্রের মত পড়িয়া রহিয়াছে। জাহাজ জল কাটিয়া দুই একটা মাত্র তরঙ্গ রেখা সৃষ্টি করিতেছে। এই রেখার উপর অসংখ্য প্রতিফলিত চাঁদ কতকগুলি বিদ্যুৎ-প্রদীপের মালার মত দেখা গেল।

সমুদ্রে জলের রং এক এক সময়ে এক প্রকার দেখা যায়। কখনও গাঢ় নীল, কখনও ধূসর, কখনও কাল। জাহাজে বসিয়া দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে নীল রং বুঝিতে পারা যায় না। সূর্য্য কিরণের প্রভাবে জলরাশি রজতবর্ণ অথবা চক্‌চকে মাত্র বোধ হয়। নিকটের জলরাশির বর্ণই নীল। তবে এই নীলিমারও নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই।

আকাশ ও সমুদ্র নীলবর্ণ কেন? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও পারেন নাই। বায়ুমণ্ডলের ও জলমণ্ডলের রং বোধ হয় একই কারণে নীল আভা ধারণ করে। পুঞ্জীকৃত ঘনীভূত স্তূপ বলিয়া জলরাশি ও বায়ুরাশির রং হয় ত এইরূপ। তাহার একটা পরিচয় এই যে, সমুদ্র-তরঙ্গের উপরকার ফেনসমূহ ও জলবুদ্‌বুদগুলি সর্ব্বদাই শ্বেতবর্ণ। স্তূপের প্রভাব ছাড়া অন্য কারণেও জলরাশির রং গঠিত হয়। বায়ুমণ্ডলের বর্ণ জলমণ্ডলের বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। আকাশের মেঘের রংও সমুদ্রের রংএর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া

থাকে। তাহার উপর সূর্য্যরশ্মি দ্বারা জগতের সকল রংই নিয়ন্ত্রিত হয়। সমুদ্রজলেও সূর্য্যরশ্মি নানা রংএর সৃষ্টি করে। কিন্তু মোটের উপর, সমুদ্রের জল যে নীলবর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সৃষ্টিকালাবধিই সমুদ্রের জল লবণাক্ত। নদীর জল পাহাড় হইতে বাহির হয়। পৃথিবীর নিম্ন দেশে জল প্রবেশ করিয়া ঝরণা দিয়া উপরে উঠে। সকল নদীই এইরূপ ঝরণা দ্বারা পুষ্ট। বরফ গলিয়াও অনেক নদীর জল সৃষ্টি করে। কাজেই সাধারণতঃ নদীর জলে লবণাক্ত ও কটু রস পাওয়া যায় না। তবে নদী গর্ভের মৃত্তিকার প্রভাবে স্থানে স্থানে নদীজলের স্বাদ বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু সমুদ্রের জল এইরূপ ঝরণায় বা বরফে উৎপন্ন হয় নাই। জগৎ যখন গঠিত হইয়াছিল তখনই কতক অংশ স্থল এবং কতক অংশ জল রূপে পরিণত হইয়াছিল। স্থলভাগের উপকরণ যেমন নানা প্রকার ধাতু, লবণ, ক্ষার ইত্যাদি, জলভাগের উপকরণও সেইরূপ বিচিত্র ধাতু, লবণ, ক্ষার ইত্যাদি। পৃথিবীর মৃত্তিকা যে উপাদানে গঠিত, সমুদ্রের জলরাশিও প্রথম হইতেই সেইরূপ উপাদানে গঠিত। স্থলভাগের মাটি, পাথর, কাদা, ধূলা ইত্যাদি মুখে দিলে নানাপ্রকার স্বাদ অনুভব করা যায়। সমুদ্রের জলেও সেই কারণেই কটু তিক্ত কষায় লবণ ইত্যাদি নানা রসের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে জলের মধ্যে সকল উপকরণ গলিয়া মিশিয়া আছে—এজন্য সামান্য গণ্ডূষেই ইহার স্বাদ বুঝিতে পারা যায়—সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রায় একরূপই স্বাদ পাইয়া থাকি। কিন্তু ভূভাগের মৃত্তিকার নানা স্থানে নানা স্বাদের উপলব্ধি হয়। কোথায় বা একপ্রকার ধাতু লবণাদির প্রভাব, অন্যত্র আর এক প্রকার উপাদানের স্বাদ ইত্যাদি।

যে জিনিষকে মাপিয়া গণিয়া ওজন করিয়া ফেলা যায় তাহার সীমা ও গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়ে। জাহাজে থাকিতে থাকিতে সমুদ্র আর অসীম অনন্ত ইত্যাদি বোধ হইতেছে না। যেন একটা বড় নদী বা পুষ্করিণীর উপর দিয়া নৌকা চালাইয়া যাইতেছি। সমুদ্র আমাদের এতই স্ববশ হইয়াছে যে ইহার গাম্ভীর্য্য, উদারতা, বিস্তৃতি ইত্যাদি কিছুই এখন রহস্যজনক মনে হয় না। প্রকৃতিকে বাঁধাবাঁধির মধ্যে আনিয়া কাবু করিতে পারিলে মানুষ আর ইহাকে ভয় করিবে কেন? সম্মান করিবে কেন? পূজা করিবে কেন? জগতের শক্তিগুলিকে এই উপায়ে মানুষ একে একে নিজ করতলগত করিতেছে—নিজ জীবনের নানাবিধ কাজে লাগাইতেছে। এইগুলি ব্যবহার করিয়া নিজ জীবনের অভাবমোচন করিতেছে। প্রকৃতির উপর মানবের আধিপত্য বিস্তারই সভ্যতার ইতিহাসের একমাত্র তথ্য।

মানুষ ত বিশ্বশক্তিগুলি ক্রমশঃ দখল করিয়া ফেলিতেছে। প্রকৃতি তাহার বুদ্ধিশক্তির নিকট দাসের ন্যায় আজ্ঞা পালন করিতেছে। তাহা হইলে মানুষ নিজকে খর্ব্ব করিবে কাহার নিকট?—মাথা নোয়াইতে শিখিবে কাহার নিকট? পূজা করিবে ভক্তি করিবে কাহাকে? মানুষ সংসারের কিছুই ত নিজ অপেক্ষা মহত্তর, বিশালতর, বিস্তৃততর দেখিতে পায় না! তাহার দৃষ্টিতে সবই যে ক্ষুদ্র, হীন, নীচ, পঙ্গু।

আজ সংসারের যে জিনিষকে তুমি বড় বা অসীম মনে করিতেছ, কাল তাহাই তোমার চোখে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বোধ হইবে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তুমি যাহার নিকট মাথা অবনত করিয়াছিলে আজ সেই সকল পদার্থ তোমার নিকট একেবারেই শ্রদ্ধার পাত্র নয়। আজ যে বস্তু দেখিয়া তুমি ভীত সন্ত্রস্ত হইতেছ কয়েক বৎসরের সাধনায়ই হয় ত তাহা তোমার করামলকবৎ খেলার সামগ্রীতে পরিণত হইবে।

তোমার বিদ্যা, তোমার বুদ্ধি, তোমার দৃষ্টি, তোমার শ্রুতি, তোমার সকল ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা যে বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রতিদিনই যে নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার সাধিত হইয়া তোমার ক্ষমতাকে অসংখ্য-গুণ বাড়াইয়া দিতেছে। তাহা হইলে মানুষ কি ভবিষ্যতে ভক্তি শ্রদ্ধা পূজা ভালবাসা সবই বিসর্জ্জন দিবে? মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি কি মানুষকে পশু করিয়া ফেলিবে?

সমস্যা বড় কঠিন। মানবের অন্তর্জ্জগৎ যদি অসীম না হয় তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির আর উপায় নাই। কারণ জগতের পদার্থ মাত্রই একদিন না একদিন সসীম, শান্ত, গণ্ডীবদ্ধ প্রমাণিত হইয়া পড়িবে। অনেক বাহ্যবস্তুকেই পূর্ব্বে অসীম মনে করিতাম—এক্ষণে সেগুলিকে সসীম বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছি।

আমাদের হৃদয়কে যদি পূজার পাত্র ও সম্মানের বস্তু বিবেচনা না করি তাহা হইলে মানুষ প্রকৃতির প্রভু হইতে হইতে জগতের ঘৃণ্য জীবে পরিণত হইবে, বাহিরের জিনিষকে সম্মান করা চলে না—মানুষের অন্তরই, নিজের আত্মাই ভক্তির উপযুক্ত পদার্থ। অন্তরাত্মাকে পূজা করিতে শিখিলে তাহা হইতে অনন্ত ধারায় শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, করুণা, বাৎসল্য ইত্যাদি নিঃসৃত হইবে। সেই ধারাসমূহই জগতের সসীম ক্ষুদ্র বস্তুগুলিকে ধৌত করিয়া আমাদিগের নিকট পূজনীয়, মহনীয়, বরণীয় করিয়া তুলিবে। অতি নগণ্য সামান্য, অকিঞ্চিৎকর পদার্থও হৃদয়ের প্রভাবে আমাদের পূজার সামগ্রীতে ও পূজনীয় দেবতায় পরিণত হইবে। তখন আমরা ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ দেখিতে পাইব—নগণ্যের মধ্যে বিরাটকে উপলব্ধি করিতে পারিব—সসীমের মধ্যে অসীমকে লাভ করিব।

জ্ঞানে আমরা যতই বড় হইতে থাকি না কেন, ভক্তি দ্বারা আমরা নিজকে সর্ব্বত্র ছোট করিতে শিখিব। হৃদয়কে বড় করিতে পারিলেই

কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী তরু লতা সকলের মধ্যে মহত্ত্ব দেখিতে পারিব। আত্মার উদারতা জন্মিলেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ পত্রে, সচেতন অচেতন সকল বস্তুতে আমরা অসীম অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখিতে সমর্থ হইব। তখন সসীম সমুদ্র দেখিয়াও অসীমের ধারণা করিতে সঙ্কোচবোধ করিব না। জীবনের অকিঞ্চিৎকর ঘটনাবলীর মহিমাও আমাদিগকে ভূমানন্দে পুলকিত করিবে—সমাজ, সংসার পরিবারের নগণ্য তথ্যেও আমাদের অনন্তবোধ জাগরূক থাকিবে। সাধারণ, সামান্য, মামুলি জগৎটাই চিররহস্যপূর্ণ, উদারতাময়, বিপুল ও গরীয়ান্ মনে হইবে। হৃদয়ের মহত্ত্বে এবং আত্মার অসীমতায় জগতের ক্ষুদ্রত্বগুলির অভ্যন্তরে বিরাট শক্তির পরিচয় পাইব।

(ক্ষুদ্রকে বড় ভাবে দেখিতে না পারিলে মানুষের পক্ষে শান্তি পাওয়া কঠিন। নিজের উদারতা দ্বারাই বিশ্বসংসারকে মহত্ত্বপূর্ণ ও পূজনীয় করিয়া তোলা মানুষের স্বধর্ম। এই কারণেই মানুষ তাহার নিজ হাতে গড়া জিনিষের নিকটও বশ্যতা স্বীকার করে। এই কারণেই তাহার পশু পূজা, তরুসেবা, দরিদ্র-সম্বর্দ্ধনা। মানুষের পূজনীয় দেবদেবীগুলি তাহার স্বকীয় কল্পনা, ভাবুকতা ও হৃদয়বত্তার পরিচায়ক।)

জাহাজ প্রতিদিন প্রায় ৩৪০ মাইল বেগে চলিতেছে। প্রত্যহ ১২টার সময়ে একটা মানচিত্রে কাপ্তেনের লোক আসিয়া দাগ দিয়া যায়। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি ২৪ ঘণ্টায় জাহাজ কতখানি আসিল। প্রথম দিন ১২টার সময়ে আমরা ঠিক সিন্ধুদেশের দক্ষিণে ছিলাম—পরদিন বেলুচিস্থান ছাড়াইয়া প্রায় আরবদেশের পূর্ব্বকোণের দক্ষিণ আসিয়াছিলাম। আজ আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে চলিতেছি। সমুদ্রের কিনারা দিয়া এক্ষণে চলিতেছি। অবশ্য এখনও ভূমি দেখা যায় না।

বোম্বাই হইতে এডেনের পথ সোজা। জাহাজ কোন স্থানে বাঁকা

পথে চলে না। রাস্তা বাঁধা আছে। প্রায় ১৫।২০ মাইল বিস্তৃত মাপা পথের ভিতর দিয়া জাহাজ চলে। ঝড় বাতাস প্রবল না হইলে এই পথের বাহিরে গিয়া জাহাজ কখনও পড়ে না। যদি কখনও দৈবক্রমে বাঁকা পথে চলিয়া যায় তাহা হইলে পরদিন ১২টার সময়ে যেখানে উপস্থিত হইবার কথা সেখানে জাহাজ আসিতে পারে না। কম্পাসাদি যন্ত্রের সাহায্যে ভুল সংশোধন করিয়া লওয়া হয়।

এই সোজা পথ বহু প্রাচীনকাল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে আজকার কথা নয়। ৪৫।৪৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীক নাবিক নিয়ার্কাস ভারত-মহাসাগরের উপর প্রবাহিত "মনসুন বায়ুর" গতি আবিষ্কার করেন। তখন হইতে ভারতীয় ও বিদেশীয় নাবিকেরা নির্ভয়ে মহাসাগরের ভিতর দিয়া পোত চালাইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বতন যুগের গ্রীক, পারসীক, হিন্দু, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় ও অন্যান্য নাবিকেরা আরব, পারস্য, বিলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশের কূলে কূলে নৌকা চালাইত। তাহারা কূল হইতে বেশী দূরে আসিতে সাহস করিতে পারে নাই। কিন্তু বাতাসের গতি আবিষ্কৃত হইবামাত্র তাহাদের ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

জাপানী ও পার্শী সহযাত্রী

বোম্বাইএর একজন জাপানী ব্যবসাদার এই জাহাজে আছেন। তিনি তূলার কারবার করেন। প্রায় ১৪।১৫ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ। ব্যবসায় উপলক্ষ্যে ইনি পূর্ব্বে চারিবার ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এবার মিশরে কয়েক দিন কাটাইয়া ইতালি, বিলাত ও রুশিয়া হইয়া জাপানে ফিরিবেন।

জাপানের এই ব্যবসায়ী মহাশয় স্বদেশের সাহিত্য, চিত্র, দর্শন ইত্যাদির কোন সংবাদ রাখেন না। ইনি শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। লেখা পড়া শেষ করিয়া বাণিজ্যে লাগিয়াছেন। জাপানের বড বড় বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতের নাম পর্য্যন্ত মনে রাখিতে ইনি চেষ্টা করেন না। সকল দেশেই কৃষি শিল্প ব্যবসায়ের ধুরন্ধরেরা লেখক, অধ্যাপক, শিক্ষাপ্রচারকদিগকে কিছু "অকর্ম্মণ্য" মনে করেন। আমাদের এই জাপানী বন্ধুটির মনোভাবও সেইরূপ।

এ কয়দিন ভারতমহাসাগরের মধ্যে মাছ, কুমীর, হাঙ্গর, তিমি বা অন্য কোন সমুদ্রজীব দেখিতে পাইলাম না। কেবল মাঝে মাঝে ২।১টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য লাফাইয়া লাফাইয়া উড়িয়া যায়। ইহাদের আকার ছোট পুঁটি মাছের মত।

ভারতমহাসাগরে দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে বাতাস বহিয়া থাকে। আমরা সোজা পশ্চিম চলিতেছি। জাহাজের ধোঁয়া নল হইতে বাহির হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যাইতেছে। সন্ধ্যার পর হইতে ডেকে বাতাস

বেশ ঠাণ্ডা লাগে। কিন্তু কামরার মধ্যে বাতাস গরমই থাকে। এ কয়দিন আকাশে মেঘ যৎসামান্য ছিল। মাঝে মাঝে রাত্রে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়িয়াছে। কিন্তু আকাশ কখনও সুনীল দেখি নাই।

তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে যে সকল ইউরোপীয় যাত্রী রহিয়াছে তাহারা নিতান্তই নিম্নজাতীয় এবং চরিত্রহীন। দারিদ্র্যের প্রভাব মানুষকে কিরূপ পশুভাবাপন্ন করে তাহা পাশ্চাত্যদেশের লোকসমাজ দেখিলে বুঝা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের দরিদ্রসমাজ কি এত অবনত, ঘৃণ্য জীবন যাপন করে?

বাঙ্গালাদেশের তৃতীয় শ্রেণীর ষ্টীমার যাত্রীদের যেরূপ সুবিধা অসুবিধা জাহাজের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর আরোহীদিগের সুবিধা ও অসুবিধা প্রায় তদ্রূপ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হিসাবে জাহাজের ঐ ভাগটা বিশেষ খারাপ নয়। তারপর পায়খানা ইত্যাদি সম্বন্ধেও ষ্টীমারে ও জাহাজে কোন প্রভেদ নাই। একটা স্নান করিবার জায়গা এবং একটা মাত্র পায়খানা,— অথচ লোক প্রায় ৫০।৬০ জন। এই জন্য কিছু কষ্টভোগ করিতে হয়।

ছাত্র-জীবনে এই কষ্ট সহ্য করা ভালই। আমাদের ছাত্রদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর আরোহী হওয়াই আবশ্যক। বিশেষতঃ গত ৭।৮ বৎসরের ভিতর বাঙ্গালা দেশ হইতে যত ছাত্র জাপান ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গিয়াছে তাহারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহারা ব্যারিষ্টারী শিখিবার জন্য নিজ পয়সায় বিলাত যায় তাহাদের কথা বলিতেছি না। যাহারা দেশীয় ধনবান্‌দিগের অর্থ-সাহায্যে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান বা ব্যবসায় শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরিত হয় তাহাদের কথা বলিতেছি। ইহারা দেশে তৃতীয় শ্রেণীর রেলে ষ্টীমারে যাতায়াত করিয়া থাকে। সকল প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে ইহারা অভ্যস্ত। সুতরাং বিদেশ গমনের সময়েও ইহাদের 'ডেক' প্যাসেঞ্জার বা তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী হওয়াই উচিত।

আমাদের সঙ্গে কয়েকজন পার্শী আছেন। ইহাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম—ইহাঁরা কত ফাঁকা ফাঁপা জীবন যাপন করেন। স্বদেশ বলিয়া কোন পদার্থ ইহাঁদের চিন্তার মধ্যে স্থান পায় না। অতীত-গৌরব ইহাদের চিত্তে কোন আন্দোলন সৃষ্টি করে না। নিজেদের প্রাচীন সাহিত্য বা ধর্ম্ম ইহাঁরা জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করেন না। ভারতবর্ষের হিন্দুরা স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা বা আন্দোলন করেন সে গুলিকে ইহাঁরা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। অথচ আমরা যাঁহাদের সঙ্গে চলিতেছি তাঁহারা অতি উচ্চবংশের পার্শী—ধনবান্ ও শিক্ষিত। উচ্চ শিক্ষার জন্য পুরুষ ও রমনীগণ বিলাত যাইতেছেন। পার্শীরা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের কোন অভাব মোচন করিবে কি না সন্দেহ। ইহারা নিজেদের ভবিষ্যৎও কোন বিশেষ লক্ষ্য অনুসারে গঠিত করিবে কি না সন্দেহ। ইহারা টাকা পয়সার চর্চ্চা করিয়াই বোধ হয় জগতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবে—ইহারা সংসারের উচ্চ পদস্থ "নোমাড্" বা চিরবিচরণ-শীল জাতি। আরব বেদুইনেরা অসভ্য ও অশিক্ষিত—পার্শীরা শিক্ষিত, ধনী ও অতীত সভ্যতা-সম্পদের অধিকারী। এই যা প্রভেদ—কিন্তু জাতীয়তা, স্বদেশবাৎসল্য, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ইহারা উভয়েই নিতান্ত নাবালক।

ভারতমহাসাগর ছাড়াইয়া এডেন উপসাগরে পড়িয়াছি। আজ দিনরাত আফ্রিকা ও আরবের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া চলিতেছি। বিস্তৃতি প্রায় ১০০—৫০ মাইল হইবে।

এ কয়দিন দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ হইতে বাতাস বহিতেছিল। আজ সোজা দক্ষিণ হইতে বাতাস আসিতেছে। এ বাতাস ভারত মহাসাগরের বাতাস নয়—আফ্রিকা মরুভূমিতে উৎপন্ন। আজ অন্যান্য দিন অপেক্ষা বেশ গরম বোধ করিতেছি।

এখনও ভূমি দেখা যায় না। মাঝে মাঝে পাখীর ঝাঁক দেখিতে পাই। এগুলি আফ্রিকার দিক হইতে আরবের কূলে উড়িয়া যাইতেছে। দূর হইতে আরবের দুএকটা ছোট ছোট পাহাড় দেখিতে পাইলাম।

এ কয়দিন সময়ে সময়ে সমুদ্রের উপর একটা লাল পদার্থ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছি। এগুলি বোধ হয় জীবন্ত জিনিষ—কোন প্রকার সামুদ্রিক উদ্ভিদ্। লোহিতসাগর হইতে বোধ হয় ভাসিয়া আসে। একজন ইংরাজ বলিলেন, লোহিতসাগরে এগুলি কিছু বেশী দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই কারণে লোহিতসাগরের নামকরণ হইয়াছে।

এডেন

পাশ্চাত্যদের মধ্যে এই জাহাজে ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, জার্ম্মাণ, ইংরাজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি নানা জাতীয় লোক আমাদের সঙ্গী। রোজ রাত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকের উপর ইহারা স্ত্রীপুরুষে নাচানাচি করে। নাচের বিশেষত্ব কিছু নাই সাধারণতঃ ইহারা যেরূপ করিয়া থাকে জাহাজেও তাহাই করিতেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটা অর্গ্যান আছে—তাহার বাজনা অনুসারে ইহারা নাচে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে অর্গ্যান নাই—কিন্তু আরোহীরা অন্ধকারে বিনা বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যেই নাচ গান করে। প্রথম শ্রেণীতে একটা সঙ্গীত গৃহ আছে। সন্ধ্যার পর কোন কোন পুরুষ বা রমণীকে অর্গ্যান বাজাইতে দেখি—কিন্তু নাচের ধুম এখানে নাই। কেহ কেহ বাজনার সঙ্গে গান করেন মাত্র।

পাশ্চাত্য আরোহীরা পরস্পর আলাপ পরিচয় খুব কমই করেন। খুব জোর ইংরাজ ইংরাজের সঙ্গে, ফরাসী ফরাসীর সঙ্গে ইত্যাদি। বিশেষভাবে মিলিয়া মিশিয়া যাওয়া ইহাদের অভ্যাস নয় মনে হইতেছে। এতদিন একসঙ্গে থাকিয়াও ইহাঁরা নূতন নূতন বন্ধু করিয়া লইতে পারেন নাই। দুই একজন মাত্র কথাবার্ত্তার সঙ্গী হইয়া দিন কাটাইতেছেন। প্রায়ই ইহারা একাকী নির্জ্জনে বসিয়া বা বেড়াইয়া থাকেন। পুস্তকাদি কাহারও কাহারও একমাত্র সঙ্গী।

রমণীরা খাওয়া দাওয়ার সময়ে নানাপ্রকার বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আসেন। প্রতিদিনই ইহাঁরা বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছেন। পোষাক-পূজাই বোধ হয় ইহাঁদের জীবনের সাধনা।

এক সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া ৪০।৫০ জন চারিবেলা আহার করিতে-ছেন। কিন্তু বন্ধুত্ব, প্রীতি, ভাব-বিনিময় ত বিশেষ বাড়িতেছে বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহার সঙ্গে যাঁহার আলাপ তাঁহারাই কাছাকাছি বসেন, এবং তাঁহারাই একসঙ্গে উঠিয়া যান। একত্র খানা খাইলেই কি ঐক্য, মিলন ও সহানুভূতির বিকাশ হয়?

পাশ্চাত্য আরোহীদের হাতে পুস্তকাদি দেখিতে পাই। কেহই জাহাজে উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থাদি পাঠ করেন না। ইঁহারা চোথা নাটক, উপন্যাস, গল্পের বই, ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া ডেকের উপর বসেন। উচ্চ সাহিত্যে ইঁহাদের স্বাভাবিক প্রীতি আছে কি না সন্দেহ। অবশ্য এইটুকু দেখিয়াই একটা জাতি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা চলে না।

আমাদের পাদ্রী অধ্যাপকমহাশয়ের এবিষয়ে বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেছি। তিনি সাধারণ পাশ্চাত্যের ন্যায় হাল্‌কা সাহিত্যের সাহায্যে সময় কাটাইতে চেষ্টা করেন না। ইনি স্বয়ং একজন সুকবি ও লেখক। ইঁহার সঙ্গে উচ্চ সাহিত্যের গ্রন্থ রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রকার লোক সমস্ত পাশ্চাত্য আরোহীদিগের মধ্যে আর একজনও নাই। খাওয়া দাওয়া, বেড়ান, গল্প করা, নিম্নশ্রেণীর পুস্তকাদি পাঠ করা এবং ছবি দেখা ছাড়া ইঁহারা আর কিছু জানেন না। এতগুলি লোকের মধ্যে একজনও সুগায়ক দেখিতে পাইলাম না। চিত্রকর বা অন্য কোন শিল্পে সুদক্ষ ব্যক্তিও বোধ হয় কেহ নাই।

একজন ইংরাজের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদি আলোচনা করিতেছেন। ইঁহার সঙ্গে কয়েকখানা হিন্দু আইন বিষয়ক গ্রন্থ রহিয়াছে। পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে আসিতেছেন—ইনি সে অঞ্চলের এক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি রবি বাবুর নাম শুনিয়াছেন—গ্রন্থ এখনও দেখেন নাই। ইনি বলিলেন, "একটা সমালোচনা পড়িয়াছি। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, রবি বাবু বড় বেশী গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া

ফেলিয়াছেন।" অল্পকালের মধ্যে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংসারের রীতি নয় বুঝিতেছি। তাঁহাদের মতে, ইহাতে লেখকের মূল্য কমিয়া যায়। আমাদের পাত্রী বন্ধুটিও রবি বাবু সম্বন্ধে কয়েকবার এই কথাই বলিয়াছেন।

বন্দরে পৌঁছিবার প্রায় তিন ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই এডেনের পাহাড় দেখা যায়। এই পথটুকুর মধ্যে বাতাস উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বহিতে লাগিল। ক্রমশঃ আমরা পাহাড়ের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। পাহাড়ের এক অংশ ঘুরিয়া অপর অংশের ভিতরকার সমুদ্রে জাহাজ প্রবেশ করিল। এই স্থানটাই পোতাশ্রয় বা 'হার্বার'।

হার্বারে প্রবেশ করিবার আগেই সমুদ্রের জল সবুজ বর্ণ দেখিতে পাইলাম। এতদিন নীল রংএর খেলা দেখিয়াছি। আজ ঘণ্টা দুএক ধরিয়া অপেক্ষাকৃত অগভীর জলের সবুজ রং দেখিতে লাগিলাম। সমুদ্র যতই ভূমির নিকট অগ্রসর হয় ততই ইহার বর্ণ সবুজ ঘাসের মত দেখায়। পোতাশ্রয়ের ভিতরে নানা স্থানে ঘোলা কর্দ্দমাক্ত জলের পাক দেখিতে পাইলাম, এবং সর্ব্বত্র সাধারণ নদীর জলের রংই পরিস্ফুট।

এডেন বন্দর একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই পাহাড় সমুদ্র হইতে খাড়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের কোন অংশে একটি তৃণ পর্য্যন্ত জন্মিতে পায় না। ছাই রংএর কয়লার স্তূপের মত জমাট বাঁধিয়া আরবদেশের মরুভূমি সমুদ্রকূলে মাথা তুলিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে একমুষ্টি সাধারণ মৃত্তিকা বা ধূলিও নাই—সমস্তই পাথর। পূর্ব্বে বোধ হয় এটা আগ্নেয়-পর্ব্বত ছিল।

এই পাহাড়ের নিম্নভাগ কাটিয়া সমুদ্রের কিয়দংশ শুকাইয়া ফেলা হইয়াছে। এই উপায়ে যে সমতল ভূমি প্রস্তুত হইয়াছে তাহার উপর পাশ্চাত্য ফ্যাশনের হোটেল, দোকান, ইত্যাদি নির্ম্মিত। বাড়ীঘরগুলি

প্রায় সবই নূতন। সমস্ত এডেন বন্দরের একটি মাত্র রাস্তা। ইহা অট্টালিকা সমূহের সম্মুখ দিয়া সমুদ্রের ধারে ধারে চলিয়াছে। পাহাড়টা সমস্তই দুর্গ—এবং দুর্গ প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত।

আমরা এই একমাত্র রাজপথে বন্দর দেখিতে বাহির হইলাম। সঙ্গে জাপানী বন্ধু। এক জায়গায় Smokeless coalএর রাশি দেখিতে পাইলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইংরাজ রণ-তরীসমূহের জন্য এই ধূমবিহীন কয়লাগুলি রক্ষিত বুঝিতে পারিলাম। পূর্ব্বে এসব কখনও দেখি নাই। জাপানী ব্যবসাদার বলিলেন, এই কয়লায় জাহাজ চালাইলে ধূম বিনির্গত হয় না। সুতরাং শত্রুপক্ষীয়েরা সহজে দূর হইতে দেখিতে পায় না। অথচ তাপ খুব বেশী পাওয়া যায়।

পাহাড়ের একটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ী চলিল। ঊর্দ্ধে তাকাইয়া দেখিলাম কেল্লার একটা পুল আমাদের মাথার উপরে রহিয়াছে—আমরা একটা সঙ্কীর্ণ পাশ্চাত্য গলির ভিতর দিয়া যাইতেছি।

এডেনে সাধারণতঃ লোকেরা জল-সরবরাহের জন্য কৃত্রিম সরোবর দেখিতে যায়। এডেনে বন্দরের ভিতর এক ফোঁটাও জল পাইবার সুবিধা নাই। কোথাও একটা স্বাভাবিক ঝরণা দেখিলাম না। দূরে দূরে দুই একটা কূপ আছে—প্রায় ৫০ ফিট নীচে জল। সুতরাং জলকষ্ট খুব বেশী। সমুদ্রের লবণাক্ত জল পরিষ্কার করিবার কল বন্দরের কয়েকটা জাহাজে আছে। উটের গাড়ী করিয়া এই জাহাজ সমূহ হইতে পরিষ্কার জল আনা হয়। তাহাতেই বন্দরবাসী জনগণের পিপাসা মিটে। কিন্তু দুর্গের জন্য ইহাছাড়া আর একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাহাজ-ঘাট হইতে কিছুদূরে পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি ট্যাঙ্ক বা পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে। বর্ষাকালে তাহাতে যে জল জমে

তাহার দ্বারা প্রায় তিনমাস কাজ চলিতে পারে। এই কৃত্রিম সরোবর-গুলি দেখিবার জন্যই জাহাজের আরোহীরা বন্দরে নামিয়া থাকে।

এডেনে সাধারণতঃ দুই প্রকার মুসলমান দেখিতে পাইলাম। একশ্রেণী বেশী কৃষ্ণবর্ণ—ইহারা আফ্রিকার সোমালি প্রদেশের অধিবাসী। অপর শ্রেণী অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ—ইহারা আরবদেশীয় লোক। ঘোড়ার গাড়ীগুলি সবই প্রায় সোমালি জাতীয় লোকের হাতে। আমাদের পথ-প্রদর্শকও একজন সোমালি। আরব্য মুসলমানদের মধ্যে উটের গাড়ী চালান, কুলীগিরি ইত্যাদি কাজ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা করে। ভারতের মুসলমান অথবা অন্যান্য কুলী শ্রেণীর লোক হইতে এডেনের আরব ও সোমালি মুসলমানদের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিলাম না। হ্রস্বাকৃতি, রুগ্নদেহ এবং ক্ষীণকায়—ইহারা সকলেই।

কয়েক ঘর হিন্দুর বাসও এখানে আছে। অধিকাংশই গুজরাত অঞ্চলের লোক এবং মাড়োয়ারী। দুই তিনটি হিন্দু মন্দিরের কথাও শুনিলাম। একটি মন্দির দেখিয়া আসিলাম। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে একজন ভারতবাসী হিন্দু এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরে হনুমানদেবের মূর্ত্তি পূজিত হয়। একজন পূজারি দেবসেবায় নিযুক্ত। ইনি প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ এডেনে সপরিবারে বাস করিতে-ছেন। ইঁহার গৃহ যুক্তপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলায়। ইঁহার নিকট শুনিলাম, আরও ১০।১২ ঘর ব্রাহ্মণ এখানে বাস করেন।

পোতাশ্রয়ের একদিকে ইংরাজের এডেন দুর্গ ও বন্দর। তাহার অপর কূলে আরব রাজ্য। পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিবার দ্বার বেশ সুরক্ষিত। কারণ এডেন উপসাগর হইতে যে স্থানে পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিবার পথ ঠিক সেই স্থানে দুইকূলে দুইটি পাহাড়। একটি এডেন বন্দরের পাহাড়। অপর দিকে আরব রাজ্যের পাহাড়। কাজেই

হাবায়টা প্রাকৃতিক শক্তিতে সংগঠিত। অধিকন্তু বন্দর এবং দুর্গও সুরক্ষিত। জাপানী বলিলেন, "রুশিয়ার পোর্ট আর্থার দুর্গও প্রায় এই রূপই প্রাকৃতিক শক্তিতে সুরক্ষিত ছিল। এডেন দুর্গ অপেক্ষা বোধ হয় পোর্ট আর্থার আয়তনে কিছু বড়।" সুতরাং ভারতমহাসাগরের আরব্য কোণে এডেন দুর্গ ও পোতাশ্রয় ইংরাজ-বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যের পক্ষে একটা প্রবল পরাক্রান্ত রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ অবস্থিত।

কৃত্রিম সরোবরগুলি দেখিয়া বাজারে প্রবেশ করিলাম। বিশেষত্ব কিছুই নাই। ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে আজকাল যেরূপ দোকান এখানেও সেইরূপ। বিলাতী, জার্ম্মাণ, ইতালীয় ইত্যাদি নানা প্রকার বিদেশী দ্রব্যের কেনা বেচা দেখিতে পাইলাম। আরব্য মুসলমানদের বিশিষ্ট শিল্প কিছু দেখিলাম না। নৌকা তৈয়ারী করাই বোধ হয় এডেনের লোকেদের প্রধান কারিগরি। বাজারে দুই একটা হিন্দু মিঠাইর দোকানও আছে। জিলাপি, লাড্ডু ইত্যাদি এখানে পাওয়া যায়। একটি দোকানের মালিক কাঠিওয়ারবাসী হিন্দু। আরবেরা পান খায়—এডেনের বাজারে দুই একটা খিলি পানের দোকান দেখা গেল। হুঁকা, ফরসী, নল, গুড়গুড়ি ইত্যাদির ব্যবহারও বেশ প্রচলিত। দল বাঁধিয়া মজলিস করিতে করিতে এখানকার দোকানীরা আরামের সহিত ধূমপান করে।

বাজার হইতে ফিরিবার সময়ে নূতন রাস্তায় আসিলাম। এই পথে একটা বৃহৎ টানেল বা সুড়ঙ্গ দিয়া আসিতে হয়। এইটা পার হইতে প্রায় ৬.৭ মিনিট লাগিল।

এডেনের মধ্যে গাছ পালা স্বাভাবিক ভাবে জন্মে না। দুই তিন জায়গায় দেখিলাম—মহাকষ্টে ক্ষুদ্র বাগান তৈয়ারী করা হইয়াছে। কৃত্রিম সরোবরের নিকট কতকগুলি ফুলগাছ দেখিতে পাইলাম। এই-

গুলি আরব মরুভূমির স্বাভাবিক উদ্ভিদ। দূর হইতে আনিয়া এখানে লাগান হইয়াছে—চিনিতে পারিলাম না। এইরূপ গাছ দুই একটা কূপের নিকটেও দেখিলাম। কোন কোন হোটেলের সম্মুখেও ছোট খাট একটা বাগান আছে। কিন্তু বৃক্ষের শীতল ছায়া এডেনের কোথাও পাওয়া যায় না।

জানোয়ারও বেশী দেখিলাম না। সমুদ্রে কতকগুলি পাখী ভাসিয়া উড়িয়া বেড়ায়। বন্দরে ঘোড়া ও উটই প্রধান বাহন। একজায়গায় একটা গোশালা দেখিলাম। তাহাতে প্রায় ৫০।৬০ টা গাভী ছিল। এগুলি আরবদেশীয়। দেখিয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট বোধ হইল।

কৃত্রিম সরোবরগুলি আজকালকার তৈয়ারী নয়—বহু প্রাচীন। এই সমুদয় মুসলমানী-যুগের কৃতিত্বের সাক্ষী। পাহাড়টার ভিতরে ভিতরে অনেক জলপথ আছে—সকল পথই দৈবক্রমে পাহাড়ের একস্থানে আসিয়া মিলিয়াছে। ফলতঃ সামান্য বৃষ্টি হইলেই অথবা কোন উপায়ে পাহাড়ের ভিতর জল সঞ্চার হইলেই জলের স্রোত সেই এক কোণে প্রধাবিত হয়। সুতরাং সমস্ত পাহাড়ের জল একজায়গায় জমিতে পায়। এই তথ্য আরবেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাহা বুঝিয়াই তাঁহারা কৃত্রিম সরোবরগুলি তৈয়ারী করিয়াছিলেন। মধ্যে এগুলি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ধূলিরাশির চাপে ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল। ইংরাজেরা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এগুলির সংস্কার সাধন করিয়াছেন। পুরাকীর্ত্তির উদ্ধার সাধিত হইয়াছে।

প্রাচীন মুসলমানেরা এডেনে জল আনিবার জন্য অন্য ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইয়ামানের রাজা মালিক মান্সুর দূর হইতে নলে করিয়া জল আনিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। ইতালীতেও রোমীয়েরা এই প্রণালী অবলম্বন করিত। অবস্থা অনুসারে

ব্যবস্থা করা মানবমাত্রেরই স্বধর্ম্ম। যেখানে বাস করিতে হয় সেখানকার অধিবাসীরা তদনুরূপ সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া লইতে শিখে।

কতিপয় আরব বেদুইন দেখিলাম—ইহারা আরব রাজ্য হইতে উটে চড়িয়া বেচিবার জন্য কাঠ লইয়া আসিয়াছে। বেদুইনদিগকে বিশেষ প্রচণ্ড, ভীমমূর্ত্তি দুর্দ্দান্ত বা দুষ্ট-প্রকৃতি বোধ হইল না।

এডেন একটা মরুভূমি—পাখীর গান বা বনের ছায়া এখানে নাই। বন্দর ও দুর্গ হিসাবেই ইহার একমাত্র মূল্য। প্রাচীন কালেও মুসলমানেরা এডেনকে এই জন্যই আদর করিতেন। মক্কা যাইবার পথে অবস্থিত বলিয়াও ইহার কিছু মর্য্যাদা ছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এই স্থান ইংরাজের দখলে আসিয়াছে। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এখানে কোন ইংরাজ জাহাজ আসে নাই। আজ ইহা ভারতগবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন।

১৫১৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগিজেরা এডেন দখল করিতে চেষ্টা করে। তাহারা পাহাড়ে উঠিতে পারে নাই। তাহার পূর্ব্বে ইহারা ভারতবর্ষে রাজ্যগঠন করিয়াছিল—ভারতবর্ষ হইতে জাহাজ আনিয়াই আল্‌বুকার্ক এডেন অবরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা পর্ত্তুগিজ অধিকারে আসে নাই।

ইতালীয় পর্য্যটক মার্কোপোলো চীন হইতে ফিরিবার সময়ে এডেনে নামিয়াছিলেন। তিনি এডেনের রাষ্ট্রশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। খৃষ্টান শত্রুদের বিরুদ্ধে এডেনের সুলতান মিশরের সুলতানকে সাহায্য করিতেন। ১২৯১ খৃষ্টাব্দে একর নগরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে এডেনের সুলতান ৩০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৪০,০০০ উষ্ট্র সেনা পাঠাইয়াছিলেন। খৃষ্টানেরা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়। সুতরাং এডেন মধ্যযুগে বিশেষ প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রই ছিল।

এডেন দুর্গের অপর কূলে দেখিলাম—শ্বেত রংএর তাঁবুর মত কতক-গুলি উচ্চ স্তূপ রহিয়াছে। সে গুলি লবণের রাশি। একটা ইতালীয় ব্যবসায়ী কোম্পানী ওখানে নুন প্রস্তুত করে। সমুদ্রের জল কূলে আনিবার জন্য কল আছে। কূলে কতকগুলি পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে। সেইখানে রৌদ্রতাপে জল শুকাইয়া যায়, এবং লবণ প্রস্তুত হয়। বোম্বাইএর একটা হিন্দু-কোম্পানীও এইস্থানে নুন প্রস্তুত করে। এই অঞ্চলের নাম সেখ অথ্মান।

লোহিতসাগর

রাত্রিকালে লোহিত সাগরের মধ্যে জাহাজ প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং বাবেলমাণ্ডেল প্রণালী দেখিতে পাইলাম না। সকালে উঠিয়া দেখি—আকাশে কুয়াশা, আমার বামদিকে আফ্রিকার পর্ব্বতশ্রেণী। আমার কাম্‌রা জাহাজের বামভাগে। এজন্য ভারতমহাসাগরে দাক্ষিণা হাওয়া পাইতেছিলাম। এক্ষণে আফ্রিকার দিকে আমার কাম্‌রা পড়িয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে আজ উত্তরদিক হইতে বাতাস বহিতেছে—এজন্য গরম তত বেশী নয়। দাক্ষিণা বাতাস বহিলে গরম লাগিত—অথবা পূর্ব্বে পশ্চিমে বায়ুর গতি থাকিলেও অসহ্য বোধ হইত।

লোহিত সাগরের সকল ভাগ হইতেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম কিনারা দেখা যায় না। ইহা নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়—কিন্তু গভীর বোধ হয় বেশী নয়। দেখিতেছি জল নীলও নয়, সবুজও নয়। ইহার রং প্রধানতঃ কাল—মেটে, ধূসর। বোধ হয় আকাশের কুয়াশা ও মেঘের প্রভাবে বর্ণ এইরূপ।

সাগরাদির নামকরণ কি নিয়মে হয়? কৃষ্ণসাগর, পীতসাগর, শ্বেত-সাগর, লোহিতসাগর—এই চারিটা সাগরের নামের সঙ্গে প্রাকৃতিক বর্ণের কোন সম্বন্ধ আছে কি? জলের রং অনুসারেই যে সর্ব্বত্র সাগরের নাম হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি, পর্ব্বত, মৃত্তিকা ইত্যাদি অথবা সমীপস্থ কোন বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ দেখিয়া হয় ত স্থানীয় লোকেরা নাম দিয়া থাকে। উত্তর ইউরোপের তুষারাবৃত অঞ্চলে সমুদ্রকে 'শ্বেত' নাম দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেইরূপ রুশিয়ার দক্ষিণ

প্রান্তের মৃত্তিকার রং হইতে কৃষ্ণসাগরের নাম সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে। পীতসাগর অবশ্য চীনের পীতজাতি অনুসারেই হইয়াছে। কিন্তু লোহিতসাগরের নাম লোহিত কেন হইল ?

ইংরাজীতে "রেড" বলিলে যাহা বুঝায় সংস্কৃত ভাষায় রুদ্র, রুধির ইত্যাদি শব্দেও তাহাই বুঝায়। পুরাণে রুদ্রসাগরের বর্ণনা আছে। বোধ হয় আরবভাষায় প্রচলিত নাম হইতে রুদ্র (বা লোহিত রুধির) সাগর নাম সংস্কৃতে প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং 'লোহিত' নাম আধুনিক নয়। কেহ কেহ বলেন, লাল রংএর একপ্রকার জীবন্ত উদ্ভিদ্ এই সমুদ্রে বেশী—এজন্য এই নাম। এরূপ উদ্ভিদ্ ত ভারত মহাসাগরে দুই চারিটা দেখিয়াছি—কিন্তু লোহিত সাগরে দেখিতে পাইতেছি না। পার্শ্ববর্ত্তী কোন পর্ব্বতাদি রক্তবর্ণ কি না জানি না। তবে আর একটা অনুমানের কথা শুনিলাম। প্রাচীন মিশরীয়েরা এসিয়া হইতে মিশরে যাইবার পথে "পান্ত" দেশে বাস করিয়াছিলেন। এই পান্তদেশ এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে, লোহিত সাগরের পূর্ব্বকূলে। হয় ত তাঁহারা সমুদ্রে রক্তিমবর্ণ সূর্য্যাস্ত গমনের দৃশ্য দেখিয়া সমুদ্রকে রক্ত-সাগর নাম দিয়াছিলেন। সেই নাম হইতেই অন্যান্য জাতিরা লাল রংএর প্রতিশব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক এই সমুদ্রের পরিচয় দিয়া আসিতেছে।

লোহিত সাগরের মধ্যে স্থানে স্থানে কতকগুলি পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে দ্বীপের মত। পাহাড়গুলিতে গাছ পালা মাটি ধূলা কিছুই নাই। লোক বাস করিতে পারে না। এই পর্ব্বত-দ্বীপগুলির উপর আলোকগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

সমুদ্রের জল এখন সুনীল দেখাইতেছে। প্রায়ই পাখীর ঝাঁক দেখিতে পাই। বোধ হয় এসিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে ইহারা চলাফেরা করে।

আজ প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ ডেকের উপর নাচ হইল। সকালে আসিয়া একজন ইংরাজ আরোহী আমাদের সকলকে নাচের কথা বলিয়া গেল—এবং নাচিতে অনুরোধও করিল। নৈশ আহারের পর নাচ আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেও আরোহীরা আসিল।

ফরাসী নাচ বোধ হয় ইংরাজী নাচ হইতে কিছু স্বতন্ত্র। এই জাহাজে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। ইংরাজ পুরুষেরা ও রমণীরা কেবল মাত্র ইংরাজী কায়দায় নাচ জানেন, ফরাসী স্ত্রী পুরুষগণ ফরাসী নিয়মে নাচিতে পারেন। অবশ্য প্রত্যেক কায়দায়ই এক একজন পুরুষ এক একটি রমণীকে লইয়া তালে তালে পা ফেলে। কেবল পা ফেলিবার নিয়মে দুই জাতিতে কিছু প্রভেদ আছে।

আমাদের জাহাজে যতগুলি ইংরাজ পুরুষ আছেন ততগুলি ইংরাজ রমণী নাই। সুতরাং ইংরাজ জুড়ি তৈয়ারী হওয়া কঠিন। আবার যতগুলি ফরাসী রমণী আছেন ততগুলি ফরাসী পুরুষ নাই—কাজেই ফরাসী-যুগল প্রস্তুত করাও মুস্কিল। এই যুগলকে partners বলে। নানাপ্রকার গোলযোগ হইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইল—ফরাসী পুরুষের সঙ্গে ইংরাজ রমণী পার্টনার হইবেন, এবং ইংরাজ পুরুষ ফরাসী রমণীকে জুড়িদার লইবেন।

নাচ চলিতে লাগিল। কিন্তু যুগলগুলি খাপছাড়া হইয়াছে। তাল কাটিয়া যাইতেছে। ফরাসী যে ভাবে নাচিতেছেন তাঁহার ইংরাজ জুড়ি সেই তালে পা ফেলিতে পারিতেছেন না। যখন হাত ছাড়িয়া দাঁড়াইবার কথা তখন কেহ বা হাত বাড়াইয়া জুড়িকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। যখন একজনকে ছাড়িয়া আর একজনকে ধরিবার নিয়ম তখন হয় ত কেহ কেহ দাঁড়াইয়া পড়িতেছেন। আমরা নাচ বুঝিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোল বেশ ধরিতে পারিলাম। যতবার তাল কাটিয়া যাইতে

লাগিল ততবার হাসির রোল উঠিতে লাগিল। মোটের উপর সকলে নাচ দেখা অপেক্ষা কায়দার ভুল দেখিয়া বেশী আমোদ পাইতেছিল।

আমাদের সঙ্গে একজন পর্ত্তুগীজ সেনাপতি আছেন। ইনি ফরাসী কায়দায় নাচিলেন। ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া পর্ত্তুগালের সংবাদ লইলাম। লিস্‌বনে গেলে ইনি আমাদিগকে দেশ দেখিতে সাহায্য করিবেন। প্রাচীন পর্ত্তুগালের প্রভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া ইনি দুঃখের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার অধঃপতন বর্ণনা করিলেন। পূর্ব্বযুগে এদেশে ধর্ম্ম-বৈষম্যের জন্য কত রক্তপাত ও নরহত্যা এবং অত্যাচার হইয়াছে! সে সকল বৃত্তান্তে ইনি পর্ত্তুগালের অন্ধকার যুগের পরিচয় দিলেন। Inquisitionএর কাহিনী মানবেতিহাসের ঘোরতর কলঙ্ক। ইউরোপে ধর্ম্মের নামে যে অধর্ম্ম ও পাশবিকতার অভিনয় হইয়াছে, অন্য কোন দেশে সেরূপ হয় নাই। ভারতবর্ষে ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য কখনই লুপ্ত ও বিনষ্ট হইত না। আধুনিক ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের মধ্যযুগের কথা স্মরণ করিলে আর লম্বা গলা করিয়া আস্ফালন করিতে পারেন না। এই পর্ত্তুগীজ সেনানায়কের মনোভাব দেখিয়া এইরূপ বুঝিলাম।

ওলন্দাজ চিত্রকর

খুঁজিতে খুঁজিতে একজন চিত্রকরের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ওলন্দাজ—আমষ্টার্ডামের নিকট একটি সমুদ্র-বন্দরে ইহাঁর বাস। ইনি ইংরাজী জানেন। সম্প্রতি চারি মাস কাল ভারতবর্ষে কাটাইয়া স্বদেশে ফিরিতেছেন।

লঙ্কাদ্বীপ, মাদুরা, ত্রিচিনপল্লী, গোয়ালিয়র, আগ্রা এবং কাশী এই কয় স্থানের দৃশ্যসমূহ দেখিয়া আসিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রাচীন স্থান পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন?" ইনি বলিলেন, "না, আমি পুরাতন প্রাণ-হীন বস্তু ভালবাসি না; আমি জীবন্ত জিনিষ দেখিতে চাহি। মরা শরীর দেখিতে যেমন মানুষের কষ্ট বোধ হয়, তাহার দুর্গন্ধ যেমন কাহারও ভাল লাগে না, তেমনি পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা বা মন্দির বা মূর্ত্তিরাশি আমার চিত্তে বেদনা দেয়। সেগুলি দেখিয়া বা তাহাদের কাছে যাইয়া আমি আনন্দ পাই না। আমি জীবন্ত মানুষ দেখিতে ইচ্ছা করি। নগরের কোলাহল, জনগণের গতায়াত, পাখীর গান, জানোয়ারের শব্দ, নৌকার গতি এই সবই আমার বেশী ভাল লাগে।"

ইহাঁর কামরায় গেলাম। দেখিলাম—ইনি চিত্র আঁকিতে ব্যস্ত। তিন চারিটা বড় বড় পোর্টফোলিয়ো দেখাইলেন। সেগুলিতে সিংহল ও ভারতবর্ষের নানা দৃশ্য ও ঘটনা চিত্রিত রহিয়াছে। মন্দির, সন্ন্যাসী,

দেবতা, ভিক্ষুক, ছাগল, গাভী, হাতী, নৌকা, গঙ্গাঘাট, শ্মশান, শোভা-যাত্রা ইত্যাদি নানা বিষয়ের 'পেন্সিল-স্কেচ্' দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি কি সম্পূর্ণ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে? না এই সমুদয়ের উপর আরও কাজ করিতে হইবে?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এগুলি কিছুই নয়। লেখকেরা যেমন ডায়েরীতে সঙ্কেত ও 'নোট' মাত্র লিখিয়া রাখেন, আমিও সেইরূপ 'নোট' সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি মাত্র। এক একটা চিত্রের জন্য প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা খাটিয়াছি। প্রত্যেকটা লইয়া ১৫।২০ দিন কাজ করিলে তবে সম্পূর্ণ হইবে।"

দেখিলাম এ যাত্রায় তিনি প্রায় ৬০ খানা হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান দৃশ্যের নোট বা সঙ্কেত সংগ্রহ করিয়াছেন। এগুলিকে পূর্ণতা দান করিতে তাঁহার দুই বৎসর লাগিবে—তিনি বলিলেন। এই বৎসর তিনি অন্য কোন চিত্রে হাত দিবেন না। চিত্রগুলি পরে ছাপাইয়া বেচিবেন। এক এক খানা চিত্রের ২৫।৩০টা নকল ছাপা হইবে। প্রত্যেক নকল চিত্র প্রায় ১৫০।২০০ টাকায় বিক্রী হইবে। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের মিউজিয়াম, চিত্রশালা, ধনীব্যক্তি, চিত্রকর এবং সৌখীন লোকেরা এই সমুদয় চিত্রের ক্রেতা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি হল্যাণ্ডের কোন চিত্রবিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ?" ইনি বলিলেন, "না, আমাকে গবর্ণমেণ্ট একটা চাকরী দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। আমি নিজের আদর্শ অনুসারে স্বাধীনভাবে চিত্রকর্ম্ম করিয়া থাকি। ইহার দ্বারাই আমার জীবিকানির্ব্বাহ হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কোন স্বাধীন চিত্রবিদ্যালয় খুলিয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, "না, তবে আমার গৃহে আসিয়া অনেক ছাত্র চিত্রাঙ্কন শিখিয়া যায়। এইরূপে আমার চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি দেশের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "দেখিতেছি, আপনার এই সকল চিত্রের সাহায্যে ওলন্দাজেরা হিন্দুসমাজের এবং ভারতবর্ষের অনেক কথাই সহজে বুঝিতে পারে।" ইনি বলিলেন, "নিশ্চয়, আপনি যদি কোন ভাষায় পুস্তক লিখেন, তাহার পাঠক ও বোদ্ধা কেবলমাত্র সেই ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু চিত্র দেখিয়া মানুষ মাত্রই চিত্রের পরিকল্পিত বিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তাহাছাড়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান হল্যাণ্ডে সুপ্রচারিত। লাইডেন নগরের অনেক অধ্যাপকই ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব, ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিল্প ইত্যাদির চর্চ্চা করেন। প্রসিদ্ধ কার্ণ সাহেব আমাদেরই স্বদেশীয়। কাজেই ভারতবর্ষের বহু পদার্থ হল্যাণ্ডের নগরে নগরে উচ্চপদস্থ লোকজনের গৃহে সুরক্ষিত আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি আপনার চিত্রগুলি ওলন্দাজ জাতির সকলেই বেশ আদর করে?" তিনি উত্তর করিলেন, "না। বহুলোকই এগুলি বুঝিতে পারে না। তাহারা আমার এই সব চিত্র আদৌ পছন্দ করে না। তাহারা হিন্দুস্থানের বিশেষ বিশেষ জীবনযাত্রা-প্রণালী, চিন্তা-প্রণালী, ধর্ম্মকর্ম্ম ইত্যাদি জানে না। এজন্য আমার চিত্রাবলী তাহাদের ভাল লাগে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি ভারতবর্ষের সাহিত্য কিছু আলোচনা করিয়াছেন কি? ভারতের সংস্কৃত, প্রাকৃত বা আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য আপনার জানা আছে কি? তাহা না হইলে আপনি নিজেই বা হিন্দুস্থানের দৃশ্য, ঘটনা, সমাজ বা কাজ কর্ম্ম বুঝেন কি করিয়া? আর এগুলি না বুঝিলে চিত্রাঙ্কন করা কি সম্ভবপর?" চিত্রকর বলিলেন, "বালিদ্বীপে আমাদের রাজ্য এখনও আছে। সেখানে অনেক হিন্দুর বাস। আমি সে দেশে তিনবার গিয়াছি। তিনবারে তিন বৎসর

কাটাইয়াছি। তাহা ছাড়া আরও দুইবৎসর বালিদ্বীপের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছি। ঐ দ্বীপের ভাষাও কিছু কিছু শিখিয়াছি। ওখানকার হিন্দু কারিগর ও শিল্পিদিগের সঙ্গে আলাপ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতার অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি। পরে আমার অভিজ্ঞতা-সমূহ একখানা সুবৃহৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে প্রায় ২৫০ খানা চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রচারকার্য্যে আমাদের গবর্মেণ্ট সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য এই গ্রন্থ লিখিতে যাইয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি অনেক আলোচনা করিয়াছি। হিন্দুত্ব, হিন্দুর দেবদেবী, হিন্দুর আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। বালিদ্বীপে বাস করিয়া আমি ভারতবর্ষের আবহাওয়া কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি।"

তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, ওলন্দাজেরা ভারতবর্ষের কথা সবিস্তার আলোচনা করিয়া থাকে। প্রায় ৩০০।৪০০ বৎসর হইতেই ডাচ্ জাতি হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবন্ধ, সন্দর্ভ, গ্রন্থ ইত্যাদি রচনায় উৎসাহী। এখনও তাহাদের সে উৎসাহ কমে নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগেও তাহাদের রাষ্ট্রশক্তি হিন্দুদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফরাসীরা বোধ হয় এখন আর ভারতবর্ষের চর্চ্চা রাখে না। ইংরাজ ব্যতীত ইউরোপের মধ্যে জার্ম্মাণেরাই ভারতবর্ষের কথা জানিতে ও শিখিতে চেষ্টা করে। স্পেন, পর্ত্তুগাল, ইতালী এসকল দেশের লোকেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। রুশিয়ারও ভারত-জ্ঞান ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

হিন্দুস্থান-বিষয়ক চিত্রাবলীতে হাত দিবার পূর্ব্বে ইনি মুসলমান সভ্যতার প্রচার করিয়াছেন। স্পেন ও পর্ত্তুগালের প্রাচীন মুরদিগের সৌধমালা, আবং আধুনিক মিশরের মুসলমান কীর্ত্তিসমূহ ইঁহার শিল্পের স্থান পাইয়াছে। সুতরাং আগ্রার তাজমহল এবং গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ

ইঁহার নিকট রচনা হিসাবে নূতন নয়। মুসলমানী শিল্প প্রচারের পূর্ব্বে ইনি অন্যান্য স্বদেশীয় চিত্রকরগণের ন্যায় ওলন্দাজদিগের সুপরিচিত জাতীয় দৃশ্য ও ঘটনাসমূহই চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, ইতালীর দৃশ্যাদি ত বাল্যকাল হইতেই দেখিয়াছেন ও আঁকিয়াছেন। এইরূপে তিনি আজ বিশবৎসর কাল শিল্পচর্চ্চা করিতেছেন।

ইনি কোন বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা শিখেন নাই। বাল্যকাল হইতে ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাধারণ বিদ্যালয়ে ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি শিখিয়াছিলেন। ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ ও ইংরাজী এই চারি ভাষাই শিখিতে হইয়াছে। তারপর ঘরে বসিয়া স্বাধীন চর্চ্চার ফলে চিত্রাঙ্কনে তিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে ইনি বেশ উচ্চ ধারণাই পোষণ করেন—দেখিতেছি। মাদুরা মন্দিরের গাত্রস্থিত একটি রমণীমূর্ত্তি সম্বন্ধে ইনি বলিলেন "গ্রীকদিগের রচনাকৌশল অপেক্ষা ইহাতে কম শিল্প-নৈপুণ্য নাই। সমস্ত মূর্ত্তিটির মধ্যে সৌসাদৃশ্য এবং গঠন-লাবণ্য অতি দক্ষতার সহিতই পুষ্ট করা হইয়াছে।" মাদুরা কিম্বা কলম্বোর কোন চিত্রশালায় তিনি নটরাজ শিবের কাংস্যময় মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। ইহার প্রশংসাও তাঁহার নিকট শুনিলাম। শিবের চরণবিন্যাস এবং গোলাকার-আবেষ্টনের মধ্যে মূর্ত্তির অবস্থিতি শিল্পীর সামঞ্জস্যজ্ঞান এবং সৌন্দর্য্য বোধের সাক্ষ্য দিতেছে।

ইনি ভারতের আধুনিক চিত্রকরগণের কোন সংবাদ রাখেন না। রবিবর্ম্মা, কুমার স্বামী বা অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদির নাম এখনও শুনেন নাই। আমার নিকট একখানা 'মডার্ণ রিভিউ' ছিল। তাহাতে শৈলেন্দ্রনাথ দেবের "জগদ্ধাত্রী" প্রথম পৃষ্ঠাই দেখিতে পাইলাম। এইটা ওলন্দাজ শিল্পীকে দেখান গেল। তিনি বলিলেন, "ধর্ম্ম হিসাবে, দেবতা হিসাবে

আমি ইহার আদর পূর্ণ মাত্রায় করিতে পারি কিনা সন্দেহ। কিন্তু চিত্র-কলা হিসাবে ইহা অতিশয় সুশ্রী। সিংহের উপর যে মূর্ত্তি উপবিষ্ট তাহাতে সৌন্দর্য্য, সামঞ্জস্য, অনুপাত ইত্যাদির মাত্রা বেশ রক্ষিত হই-য়াছে। রং ফলাইবার ক্ষমতাও শিল্পীর যথেষ্ট। সমগ্র চিত্রের ভিতর অংশে অংশে বেশ একটা মিল পাইতেছি। তবে মুখমণ্ডল টা আরও সুন্দর ও সতেজ হইতে পারিত।" এই সংখ্যায়ই অবনীন্দ্রনাথের একটি চিত্রের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার নাম "In the dark night." এইটা দেখাইলাম। চিত্রকর বলিলেন "নকলেও মন্দ দেখাইতেছে না—বেশ ভাবপূর্ণই বোধ হইতেছে। এত ছোট প্রতিলিপিতে বেশী বুঝা যায় না।"

এডেন হইতে প্রায় দুই দিনের পথ চলিয়া আমাদের জাহাজ মক্কার বন্দর জিদ্দা অতিক্রম করিল। অবশ্য এ জাহাজ এই বন্দরে থামে না। মক্কা যাইবার জন্য স্বতন্ত্র জাহাজ সুয়েজ হইতে আসে। আমরা মক্কা ডাইনে রাখিয়া অগ্রসর হইলাম। এডেন ও সুয়েজের প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থানে মক্কার অবস্থিতি।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা লোহিতসাগরে পড়িয়া অবধি উত্তরের বাতাস পাইতেছি। প্রবলবেগে ২৪ ঘণ্টা বায়ু বহিতেছে। সর্ব্বদা ঝরণার মত জলের কলকলধ্বনি কাণে প্রবেশ করিতেছে। ডেকের উপর উঠিলেই ভীষণ বাতাস পাই—ঠাণ্ডাও লাগে।

সমুদ্রে থাকিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বেশ বুঝিতে পারা যায়। একে কোন কাজকর্ম্ম নাই—খাওয়া আর বেড়ান। তাহার উপর সমুদ্রের হাওয়া। অধিকন্তু, সমুদ্রের লোনা জলে স্নানও শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পুরীতে সমুদ্রের কিনারায় ঢেউ খাইলে শারীরিক ব্যায়ামের কার্য্যও যথেষ্ট হয়। জাহাজে অবশ্য তরঙ্গাঘাত পাওয়া যায় না। কলের

যারা স্নানাগারে সমুদ্রের জল তোলা হয়। জল মাথায় ও শরীরে পড়িতে থাকে ইচ্ছা করিলে মানুষের আকার সমান চৌবাচ্চায়ও জল ঢালিয়া অবগাহন করা যায়। কিন্তু চৌবাচ্চার ভিতরে কত লোক কত সময়ে স্নান করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সুতরাং ইহার মধ্যে প্রবেশ না করাই শ্রেয়ঃ। লবণাক্তজলে অনেকক্ষণ স্নান করিতে করিতে শরীর স্নিগ্ধ হয়—ইহা চিকিৎসকগণের মত। স্নানের পর সাধারণ জলে গা ধুইয়া ফেলিবার প্রয়োজন নাই। নুনে মাথার চুল অথবা শরীর বিশেষ চট্‌চট্‌ করে না।

সুইজার্ল্যাণ্ডের একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আজ আলাপ হইল। ইনি পারস্যদেশে প্রায় ৮ বৎসর কাটাইয়া স্বদেশে ফিরিতেছেন। ইনি গালিচার কারবার করেন। পারস্যের নানাস্থান ঘুরিয়া বেড়ান ইহাঁর কাজ। এখান হইতে কার্পেট চালান দিয়া ইউরোপের নানা কেন্দ্রে পাঠান হয়। আমেরিকাতেই এই পদার্থের কাট্‌তি বেশী।

ইনি সুইজর্ল্যাণ্ডের সাধারণ নিয়মানুসারে বাল্যকালের প্রথম আট বৎসর নিম্ন ও মধ্যবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন পরে চারি বৎসরের জন্য ব্যবসায়-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেই সময়ে পারস্য দেশবাসী কোন বন্ধুর পরামর্শে এই দেশের প্রতি অনুরক্ত হন। ইতিহাস-শাস্ত্রে ইহাঁর ঝোঁক আছে বুঝিলাম।

সুইজর্ল্যাণ্ডের লোকেরা সকলেই ফরাসী ও জার্ম্মাণ জানে। অধিকন্তু, উচ্চশিক্ষিতগণের মধ্যে কেহ ইংরাজী, কেহ বা ইতালীয় ভাষায়ও পারদর্শী। আমাদের এই সহযাত্রীটি ইংরাজী মন্দ জানেন না। ইনি খবর দিলেন—মার্চ্চ হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত সুইজর্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্র-কেন্দ্র বার্ণ-নগরে একটা বিরাট প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। বিগত ৮।১০ বৎসরের ভিতর সমগ্র সুইস জাতি নানা কর্ম্মক্ষেত্রে যে উন্নতিলাভ

করিয়াছে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইবে। এই সময়ে সুইজর্ল্যাণ্ডে আসিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন।

আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকের উপর একটা আনন্দ সম্মিলন হইল। একজন ইংরাজ 'হর্‌বোলা' এই জাহাজে অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিলাতে যাইতেছেন। তাঁহার উদ্যোগে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা হইল। প্রথম শ্রেণীর সকল আরোহী যথারীতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রথমে একটি ফরাসী বালিকা ফরাসী কবিতা আবৃত্তি করিল। পরে ইংরাজ ধুরন্ধরটি খানিকটা হাস্য কৌতুক করিলেন। এই জাহাজের খাওয়া দাওয়া, এই জাহাজের আরোহী ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতুক করা হইল। একজন ফরাসী রমণী দুইটা গান গাহিলেন। তাহার পর একজন পার্শী একটা ইংরাজী কবিতার ব্যঙ্গ-নকল পাঠ করিলেন। পরে সেই হর্‌-বোলা পুনরায় ২।৩টি হাস্যোদ্দীপক বক্তৃতা ও কথোপকথন করিলেন। মাঝে মাঝে হাসির গানের দুই এক পদ চলিতে লাগিল। পরে একজন সুরাটের গুজরাতী ছাত্র হিন্দী গান ধরিলেন। বলা বাহুল্য ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীগণ ইহা আদর করিলেন না—বরং মাঝে মাঝে বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিলেন। ফরাসী জাহাজে ইংরাজ আরোহী কম—এজন্য অবশ্য বিদ্রূপ ও অপমানের পরিমাণ অল্পই দেখিলাম। যাহা হউক হিন্দুস্থানী গীত শেষ হইল। অবশেষে সেই ধুরন্ধর মহাশয় একটা কাঠের বড় পুতুল আনিয়া তাহার সাহায্যে নানা মুখ ভঙ্গী সহকারে অতিশয় আমোদজনক কৌতুকপূর্ণ ঘটনা দেখাইতে লাগিলেন। সেই মূর্ত্তিকে লইয়া ছাত্র পড়ান, গল্প করা, রোগী শুশ্রূষা, বিবাহের ঘটকালী ইত্যাদি বিবিধ প্রকার দৃশ্য দেখাইলেন। সকলেই ইহা বেশ উপভোগ করিল। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর্য্যন্ত উৎসব চলিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম চাঁদা সংগৃহীত

হইতেছে। যে টাকা উঠিল তাহা জাহাজের নাবিকগণকে বকৃশিষ দেওয়া হইবে।

রাত্রের এই সম্মিলনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেক্ কিছু সজ্জিত করা হইয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের ন্যায় পশ্চাদ্ভাগে কয়েক খানা কার্পেট ইত্যাদি ঝোলান হইয়াছিল। রমণীগণের জন্য সর্ব্বসম্মুখে আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। মাঝে মাঝে একজন রমণী রেকাবে সিগারেট লইয়া দর্শকমণ্ডলীর ভিতর ঘুরিতেছিলেন। যাঁহার যাঁহার ইচ্ছা তাঁহারা সিগার বা সিগারেট তুলিয়া লইলেন। এদিকে জাহাজের নাবিকেরা ভোজনালয় হইতে সোডা, লেমন ইত্যাদি গ্লাসে করিয়া সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিল। এই উৎসবে সর্ব্বসমেত প্রায় একশত লোক যোগদান করিয়াছিল।

বাঙ্গালার সেই পাদ্রী অধ্যাপক দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী। তিনি আমাকে পাইবামাত্রই বলিলেন, "এইরূপ অভিনয়াদি জাহাজে সাধারণতঃ হইয়া থাকে।" আমি ভাবিলাম, "যেখানে লোক সমাগম হয় সেখানেই নিজ নিজ জাতীয় প্রথা অনুসারে আমোদ প্রমোদ বিশ্রম্ভালাপ, নৃত্য গীত বাদ্য, ভাঁড়ামি, বকামি ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে আজকাল যে সব সম্মিলন হইতেছে শুধু সেগুলি লক্ষ্য করিলেই শিক্ষিত লোকদিগের অভ্যাস বুঝা যায়। সুতরাং সময় কাটাইবার জন্য আনন্দ উৎসব বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজের ইহা একচেটিয়া অনুষ্ঠান নয়। বাঙ্গালা দেশে নদী বক্ষে নৌকায়ও এরূপ হইয়া থাকে।"

নব্যবঙ্গের দার্শনিকপ্রবর

গতরাত্রি আমরা আফ্রিকার কূলে কূলে চলিয়াছি। আমাদের বাম দিকে প্রায়ই আলোক-গৃহসমূহ দেখিতে পাইলাম, এবং কিনারায় পাহাড়েও আলোক দেখা গেল। আমরা সুয়েজ উপসাগরে পড়িয়াছি। লোহিত সাগরের উত্তরাংশ দুইভাগে বিভক্ত—পূর্ব্ব উপসাগর এসিয়ার দিকে প্রবেশ করিয়াছে, পশ্চিম উপসাগর আফ্রিকার দিকে প্রবিষ্ট। আমরা এই পশ্চিম উপসাগর দিয়া যাইতেছি।

সকালে উঠিয়া দেখি ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে—মেডিটারেনীয়েন সাগরের শীতল বায়ু কিছু কিছু অনুভব করিলাম। আমাদের দুই দিকেই পর্ব্বতশ্রেণী—আকাশের স্থানে স্থানে ঈষৎ ধূসর, ঈষৎ রক্তমেঘ ও কুয়াশা-রাশি। পর্ব্বতশ্রেণীও কুয়াশায় এবং মেঘে আবৃত।

আমাদের বামদিকে আফ্রিকার কূলে প্রথমেই এক সারি অল্পোচ্চ ভূমি ও নাতিবৃহৎ পাহাড়। এই উপত্যকা ও পাহাড়ের রং লাল—গিরিমাটির মত। সমুদ্র হইতে সোজা উঠিয়াছে। মানুষ, জীবজন্তু, পশুপক্ষী বা তৃণপত্রের কোন চিহ্ন নাই। পদ্মার স্থানে স্থানে যেরূপ উচ্চ কিনারা দেখা যায়, বামদিকের রক্তপর্ব্বত ও লাল উপত্যকাও সেরূপ। তাহার পশ্চাতে আর এক শ্রেণী পর্ব্বত—কাল ও ধূসরবর্ণের দেখাইতেছে। ইহা কিনারার পাহাড় অপেক্ষা উচ্চতর—ইহাতেও কোন বৃক্ষলতার চিহ্ন নাই। সমস্তই জমাট বাঁধা মরুভূমি। আমাদের ডাহিন দিকেও এইরূপ দুই তিন শ্রেণী পর্ব্বতমালা—একের পশ্চাতে অপর শ্রেণী মাথা তুলিয়া চাহিয়া আছে। পূর্ব্বদিকের কিনারায় পর্ব্বতের বর্ণ ধূসর ও মেটে

মেটে। তাহার পশ্চাতে এই রংয়েরই উচ্চতর পর্ব্বত। এক পরদা ঈষৎ কৃষ্ণমেঘ এই প্যাহাড়শ্রেণীর শৃঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কিছুকালের মধ্যে সূর্য্যোদয় আরব্ধ হইল। মেঘের পশ্চাতে পর্ব্বতের পশ্চাতে অরুণ তপনের লাল গরিমা সমস্ত পূর্ব্বকাশকে উদ্ভাসিত করিল। যখন মেঘ ছাড়াইয়া সূর্য্যদেব দেখা দিলেন, সমস্ত পাহাড় সুবর্ণমণ্ডিত বোধ হইল— এমন কি স্বর্ণ-গঠিতই মনে হইতে লাগিল। সমুদ্র জলে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া গলান সোণার রং সৃষ্টি করিল। আমাদের সমগ্র পূর্ব্বদিকই সোনালি, সুবর্ণরচিত, স্বর্ণময় হ্রদের দৃশ্য ধারণ করিল। পূর্ব্বভাগের পর্ব্বতশ্রেণীও জনপ্রাণীশূন্য, তরুশূন্য, তৃণশূন্য।

দুই কিনারার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে মনে হইতেছে, আমরা একটা ক্ষুদ্র নদীর উপরে ভাসিতেছি। সত্য সত্যই এই উপসাগর সাধারণ নদী অপেক্ষা বিস্তৃত নয়। আকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইল। পরে দেখিলাম—ঈষৎ ধূসর, ঈষৎ কৃষ্ণ মেটে রংএর পর্ব্বতমালাও সত্য সত্যই নিকটবর্ত্তী উপত্যকা ও উচ্চভূমির ন্যায় রক্তবর্ণ, গিরিমাটির মত লাল আভাযুক্ত।

বাঙ্গালী পণ্ডিতপ্রবরকে ওলন্দাজ চিত্রকরের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলাম। চিত্রকরের পেন্সিল স্কেচগুলি দেখিয়া পণ্ডিতপ্রবর বলিলেন, "আমি ভারতীয় দৃশ্য সম্বন্ধে অন্যান্য ইউরোপীয় শিল্পীর পেন্সিল স্কেচ্‌ও দেখিয়াছি। সেগুলি অপেক্ষা এই সমুদয় উচ্চ শ্রেণীর কারুকার্য্য মনে হইতেছে।"

ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থাপত্য সম্বন্ধে এই চিত্রকরের সঙ্গে গল্প করা গেল। ইঁহার মতে, গ্রীক রচনার সঙ্গে তুলনায় মাদুরা, তাঞ্জোর ইত্যাদি স্থানের শিল্পকর্ম্ম নিন্দনীয় নয়। অনেকগুলি সমান—অবশ্য কোন কোনটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রাচীন মিশরের ভাস্কর্য্য

ইউরোপীয়েরা পূর্ব্বে আদর করিতেন না—কিন্তু সম্প্রতি সেগুলির সৌন্দর্য্যও ইউরোপের চিত্ত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইঁহার বিশ্বাস—অল্পকালের ভিতরই ভারতবর্ষের প্রাচীন মূর্ত্তি গঠন, খোদাই কার্য্য, মন্দির নির্ম্মাণ ইত্যাদির যথোচিত আদর পাশ্চাত্য জগতে আরব্ধ হইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভারতবর্ষের মূর্ত্তিগুলির চারি হাত ও তিন চোখ, সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদির উপর অবস্থান—এগুলি কি পাশ্চাত্যেরা কোন দিন বুঝিতে ও আদর করিতে পারিবে? আপনাদের চোখে এতদিন ত এই সব অতি অস্বাভাবিক, অসভ্য, প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে। কেহ কেহ ত আমাদের দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলিকে জঘন্য, বিশ্রী বীভৎস কদাকার বলিয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীন শিল্পীদিগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান আদৌ ছিল না—এইরূপই অনেক চিত্র ও মূর্ত্তি-সমালোচকগণের বিশ্বাস।"

তিনি হাঁসিয়া বলিলেন—"অস্বাভাবিক পরিকল্পনায় কি আসে যায়? প্রকৃতিবিরুদ্ধ হস্ত পদ মস্তক নেত্র থাকিলেই বা! তাহার ভিতরও কি সৌন্দর্য্য ফুটান যায় না? সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, অনুপাত, লাবণ্য, খোদাই কার্য্য ইত্যাদির জ্ঞান কি এই তথাকথিত অপ্রাকৃত রচনাসমূহে লক্ষ্য করিতে পারি না? আমার ত বিশ্বাস অতি উচ্চ অঙ্গের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ক্ষমতা ভারতীয় কারিগরগণের ছিল। আমি সম্প্রতি বাহ্য-সৌন্দর্য্য ও স্থূল আকৃতি-সৌষ্ঠবের কথাই বলিতেছি—অন্তর্নিহিত ভাবসৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি না। পাশ্চাত্যেরা ভারতীয় মূর্ত্তির বহির্ভাগ মাত্র দেখিয়া থাকে। হিন্দু দেবদেবী বা বাহনাদির ভিতরকার কথা বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নিকট আশা করা যায় না। কিন্তু তথাপি আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এইরূপ বাহ্যলাবণ্যের দর্শক এবং বোদ্ধারাও হিন্দু

মূর্ত্তিগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট কলানৈপুণ্য দেখিতে পাইবেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও অস্বাভাবিক হস্ত-পদ-বিশিষ্ট মূর্ত্তি-গুলি সত্যসত্যই উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত। যাঁহারা গ্রীক ও মিশরীয় প্রকৃতি-সঙ্গত মূর্ত্তির আদর করেন তাঁহারাও ভবিষ্যতে এই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কারুকার্য্যের মধ্যে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আদর করিতে শিখিবেন।"

তারপর চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের ভিতরকার কথা, এবং অন্তর্নিহিত আদর্শ ও ভাবরাশি সম্বন্ধে আলাপ হইল। ইনি বলিলেন, "প্রকৃতির নকল করাই ত সুকুমার শিল্প ও কলার কার্য্য নয়। শিল্পী অনেক নূতন নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিয়া জগৎকে ঐশ্বর্য্যময় করিয়া থাকেন। তাঁহার কল্পনাশক্তির পরিচয় না পাইলে তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর কারিগর বলিতে পারি কি?

গ্রীকদিগের দেবদেবীসমূহ—সেগুলিও কি কল্পনার সৃষ্টি নয়? সে গুলিও কি অন্তর্জ্জগতের চিন্তারাশির প্রতিমূর্ত্তি নয়? সেগুলি কি আমাদের পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতিবিম্ব বা নকল মাত্র? কখনই নয়—সেগুলির মধ্যেও ভাবুকতা যথেষ্ট আছে।

প্রত্যেক জাতির চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে নিজস্ব চিন্তারাশির প্রভাব থাকিবেই। সেই চিন্তারাশি নানা আকারে নানা মূর্ত্তিতে হয় ত প্রকাশিত হয়—কিন্তু মূর্ত্তিগুলির পরিকল্পনায় সামঞ্জস্য জ্ঞান সৌন্দর্য্যবোধ, অনুপাতের ধারণা দুনিয়ার লোকই বেশ বুঝিতে পারে। ভিতরকার কথা, ভাবুকতা, চিত্তের ক্রিয়া ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য স্বজাতীয়-দিগের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু সেই ভাবনারাশি যে আকারে আমাদের চোখের সম্মুখে ইন্দ্রিয়গোচর হয় সেগুলি বুঝা ত বেশী কঠিন নয়। এই কারণে আজ পাশ্চাত্য জগৎ মিশরের শিল্প আদর করিতে পারিয়াছে।

মিশরীয় ধর্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, বাহনতত্ত্ব আধুনিক খৃষ্টানজাতি এখনও সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই সত্য। কিন্তু তাহাদের শিল্পের বাহ্য অঙ্গগুলি ক্রমশই বোধগম্য হইতেছে। আমরা দিন দিন সেই প্রাচীনতম জাতির কলাজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। শীঘ্রই ভারতের প্রাচীন কলানৈপুণ্যও জগতে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিবে। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

আমাদের পাত্রী অধ্যাপক বন্ধুটি একজন কবি—ইঁহার কবিতা রচনার শক্তি বেশ আছে—কিছু কিছু রচনা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। বয়স অল্প—বোধ হয় প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে।

পাণ্ডিত্যের জগতে নাম করা এবং কাব্যমহলে নাম করা—দুই জিনিষ স্বতন্ত্র। পাণ্ডিত্যের মহলে অভিজ্ঞতা, প্রবীণতা ও বয়োবৃদ্ধি প্রধান সহায়। যত বেশী দেখা শুনা পড়া থাকে যথার্থ স্থায়ী যশোলাভের পক্ষে তত সুবিধা। ইতিহাস লিখিয়া, বা দর্শন প্রচার করিয়া বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করা যুবকের কার্য্য নয়—বরং অল্প বয়স হইলে লোকেরা রচনাগুলি সন্দেহের চোখেই দেখে। তাহারা মনে করে নিশ্চয়ই লেখকের ধারণাগুলি অপরিপক—অনুসন্ধান ও গবেষণায় যথেষ্ট সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করা হয় নাই, অধিকতর সতর্কতা এবং মনোযোগ অর্পণ করা উচিত ছিল, ইত্যাদি।

কিন্তু কবিতা-রচনার মূলমন্ত্র স্বতন্ত্র। অনেক সময়ে বিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন, প্রবীণতা ইত্যাদি না থাকিলেও লেখকের রচনায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া থাকি। অল্প বয়সে কবিমহলে ক্ষমতা দেখান অসম্ভব নয়। কাজেই যাঁহারা কবিযশঃপ্রার্থী তাঁহাদিগকে অল্পবয়সেই নামের জন্য বড় বেশী উদ্‌গ্রীব দেখিতে পাই। ৩০।৩২ বৎসরের ভিতর যাঁহারা কবি-সংসারে নাম করিতে পারিলেন না তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময়। এই জন্য যুবক কবিরা প্রতিকূল সমালোচ-

নায় নিতান্ত অধীর হইয়া পড়েন। কিন্তু ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা অপেক্ষা করিতে পারেন। ভবিষ্যতের জন্য তাঁহারা বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ করেন না—স্বকীয় প্রথম বয়সের রচনাবলীকে তাঁহারা নিজেই অবজ্ঞা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। প্রাথমিক অসম্পূর্ণতাগুলি কেহ দেখাইয়া দিলে তাঁহারা বিশেষ দুঃখিত হন না। পাণ্ডিত্যের দ্বারা যশঃ অর্জ্জন করিবার জন্য তাঁহারা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উৎসাহপূর্ণ থাকিতে পারেন।

আমাদের এই যুবক পাদ্রী কবির অবস্থা ভারতীয় নব্য কবিকুলের অনুরূপ দেখিতেছি। যুবক কবিটি বাঙ্গালী পণ্ডিত-প্রবরের গুণমুগ্ধ হইয়াছেন। ইহাঁকে জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সমালোচক জ্ঞানে সম্মান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত-প্রবরের পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনা-বিষয়ক কয়েকটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইনি স্তম্ভিত হইয়াছেন এবং বলিতেছেন "বিশ্ব-সাহিত্যের এরূপ তুলনামূলক সমালোচনা করিবার লোক জগতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন কি না সন্দেহ। ইহাঁর অন্যান্য রচনাবলী প্রকাশিত না হইলে পৃথিবী দরিদ্র হইবে।" আমি ভাবিয়া সুখী হইলাম—দেখা যাউক যদি এই নামাকাঙ্ক্ষী যুবক কবির পাল্লায় পড়িয়া আমাদের দার্শনিক-প্রবর, ইউরোপের চিন্তামণ্ডলে নূতন আলোক বিকিরণ করিতে পারেন। কারণ ইহাঁর দ্বারা কাজ করান, লেখান এবং গ্রন্থপ্রকাশ করান এক প্রকার অসাধ্য-সাধন। এতদিন ইনি যথাসম্ভব নীরবে জ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছেন। নিতান্ত বন্ধু ও শিষ্যগণ ব্যতীত ইহাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও বিস্তৃতি বেশী বাঙ্গালীই এখনও জানেন না। এমন কি কলিকাতাবাসী সাহিত্যসেবীরাও ইহাঁর ক্ষমতার বিন্দুমাত্র আভাষ পান নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পাত্রী অধ্যাপক প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন—"এই পণ্ডিতপ্রবর এত বিখ্যাত হইলেন কি করিয়া? ইঁহার লেখা ত দেখিতেছি বেশী প্রকাশিত হয় নাই। দুই চারিটা ছোট ছোট প্রবন্ধ ও বক্তৃতা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন লোকের গ্রন্থের মধ্যে পরিশিষ্টরূপে কোন কোন রচনা বাহির হইয়াছে মাত্র।" বাস্তবিক পক্ষে, ইঁহার প্রতিপত্তি অন্যান্য যশস্বী লোকের কীর্ত্তির ন্যায় কোথায়ও সুপ্রচারিত নয়। ভারতবর্ষের বেশী লোক ইঁহাকে জানেন না—পাশ্চাত্য মহলেও ইঁহার নাম তত পরিচিত নয়। তবে সকল দেশের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতেরা বোধ হয় ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছেন। সেরূপ লোকের প্রশংসায়ই ইঁহার যাহা কিছু খ্যাতি রটিয়াছে।

বিলাতের লর্ড ম্যাক্টনের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞান ও গবেষণার ইয়ত্তা করা কঠিন। এ সম্বন্ধে ইংরাজজাতির তিনি জীবন্ত বিশ্বকোষ স্বরূপ ছিলেন। ইতিহাস-সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি বিলাতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার ঐতিহাসিককে উপকরণ দিতেন এবং তাঁহাদেরই পথপ্রদর্শক ছিলেন। অথচ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার অত্যল্প রচনাই প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পরেও তাঁহার বেশী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। সত্য কথা লর্ড ম্যাক্টন জ্ঞান-অর্জ্জনে যত আনন্দিত হইতেন, জ্ঞান-প্রচারে তত উৎসুক ছিলেন না। কাজেই তাঁহার নিকট আমরা বেশী কিছু পাই নাই। আমাদের এই বাঙ্গালী পণ্ডিতপ্রবরেরও সেইরূপ মতিগতি। ইনি ২৪ ঘণ্টা জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টাই করিতেছেন—চিরকাল নানা লোককে পদার্থ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃত-সাহিত্য, ধন-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সমালোচনা ইত্যাদি বিভাগে উপাদান জোগাইয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালার বহু প্রসিদ্ধ লেখক প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহার শিষ্য অথচ ইনি নিজে বেশী কিছু লিখেন নাই।

তাহা ছাড়া ইহাঁর খ্যাতি প্রচারিত না হইবার অন্তবিধ কারণও আছে। ইহাঁকে বুঝিতে হইলে পাঠকের বিশ্বসাহিত্যে সুপরিচিত থাকা আবশ্যক। আধুনিক বিজ্ঞানসমূহের নূতনতম আবিষ্কার ও তত্ত্বগুলি জানা না থাকিলে ইহাঁর প্রবন্ধাবলী সম্যক্ বুঝা কঠিন। কিন্তু অত বিদ্যা বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরই নাই—ভারতীয়দিগের ত নাইই। আবার হিন্দু-সাহিত্য ও দর্শনের মৌলিক এবং গভীর জ্ঞান না থাকিলে ইহাঁর গবেষণাসমূহের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। বহু সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিতও বোধ হয় দেশীয় সাহিত্যে অত পারদর্শী নন—ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ সুধীদিগের কথা দূরে থাকুক। তাহার উপর, দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত তাঁহারা হয় ত নব্য দর্শন বিজ্ঞানাদির কোন তত্ত্বই জানেন না। সুতরাং তাঁহারা ইহাঁর আলোচনা প্রণালী এবং আলোচিত বিষয়ের যথার্থ মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। প্রকৃত প্রস্তাবে, পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য উভয়বিধ বিদ্যার চরম কথাগুলি জানা না থাকিলে পণ্ডিতপ্রবরের অনুসন্ধান ও গবেষণাসমূহ সম্পূর্ণরূপে বুঝা অসম্ভব। এরূপ তুলনামূলক আলোচনায় সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি ইউরোপে অতি অল্পই আছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইউরোপের এবং আমেরিকার বিভিন্ন জাতিপুঞ্জের কর্ম্ম ও চিন্তারাশির তুলনা ও পার্থক্য সাধন করিয়া থাকেন মাত্র। সমগ্র বিশ্বের—চীনীয়, জাপানী, মুসলমান, হিন্দু ইত্যাদি নূতন নূতন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও সভ্যতার বিচিত্র অঙ্গের সহিত তাঁহারা বিশেষ পরিচিত নহেন—এবং পরিচিত হইতে যথোচিত চেষ্টাও এখন পর্য্যন্ত করেন নাই। এই কারণে তাঁহাদের তুলনামূলক আলোচনাপ্রণালী আংশিক ও অসম্পূর্ণ। আমাদের এই পণ্ডিতপ্রবর জগতে সেই যথার্থ তুলনামূলক সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ। কিন্তু ইনি এখনও বেশী কাজ করেন নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের প্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্ভেথরীড্ একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর নিকট বলিয়াছিলেন "আমি মিলের ছাত্র। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকেও দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া আরও অনেক বড় বড় পণ্ডিতের সংস্রবেও আসিয়াছি। কিন্তু এই বাঙ্গালী পণ্ডিতের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও সর্ব্বমুখিনী চিন্তাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি।" আর একজন গ্রীকদর্শনে পারদর্শী পণ্ডিতও প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"আপনি খৃষ্ট ধর্ম্মতত্ত্বের মৌলিক কথা যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহা ইউরোপীয় কোন পণ্ডিতই পারেন কি না সন্দেহ।"

আমার বিশ্বাস, পাশ্চাত্য মহলে ভারতবাসী হিন্দুর পাণ্ডিত্য, ভূয়োদর্শন, জ্ঞানের ব্যাপকতা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তি দেখাইবার সময় আসিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য দর্শণ ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে পাশ্চাত্যেরা শোপেন হোভারের যুগ হইতে অনেক কথাই শুনিয়াছেন। বিবেকানন্দের প্রচার-কার্য্যেও এদিকে অনেকটা কাজ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ে একটা নূতন দিক হইতে আধুনিক ভারতের উপর বিশ্বের দৃষ্টি পড়িয়াছে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সেবায়ও ভারতবর্ষ জগতে প্রসিদ্ধ হইতেছে। আমাদের এই বাঙ্গালী পণ্ডিতের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তি ইউরোপের বিভিন্ন চিন্তাকেন্দ্রে বক্তৃতা বা কথোপকথন করিবার সুযোগ পাইলে আর একটা অভিনবভাবে ভারতবর্ষের সমাজ বিশ্বাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের চিন্তাধারা সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিতে অগ্রসর হইবে।

প্রাচীন ভারতের প্রতি জগতের যে ভক্তি আছে তাহা লইয়া বড়াই করিবার আর প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান ভারতেরও অনেক গৌরব-কাহিনী আছে—সেগুলি জগতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীর লোককে বুঝান উচিত—আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞান সভ্যতা সাহিত্য প্রাচীন ও মধ্য যুগেই শেষ হইয়া যায় নাই। ভারতের জীবনীশক্তি এখনও কার্য্য.

করিতেছে। এখনও আমাদের সমাজে নব নব চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরের অভ্যুদয় হইতেছে। তাঁহাদিগকে জগৎ প্রসিদ্ধ বীরপুরুষগণের আসরে স্থান দিতে লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল চোখ খুলিয়া আধুনিক বিশ্বের কর্ম্মশক্তি ও চিন্তাশক্তি দেখিতে অভ্যাস করা আবশ্যক। তাহা হইলেই বুঝিব—বর্ত্তমান ভারতবাসীর চরিত্রশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি সত্য সত্যই অন্যান্য জাতীয় লোকবৃন্দের তুলনায় বিশেষ হীন নয়।

দুই ধারে পাহাড় দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছি। পর্ব্বত শ্রেণী-দ্বয়কে এক্ষণে ভারতবর্ষের Deccan Trapএর মত বোধ হইতেছে। স্থানে স্থানে টেবললাণ্ড—রং প্রায়ই গৈরিক। সুয়েজবন্দর সমীপবর্ত্তী। আর প্রায় ১৫।২০ মাইলের মধ্যে বন্দরে পৌঁছিব। এসিয়ার উপকূলে মরুভূমি ধুধু করিতেছে। সমুদ্রের লাগা বালুকারাশি পরে পর্ব্বতমালা। আফ্রিকার দিকে পাহাড় সমুদ্র হইতে সোজা উঠিয়াছে।

বন্দরে আসিয়া জাহাজ থামিল। সমুদ্রের সম্মুখ ভাগ দেখিয়া কথঞ্চিৎ নাইনিতাল হ্রদের মত বোধ হইল। জল সবুজ বর্ণ। আফ্রিকার কূলে পাহাড় দূরে সরিয়া পড়িয়াছে—কেবল বালুকারাশিই বন্দরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে দেখা যায়। তিনদিকেই মরুভূমি সুয়েজ উপসাগরে গোলাকার আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছে। সাগরের এই অংশে অতিশয় অল্প জল—হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

এইখানে আমাদের সুইস ও জাপানী বন্ধু নামিয়া গেলেন। ইহাঁরা কেইরো যাইবেন। আমরাও সেখানকার যাত্রী। কিন্তু ইহাঁরা সুয়েজ খাল দিয়া পূর্ব্বে আরও গিয়াছেন। আর আমাদের এই প্রথম দেখিবার সুযোগ উপস্থিত। বিশেষতঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছি—সুতরাং কৌতূহল যথেষ্ট। আমরা সুয়েজে নামিলাম না—পোর্টসৈয়দে কাল নামিব—কাইরোতে ইহাঁদের সঙ্গে একত্র বাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম।

সুয়েজ বন্দরে নামিয়া দেখিবার সময় পাওয়া গেল না। ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকায় চড়িয়া এই অঞ্চলের আরব ফেরিওয়ালারা রঙ্গিন পোষ্ট-কার্ড, তুর্কীটুপি ও অন্যান্য জিনিষ বেচিতে জাহাজে আসিল। ইহাদের রং অপেক্ষাকৃত ফরসা—ইউরোপীয় কোন কোন জাতির সঙ্গে মিশিয়া গেলে ইহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা কঠিন। অবশ্য পোষাক এবং টুপিতে ধরা পড়িবে। এডেন ও ভারতবর্ষের মুসলমান প্রায় একপ্রকার কিন্তু সুয়েজের আরবেরা তাহাদের এই স্বধর্ম্মিগণ হইতে অনেক অংশে স্বতন্ত্র। ইহাদের শারীরিক বল বেশী—দেখিতেও ইহারা বেশী হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘকায়। মোটের উপর ইহাদিগকে তেজস্বী বলবান্ ও শ্বেতকায়রূপে বর্ণনা করিলে কোন ভুল হইবে না।

দূরবীণ লাগাইয়া কূলের বাড়ী ঘর দেখিতে লাগিলাম। সাধারণ পাশ্চাত্য ফ্যাশনের দোকান, হোটেল, কারখানা ইত্যাদি দেখা গেল। সম্মুখে বন্দর—কিছু দূরে সহর। মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুই মাইল ব্যাপী পাথরের পুল দ্বীপের মত দেখাইতেছে—ইহার উপর দিয়া রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে। বন্দর হইতে সহরে যাইতে হইলে এই রেলে অথবা নৌকায় যাইতে হয়। সহরের রেলওয়ে ষ্টেসন দেখিতে পাইলাম। সুয়েজ খালও দেখা গেল—সহর ও বন্দর এবং রেলপথের ডাহিনদিকে অর্থাৎ এসিয়ার ধারে খাল বিরাজ করিতেছে। যতখানি দেখিলাম সমুদ্রের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে খাল প্রবাহিত। সমুদ্রের সীমা হইতে খাল খাড়া উত্তরদিকে চলিয়াছে। সুয়েজ উপসাগরই যেন সোজা পথে উত্তরে বিস্তৃত হইয়াছে।

উপসাগরের ঠিক মাথা হইতে খাল বাহির হয় নাই—কিছু দক্ষিণে পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে। মাথার নিকট জল খুব অল্প এজন্য গভীরতর জলের নিকট খালের মুখ কাটা হইয়াছে।

' সুয়েজের সহর, পুল ও বন্দর হইতে দুইদিকে দুই পাহাড় দেখা যায়—অবশ্য কিছু দূরে। ডাহিনে এশিয়ার দিকে সিনাই পর্ব্বত। বামে আফ্রিকার দিকে আতাকা পৰ্ব্বত।

সুয়েজ খাল

কাল অপরাহ্ন হইতে সুয়েজ খালে ভাসিতেছি। দুইধারে বিস্তীর্ণ মরুভূমি—সর্ব্বত্র বালুকারাশি ধুধু করিতেছে। আমরা একটা সঙ্কীর্ণ নালার ভিতর দিয়া যাইতেছি। কালীঘাটের গঙ্গার সমান বিস্তৃত জল-পথ—একসঙ্গে দুইখানা জাহাজ চলিতে পারে—কিন্তু চলিবার হুকুম নাই। মাঝে মাঝে কিছু বিস্তৃততর স্থান আছে। সেখানে জাহাজ আসিলে উল্টাদিকের জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। খালের কর্ত্তাদের অনুমতি না পাইলে অগ্রসর হওয়া যায় না।

খাল রক্ষা করিবার জন্য "সুয়েজখাল-কোম্পানী"কে বিশেষ যত্ন লইতে হয়। মরুভূমি হইতে বালুকা উড়িয়া আসিয়া সর্ব্বক্ষণই খালের মধ্যে পড়িতেছে। তাহাতে খাল বুজিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এজন্য 'ড্রেজার' কলের সাহায্যে খালের তলদেশ হইতে বালু তুলিবার আয়োজন দিনরাত চলিতে থাকে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম—ওলন্দাজ-জাতীয় কুলী, নাবিক ও এঞ্জিনীয়রেরা এই কার্য্যে নিযুক্ত। হল্যাণ্ডে নির্ম্মিত ড্রেজার-কলই এই খালে ব্যবহৃত হয়। আমাদের ওলন্দাজ চিত্রকর বলিলেন—"আমরা সমুদ্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ২৪ ঘণ্টাই ড্রেজারের সাহায্য লইতে বাধ্য। আমরা নৌচালন বিদ্যায় পারদর্শী না হইলে এক মুহূর্ত্তও জীবনধারণ করিতে পারিতাম না। এজন্য জগতের মধ্যে আমরাই এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জার্ম্মাণজাতির অর্ণবপোত আমরাই নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। রাইণ নদীবক্ষে যত ষ্টীমার যাতায়াত করে সে সকলগুলিই আমাদের প্রস্তুত এবং আমরাই এই

সমুদয়ের একমাত্র মালিক। পৃথিবীর সর্ব্বত্র খাল-কাটা কাজের জন্য আমাদের দেশ হইতে ড্রেজার ও অন্যান্য কলসমূহ আমদানী করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও ওলন্দাজদিগের নির্ম্মিত ড্রেজার ব্যবহৃত হয়। প্যানামা-খাল কর্ত্তন-ব্যাপারেও একজন ওলন্দাজ এঞ্জিনীয়ার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।"

সম্প্রতি বালুকা হইতে সুয়েজ খালকে রক্ষা করিবার জন্য নূতন উপায় অবলম্বনের চেষ্টা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের বামদিকের কূলে কূলে চাষ আবাদ সুরু হইয়াছে দেখিতেছি। কিন্তু এই মরুভূমির মধ্যে বাগান তৈয়ারী করা, বৃক্ষাদি রোপণ করা, অথবা কৃষিকর্ম্ম করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। একে বালুকারাশি—দশ বিশ মাইলের ভিতর একটি মাত্র তৃণ স্বভাবতঃ জন্মে না। তাহার উপর জলাভাব। সমুদ্রের লোনা জলে চাষ করা কঠিন। লোনা জলকে পরিষ্কার জলে পরিণত না করিয়া লইলে আবাদের পক্ষে সুবিধা হয় না। কাজেই কৃষিকর্ম্মের দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী বালুকাভূমিকে সাধারণ শক্ত মৃত্তিকায় পরিণত করা বহুকাল-সাপেক্ষ এবং যৎপরোনাস্তি ব্যয়সাধ্য। অথচ সাধারণ বালুশূন্য ভূমি প্রস্তুত না হইলে বাতাসে বালু উড়িয়া আসিবেই।

খালের তলদেশ এবং দুই কিনারা সাধারণ চৌবাচ্চার মত পাথর দিয়া বাঁধান। সর্ব্বত্র ৩৬ ফিট গভীর। বিস্তার ২৬০ ফিট হইতে ৪৪৫ ফিটের মধ্যে। সুয়েজ বন্দর হইতে পোর্ট-সৈয়দ বন্দর পর্য্যন্ত খাল অবস্থিত। এই স্থানের পরিমাণ ১০০ মাইল। সাধারণতঃ, ঘণ্টায় ৬ মাইলের বেশী বেগে কোন জাহাজকে যাইতে দেওয়া হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে সাগরতুল্য হ্রদ আছে, সেই সকল স্থানে বেগে যাওয়া যায়। সমস্ত খালে প্রায় ১৩।১৪ ঘণ্টা কাটে।

এই খাল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়—কাটা সম্পূর্ণ হইতে দশ বৎসর

লাগে। ১৮৬৯ সাল হইতে খাল ব্যবহৃত হইতেছে। খালটা সাধারণ ব্যবসায়ের নিয়মে শাসিত ও পরিচালিত হয়। একটি ব্যবসায়ি-মণ্ডলী ইহার মালিক ও পরিচালক। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মিশরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা এই খাল কর্ত্তনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ফরাসী এঞ্জিনীয়ার লেসেন্সের তত্ত্বাবধানে কর্ত্তন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। সর্ব্বসমেত ২৮৫,০০০০০০৲ খরচ হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা অংশীদার হইয়া এই যৌথ কারবারের মূলধন জোগাইয়াছিল, মিশরের শাসনকর্ত্তা নিজেই ১/২ অংশ টাকার অংশীদার ছিলেন। পরে তিনি ইংলণ্ডের নিকট নিজের সমস্ত অংশ বেচিয়া ফেলিয়াছেন। এক্ষণে এই খালে মিশরের কোন স্বার্থ নাই।

২৫,০০০ মজুরের পরিশ্রম আবশ্যক হইয়াছিল। মরুভূমিতে ইহাদিগকে পানীয় জল দিবার আয়োজন করিতেই মণ্ডলীর বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। উষ্ট্র-পৃষ্ঠে বহুদূর হইতে জল আনা হইত। ইহাতে দৈনিক ৮০০০ ফ্রাঙ্ক খরচ পড়িত। পরে নাইল নদ হইতে খাল কাটিয়া আনিয়া জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৮৫৮-৬৩ সালের মধ্যে নাইলের খাল সম্পূর্ণ হয়, তখন হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে জল বহন করিতে হইত না।

প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি, খালের ভিতরেই আছি। বামদিকে কাল রংএর মাটির উপর নানাবিধ বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। বোম্বাই হইতে জাহাজে চড়িবার পর এরূপ গাছপালা আর দেখি নাই। বৃক্ষগুলি এবং নলঘাস ও তৃণসমূহ সবই সজীব সতেজ বোধ হইতেছে। Gare-De-Raz-El-Leeh নামক স্থানে কতকগুলি গৃহ দেখিতে পাইলাম—এখানের বাগান বেশ ঘনসন্নিবিষ্ট তরুসমূহে পরিপূর্ণ। খালের কিনারা হইতে ২৫।৩০ ফিট আন্দাজ বিস্তৃত ভূমিতে এইরূপ সযত্ন-রোপিত

উদ্ভিদের শ্রেণী—তাহার পর যতদূর চোখ যায় কেবল মরুভূমি। উদ্ভিদ্-রাশির মধ্য দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ডাহিনদিকে গাছ লাগাইবার প্রয়াস দেখিলাম না। খালের ধার অবশ্য বাঁধান—খানিকটা কাল মাটিতে পরিপূর্ণ বোধ হইতেছে। তারপর অনন্ত বালুকা-সমুদ্র।

এক্ষণে বায়ু পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বহিতেছে। সমস্ত রাত্রি শীত ছিল।

পোর্টসৈয়দ দেখা যাইতেছে। আর ৬ মাইল পরে আমরা কবরের দেশে পদার্পণ করিব। ভূমধ্যসাগরের জল জোয়ারের সময় আমাদের দুইদিকের মরুভূমিতে আসিয়া থাকে। তাই বহুদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বালুকার উপর জল সঞ্চিত দেখিতে পাইতেছি। বিশেষতঃ পশ্চিমদিকে একটা হ্রদ আছে—সেই হ্রদেরই পূর্ব্ব কোণে পোর্টসৈয়দ।

এই ১০০ মাইল পথের মধ্যে দুই তিন স্থানে হ্রদ পার হইতে হইয়াছে—কিন্তু রাত্রিকালে সেগুলি দেখিতে পাই নাই।

এডেনে প্রাচীন আরবদিগের কৃত্রিম সরোবর দেখিয়াছি। সুয়েজে দেখিলাম—আধুনিক মুসলমানজাতি ও ইউরোপের অধ্যবসায় এবং শিল্পজ্ঞানের সুফল। কিন্তু সুয়েজে খাল নির্ম্মাণের প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। তখনও কোন আধুনিক জাতির জন্ম হয় নাই—তখনও দিগ্বিজয়ী আলেক্জাণ্ডার ভবিতব্যের গর্ভে লুকায়িত। তখনও গ্রীক্ সাম্রাজ্য ও রোমীয় সাম্রাজ্যের কল্পনা পর্য্যন্ত মানবহৃদয়ে উপস্থিত হয় নাই। তখন বাবিলন, ভারতবর্ষ ইত্যাদি স্থানে মানবজাতির বসবাস এবং উৎকর্ষ সাধিত হইতেছিল।

খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে মিশরে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশ আধিপত্য লাভ করে। তাহার পূর্ব্বে ২৫টি রাজবংশ যুগে যুগে রাজ্য-ভোগ করিয়া মিশরদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীর এই রাজবংশ গ্রীসের সঙ্গে এবং ব্যাবিলনের সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধ ও সংগ্রাম ইত্যাদির দ্বারা মিশরের নব অভ্যুদয় সৃষ্টি করিতেছিল। এই বংশ-সম্ভূত সম্রাট্ নেকো (৬০৯-৫৯৩ খৃঃ পূঃ) নাইল নদের সঙ্গে লোহিত-সাগরের সংযোগ বিধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কার্য্য কিয়দ্দূর চলিলে পর কোন কারণে খাল কাটা স্থগিত হয়।

নেকো তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কাটা খাল অনুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই খাল ২০০০—১৫৮০ খৃঃ পূঃ সময়ের মধ্যে কাটা হইয়াছিল। নেকোর খাল কর্ত্তন প্রয়াসে ১২০,০০০ মিশরবাসীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। এজন্য নেকো ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ১০০ বৎসরের ভিতর ইহা সম্পূর্ণ করা হইয়াছিল। পারস্য সম্রাট্ ডেরিয়াস তখন মিশরে রাজত্ব করিতেছিলেন। খাল কর্ত্তন তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। আলেক্জাণ্ডারের উত্তরাধিকারী টলেমী রাজবংশীয়েরাও খাল সম্বন্ধে মনোযোগী ছিলেন—মিশরের নানাস্থানে খাল বাড়ানও হইয়াছিল। সুতরাং অতি প্রাচীনকালে নাইল নদের ভিতর দিয়া লোহিতসাগরের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের সংযোগ সাধিত হইয়াছিল বুঝিতে পারিতেছি।

মুসলমানেরাও মিশর দখল করিয়া খালের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া-ছিলেন। পরে অষ্টম শতাব্দীতে খালটা কিছু অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে—তখন হইতে ৭।৮ শত বৎসর কাল এই বিনষ্ট অবস্থায় ছিল। তারপর পঞ্চদশ শতাব্দে যখন আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হয় তখন ভেনিস নগরের ইতালীয় নাবিকেরা সুয়েজ যোজককে

প্রাণালীতে পরিণত করিতে চেষ্টিত হন। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শণিক ও গণিতজ্ঞ লাইবনিজ ফরাসি সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইকে খাল কাটিতে পরামর্শ দেন (১৬৭১ খৃঃ অঃ)। তুরস্কের সুলতান এবং নেপোলিয়ানও এ বিষয়ে মনোযোগী হন। নেপোলিয়নের সৈন্য যখন মিশর দখল করে তখন তাঁহার সঙ্গে বিজ্ঞানবিৎ এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি আসিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান ভারতবর্ষের সঙ্গে ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছায় খাল কাটিতে উৎসাহী হন। তাঁহার এঞ্জিনীয়ারেরা জমি মাপা কার্য্য সমাধা করিলেন। তাঁহাদের গণনা শুদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন—এই খাল কাটা সম্ভবপর হইবে না—কারণ লোহিত-সাগরের তলদেশ ভূমধ্যসাগর অপেক্ষা উচ্চতর—ব্যবধান প্রায় ৩৬ ফিট। কিন্তু ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী এঞ্জিনীয়ার লেসেপ্স নেপোলিয়ানের কাগজ-পত্র পড়িয়া দেখিলেন। এদিকে নূতন নূতন গণনার ফলে পুরাতন গণনায় ভুল বাহির হইতে লাগিল। শেষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খাল-মণ্ডলী স্থাপিত হয়—এবং লেসেপ্সের তত্ত্বাবধানে খাল কাটা সুরু হয়।

পোর্টসৈয়দে পৌঁছিলাম। আমাদের বামদিকে আফ্রিকার কূলে বন্দর। ডাহিনদিকে এসিয়ার কূলে মরুভূমি ধুধু করিতেছে। জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—ভূমধ্যসাগর হইতে সোজা দক্ষিণদিকে খাল আসিয়াছে। খালের জল দেখিতে সাধারণ নদীর জলের মত। বিস্তৃতি অল্পই। বিক্রমপুরে পদ্মানদী হইতে লৌহজঙ্গের খাল যেরূপ দেখায় পোর্টসৈয়দে সুয়েজখালের মুখ ঠিক সেইরূপ। বরং এখানে স্রোতের অভাব।

Port Said.
Statue de Ferdinand de Lesseps.

পোর্টসৈয়দ সুয়েজখালের ধারে ফরাসী এঞ্জিনীয়ার লেসেপ্সের প্রতিমূর্ত্তি

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবরের দেশে দিন পনর

প্রথম দিবস—পোর্টসৈয়দ, কাইরো

মিশরে পদার্পণ করিলাম। খালের প্রায় শেষ সীমায় বন্দরের এক ঘাটে উচ্চ মঞ্চের উপর একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সুয়েজখাল-নির্ম্মাতা ফরাসী এঞ্জিনীয়র লেসেপ্সের স্মরণার্থে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে।

পোর্টসৈয়দ নিতান্তই নূতন স্থান—খাল কাটা হইবার পূর্ব্বে বোধ হয় ইহার অস্তিত্ব ছিল না। এক্ষণে নানা জাতির এবং নানা ভাষাভাষীর বাস। গ্রীকদিগের সংখ্যা খুব বেশী।

নামিবামাত্র রেজিষ্ট্রেশন আফিসে নাম লিখাইতে লইয়া গেল এবং পাশপোর্ট আফিসের লোকেরাও নাম ধাম লিখিয়া দিতে বলিল। তার পর শুল্কগৃহ, এখানে অনেকক্ষণ কাটাইতে হইল। বাক্স খুলিয়া কর্ম্ম-চারীরা সমস্ত জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিল। একজন সহযাত্রীর বাক্সে নানা প্রকার কিংখাব এবং রেশমী ও সোণালি দ্রব্য ছিল। ইনি ইউরোপে বিক্রী করিবার জন্য এগুলি সঙ্গে আনিয়াছেন কিন্তু মিশরে বেচিবেন না। কাজেই মিশরবাসীরা ইহাঁর নিকট শুল্ক আদায় করিতে পারে না। কিন্তু পোর্টসৈয়দ বন্দর হইতে মিশরের ভিতরে এগুলি লইয়া

যাইতে অনুমতি পাইলেন না। তিনি যে মিশরের ভিতর এই সমুদয় বস্তু বেচিবেন না তাহার প্রমাণ কি ? সুতরাং শুল্ক-গৃহের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে এই জিনিষগুলি আলেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দরে স্বনামে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য করিল। আলেক্‌জান্দ্রিয়া হইতেই আমরা মিশর ত্যাগ করিব— এইরূপ ইহাদিগকে বলিয়াছিলাম। নূতন দ্রব্য আমদানী করিলেই বন্দরে শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু নিজ ব্যবহারের কোন জিনিষের উপর কর বসাইবার নিয়ম নাই। ব্যবসায়ের সামগ্রীর উপরই শুল্ক আদায় করা হইয়া থাকে।

পোর্টসৈয়দে নূতন কিছু দেখিবার নাই। সাধারণ পাশ্চাত্য ফ্যাসনের দোকান, হোটেল ইত্যাদি প্রধান। দুইটি মাত্র হিন্দু দোকান আছে। আমরা সহরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম কলিকাতার বড়-বাজারের সৌধগুলি এবং বোম্বাই নগরের বড় বড় "চ'ল" (Chawl) সমূহের ন্যায় এখানকার অট্টালিকাসমূহ আকাশে মাথা তুলিয়াছে। অধিকাংশই তিনচারিতলবিশিষ্ট। গৃহগুলি পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবিষ্ট ও প্রস্তরনির্ম্মিত, প্রায়ই নূতন। রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত খটখটে ও পরিষ্কার।

একটা মস্‌জিদ দেখা গেল। ভারতবর্ষের মস্‌জিদ হইতে ইহার নির্ম্মাণপ্রণালী কিছু স্বতন্ত্র। একটিও গম্বুজ নাই। চতুষ্কোণ গৃহের পূর্ব্ব-প্রাচীরের মধ্যস্থলে একটি উচ্চ স্তম্ভ রহিয়াছে। আগ্রার তাজমহলের চারিকোণস্থ স্তম্ভ অথবা দিল্লীর কুতবমিনার প্রভৃতির ন্যায় এই স্তম্ভ দুই-তিনতলবিশিষ্ট। উচ্চতায় মস্‌জিদের ত্রিগুণ। মস্‌জিদের পশ্চাতেই একটি বিদ্যালয়। ১২টার সময়ে দেখিলাম মস্‌জিদের ভিতর মুসলমানেরা পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িতেছে, কারণ মক্কা এখান হইতে পূর্ব্ব দিকে। অনতিদূরে ভূমধ্যসাগর। সম্মুখস্থ রাস্তা হইতে সমুদ্রের জল ও তরঙ্গ দেখা যায়।
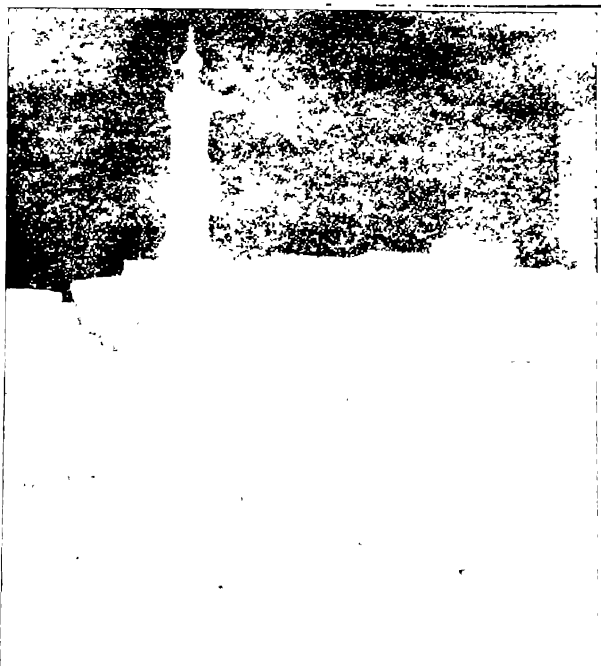
পোর্টসৈয়দ—মসজিদ

মস্‌জিদ হইতে উত্তর দিকে যাইয়া সমুদ্র দেখিতে পাইলাম। পুরীর সমুদ্র-কূলে বালির রাস্তা যেরূপ কথঞ্চিৎ উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত এবং তাহার উপর বাসগৃহ নির্ম্মিত,—এখানেও সেইরূপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমুদ্র-কিনারায় রাস্তা, তাহার উপর সমুদ্র হইতে অল্প দূরে সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত। উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে গৃহের উপর ২৪ ঘণ্টা সমুদ্রবায়ু বহিয়া যাইতেছে, সমুদ্রের কলকলধ্বনি সর্ব্বক্ষণ শুনা যায় এবং কূলে তরঙ্গাঘাত দেখা যায়। বালেশ্বরে এবং এডেনে জোয়ারের সময়ে প্রায় এক আকারেই সমুদ্রের ঢেউ আসিতে থাকে। দূর হইতে দেখা যায় অসংখ্য শ্বেত-ফেন-বিশিষ্ট জলরাশি কূলের দিকে গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। পোর্টসৈয়দের কূলে দাঁড়াইয়াও ভূমধ্যসাগরের সেই মূর্ত্তি দেখিয়া লইলাম।

পোর্টসৈয়দের উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্ব্বে সুয়েজখাল, দক্ষিণে মরুভূমি এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের সংলগ্ন একটি হ্রদ। এই হ্রদের কোণেই ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর বন্দর-অবস্থিত।

সহরের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দেশীয় লোকজনকে দেখিতে লাগিলাম। পুরুষেরা সকলেই 'গালাবি' নামক একপ্রকার পোষাক পরে; উচ্চ নিম্ন সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই ইহা সাধারণ পোষাক। ভারতীয় মুসলমানেরা আচ্‌কান চাপকান চোগা ইত্যাদি ব্যবহার করে; ইহা সেরূপ নয়, ইহা গলা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝুলিতে থাকে; গলার নীচে বুকের সম্মুখে কিছু কাটা; পেণ্ট্রক্রকের মত পরিতে হয়; চাপকানাদিতে কোটের মত বোতাম থাকে—এই গালাবিতে তাহা নাই। রমণীদিগের পোষাকও বিচিত্র। তাহারা সর্ব্ব অঙ্গ আবৃত করিয়া চলা-ফেরা করে। কাল রঙের এক প্রকার [illegible] তাহাদের আবরণ। মুখও তাহাদের ঢাকা। ইহাদের নাক ও মুখের উপর একটা লম্বা রুমাল ঝুলান, তাহাতে মাত্র চোখ দুটি বাহির হইয়া থাকে। নাকের উপর দিয়া একটা

সোণার নল কপাল হইতে ঝুলিতে দেখা গেল। সকলের পায়েই দেশীয় জুতা।

রাস্তার স্থানে স্থানে দেখিলাম সরবৎ বিক্রী হইতেছে। ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশে যেমন চক্রযুক্ত গাড়ীর উপর জিনিষপত্র রাখিয়া ফেরিওয়ালারা সেইটা ঠেলিয়া লইয়া যায় এবং তাহা হইতে বিক্রী করে, এখানে সরবৎ বেচিবার প্রথাও সেইরূপ। গাড়ীর মধ্যে আমরা ইহাদের জলপাত্র দেখিয়া আমাদের কমণ্ডলুর কথা স্মরণ করিলাম। এগুলি বদ্‌নার মত একেবারেই নয়। পিত্তলের কমণ্ডলুতে করিয়া এখানকার মুসলমান জনগণ জলপান করিতেছে দেখা গেল।

সহর দেখিয়া আমরা রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিলাম, কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ। সহরের অন্যান্য বাড়ীঘর ইট ও পাথরে প্রস্তুত। নগরে ও বন্দরে যত মিশরীয় লোক দেখিলাম সকলেরই শরীর হৃষ্টপুষ্ট, চেহারায় দুর্ব্বলতার কোন লক্ষণ নাই, ইহারা সাধারণতঃ দীর্ঘকায় এবং প্রায়ই শ্বেতাঙ্গ। চুলের রং কিছু কাল। ইহাদের লাল টুপি না থাকিলে ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জ হইতে পৃথক্ করা কঠিন। এই টুপিকে ফেজ্ বলে। পোর্ট-সৈয়দে কলিকাতার সাধারণ পাল্কীগাড়ী বা যুক্তপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের টোঙ্গা দেখিলাম না—বোম্বাই নগরের ন্যায় ফিটন ও ভিক্টোরিয়া এখানকার বিশেষত্ব।

কাইরো যাইবার জন্য ডাকগাড়ীতে চড়িলাম। ঠিক দার্জ্জিলিঙ মেলের ন্যায় ইহার বন্দোবস্ত। এক কামরা হইতে যে-কোন কামরায়ই গাড়ীর ভিতরকার বারান্দা দিয়া যাওয়া যায়, প্লাটফর্ম্মে নামিবার প্রয়োজন হয় না। ভোজনালয়ের জন্য একটা স্বতন্ত্র বৃহৎ কামরা গাড়ীর সঙ্গেই সংলগ্ন—সেখানে যাইবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

ফরাসী ও আরবী সংবাদপত্রের প্রাধান্য দেখিলাম। আমরা একটা

মিশরীয় রমণী

INDIA PRESS, CALCU
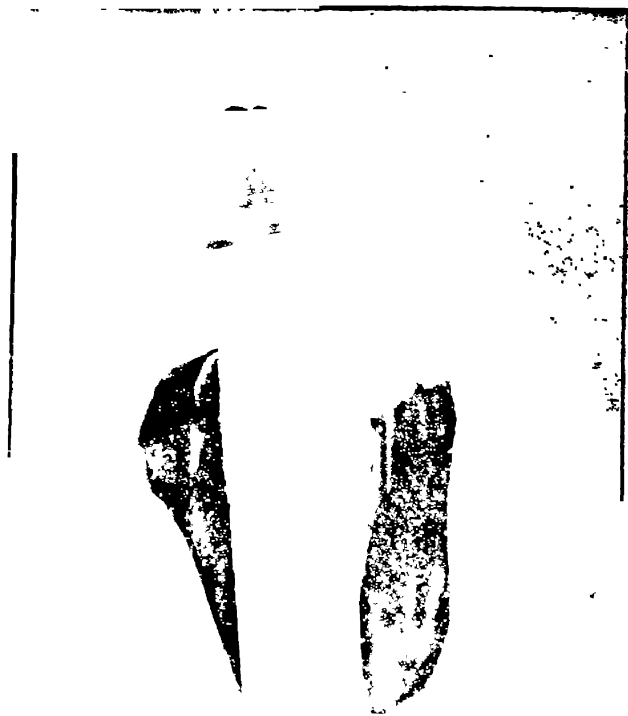
ইংরাজী পত্র কিনিয়া লইলাম। এক নব-বিবাহিত ইতালীয় দম্পতি আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য বহু ইতালীয় পুরুষ ও রমণী ষ্টেসনে আসিয়াছেন। ইহাঁরা পার্শীদের মত উচ্চ টুপি পরিধান করেন। দেখিলাম সকলেই একটা ঝুলি হইতে চাউল বাহির করিয়া নববধূর উপর বর্ষণ করিতেছেন। আমাদের কামরায় একজন প্যাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ইতালীয় এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি কিছু কিছু ইংরাজী বলিতে পারেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি। তিনি বলিলেন, 'বিবাহের উৎসব—চাউল বিকিরণ মঙ্গল-সূচক অনুষ্ঠান।' আমি বলিলাম—"বিবাহে গুড়মাখা চাউল এবং সাধারণ মঙ্গলকর্ম্মে খৈ ছড়ান হিন্দুরও কায়দা।" তিনি হাসিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। সুয়েজ খালের পশ্চিম কূলে কূলে রেলপথ। জাহাজ হইতে ইহা দেখিয়াছিলাম। আমরা ভূমধ্যসাগরের দিক হইতে সোজা দক্ষিণ যাইতেছি। এজন্য খাল এখন আমাদের বামে। জাহাজ হইতে কিনারায় যে গাছপালা দেখিতে পাইতেছিলাম এক্ষণে সেইগুলির ভিতর দিয়া আমরা যাইতেছি। আমাদের উভয় পার্শ্বেই সবুজ তৃণ পত্র গাছ গাছড়া। গাড়ী হইতে খালের নীল সবুজ জল সম্পূর্ণ দেখা যায়—অপর কিনারাও দেখিতে পাইতেছি—তাহার পর এশিয়ার অনন্ত মরুভূমি।

আমাদের বামদিকে রেলওয়ে ষ্টেশনসমূহ খালের উপর অবস্থিত। রাণীগঞ্জের টালির ন্যায় টালি দ্বারা বাঙ্গলো গৃহের ছাদ নির্ম্মিত। প্রাচীর-সমূহ কাষ্ঠময়।

ইংরাজী সংবাদপত্রের নাম The Egyptian Morning News. নামের সঙ্গে এক পংক্তি ব্যাখ্যাও আছে "in support of Egyptian interests." অর্থাৎ মিশরবাসীর স্বার্থ পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এই সংবাদ-

পত্র প্রচারিত। দেখিয়াই মনে হইল কলিকাতার "Statesman"এর কথা—যাহার অপর নাম 'ভারতবন্ধু' বা "Friend of India." আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়। পরে একজন মিশরীয় উকীলের সঙ্গে আলাপে বুঝিলাম—কাগজটা ইংরাজ কর্তৃক পরিচালিত—এবং "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" ভাবে সম্পাদক ৮৷১০ বৎসর হইতে মিশরের পরম হিতৈষী সাজিয়া কাগজ চালাইতেছেন।

কাগজে পড়িলাম এসিয়ামাইনরের স্মীর্ণা নগরে বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জন আরব্ধ হইয়াছে। মুসলমানের প্রস্তুত দ্রব্য ভিন্ন মুসলমানেরা আর কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবে না—এই প্রতিজ্ঞা প্রচারিত হইতেছে। বক্তারা নানা স্থানে বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশী আন্দোলন পরিপুষ্ট করিতেছেন।

আর দেখিলাম অষ্ট্রীয়া দেশের ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫০জন ছাত্র তাঁহাদের অধ্যাপকের সঙ্গে মিশর-পরিদর্শনে আসিয়াছেন।

দুই তিনটা ষ্টেশন পার হইতে হইতেই দেখি—উদ্ভিদ্ কমিয়া আসিতেছে—ক্রমশঃ বিরল হইল। আমরা খালের ধারে ধারেই চলিতেছি—কিন্তু বাগান ও চাষ আবাদ এদিকে এখনও বিস্তৃত হয় নাই। আমাদের চারিদিকেই মরুভূমি মাত্র। রাজপুতনার ও সিন্ধুদেশের কোন কোন অংশে ইহা অপেক্ষা ভীষণ মরুভূমির মধ্য দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ঘণ্টাখানেকের কিছু বেশী সময়ে ইস্মাইলিয়া নগরে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। সুন্দর নব-নির্ম্মিত নগর। বাগান, মাঠ ইত্যাদিতে স্থানটা মরুদেশের উর্ব্বর ভূমির ন্যায় দেখাইতেছে। ভারতবর্ষের গাভী, ছাগল, মেষ, মুরগী ইত্যাদি এখানে দেখা গেল। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ নিউবিয়ান জাতীয় লোকও অনেক দেখিলাম।

এইখানে আমাদের গাড়ী সুয়েজ খাল ছাড়িয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে
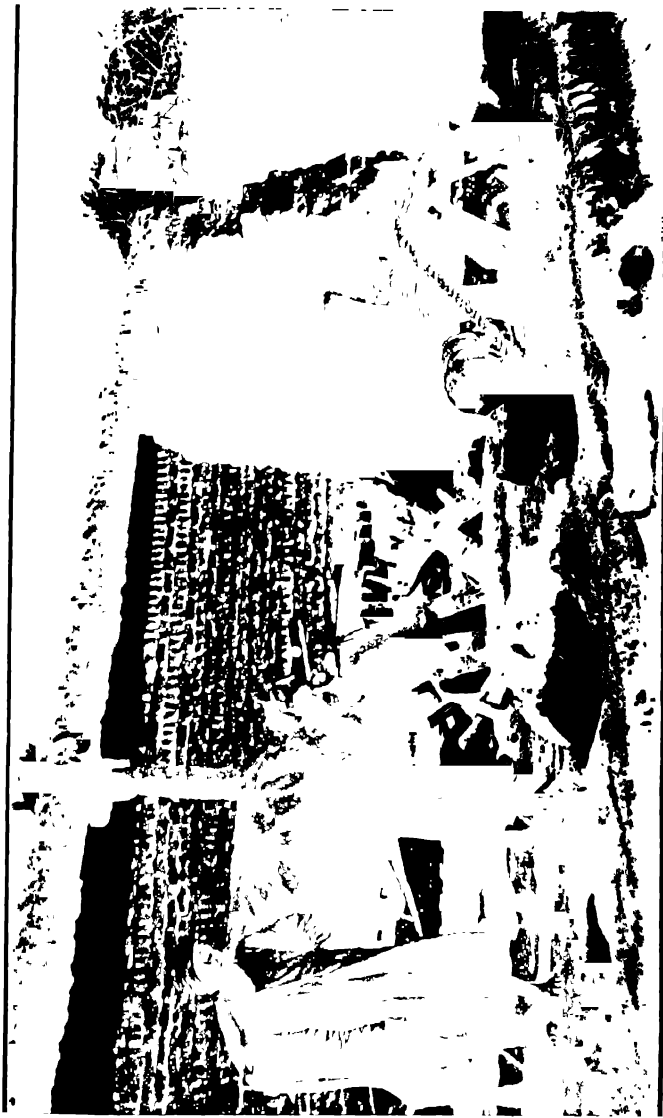
মিশরীয় কৃষিক্ষেত্রের কূপ।

চলিল—আমাদের বামে তিম্‌সা হ্রদ। এই হ্রদের ভিতর দিয়া সুয়েজ খাল প্রবাহিত হইতেছে। এখান হইতে আমরা নাইল খাল দেখিতে পাইলাম। এই খালের পার্শ্বে চষা জমি—সবই আমাদের বাম দিকে। বলদের সাহায্যে সাধারণ লাঙ্গলে এখানে চাষ চলিতেছে। উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অশ্ব ইত্যাদির উপর চড়িয়া লোকেরা চলাফেরা করিতেছে। এই সবুজ উদ্যান ও আবাদভূমির দক্ষিণে বালুকারাশি সমুদ্রের ন্যায় চক্‌চক্‌ করিতেছে। আমাদের ডাহিনে অর্থাৎ উত্তর দিকেও কেবল মরুভূমি।

আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেই চলিতেছি বাইবেলের সুবিখ্যাত "গশেন" ভূমি আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে।

চাষীরা স্ত্রীপুরুষে কর্ম্ম করে। সকলেই সর্ব্বদা পূরা পোষাক পরিয়া থাকে। ভারতবর্ষের কৃষকগণের ন্যায় ইহারা খালি গায়ে মাঠে কাজ করে না। খেজুর গাছ, স্থানে স্থানে কলাগাছ ইত্যাদিই বড় গাছের মধ্যে বেশী দেখা যায়। চষা জমি-কৃষ্ণবর্ণ।

ইস্মাইলিয়া-নগরে আমরা সুয়েজের রেলপথ দক্ষিণে ছাড়িয়া আসিয়াছি। এক্ষণে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আসিয়া আবু হাম্মাদ নগর অতিক্রম করিয়া চলিলাম। এখন হইতে অতিশয় উর্ব্বর ক্ষেত্র দিয়া যাইতেছি। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি ব্যতীত ভারতবর্ষে এরূপ সুশ্রী ও কোমল এবং নয়ন-তৃপ্তিকর স্থান আর আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের উভয় পার্শ্বেই যতদূর দৃষ্টি পড়ে কেবল চষা জমি দেখিতেছি। পীত গোধূম শস্য, কৃষ্ণবর্ণ তূলার জমি, গবাদির জন্য সবুজ ঘাস এবং শাকশব্জী—এই-সমুদয় নানা রঙ্গে রঞ্জিত কৃষিক্ষেত্র আমাদের চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই দৃশ্য ভুলিয়া যাওয়া কঠিন। এমন ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মনোরম স্থান জগতে বোধ হয় বেশী নাই। মিশরীয় বদ্বীপের এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সত্য সত্যই বড়াই করিতে পারে—

"ধনধান্য-পুষ্পে-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।"

অবশ্য মিশর যে "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" সে বিষয়ে ত কোন সন্দেহই নাই।

গাড়ী জাগাজিগ্ ষ্টেসনে আসিল। ইহাই এই পথে সর্ব্বপ্রধান নগর। ইহা বড় বড় কারবারের কেন্দ্র। রেলপথে চলিতে চলিতে দেখিলাম—বদ্বীপের মধ্যে নগর পল্লী ইত্যাদি অতি ঘনসন্নিবিষ্ট। জনপদগুলি খুবই লাগালাগি। নগরের গৃহসমূহ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত। পল্লীগ্রামের গৃহ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। বোধ হয় বাঁশ বা চাটাইয়ের বেড়ার দুই দিকে বালি লেপিয়া দেওয়াল নির্ম্মিত হয়। কি নগর, কি পল্লী, কি ইষ্টকনির্ম্মিত ভবন; কি মৃত্তিকাময় কুটীর, সকল গৃহ নির্ম্মাণেই এক কায়দা অনুসরণ করা হইয়াছে। গৃহমাত্রই চতুষ্কোণ। জ্যামিতির নিয়মে যেরূপ ক্ষেত্র নির্ম্মিত হয়, এই গৃহগুলি সেইরূপ। বারান্দা প্রায়ই নাই—ভূমির উপর গৃহসমূহ মস্‌জিদের ন্যায় দণ্ডায়মান। দেওয়াল চূনকাম করা অথবা মস্‌জিদের নিয়মে চিত্রিত। সকল গৃহই এই ধরণে গঠিত।

আমরা কাইরো নগরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমাদের দক্ষিণে কাইরো এবং পূর্ব্বে ইহার সন্নিহিত পল্লী হেলিয়োপোলিস। এই পল্লীতে মিশরের খেদিভ সাধারণতঃ বাস করেন। এই দুই নগরের পশ্চাতে শক্ত বালুকাময় পর্ব্বত দেখা যাইতেছে। যেন পর্ব্বতের পাদদেশেই এই দুই জনপদ অবস্থিত।

রেলওয়ে ষ্টেসন ভারতবর্ষের বৃহৎ ষ্টেসনগুলির সমান। তবে নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং কারুকার্য্য সমস্তই মিশরীয় ধরণের। চতুষ্কোণ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের নিয়মানুসারে সৌধ নির্ম্মিত, দেওয়াল দেখিয়া মস্‌জিদের ভিতর-কার প্রাচীর বলিয়া কিছু ভুল হয়। সমগ্র মিশরদেশের অন্যান্য গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালীই এই ষ্টেশনঘরের জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে।
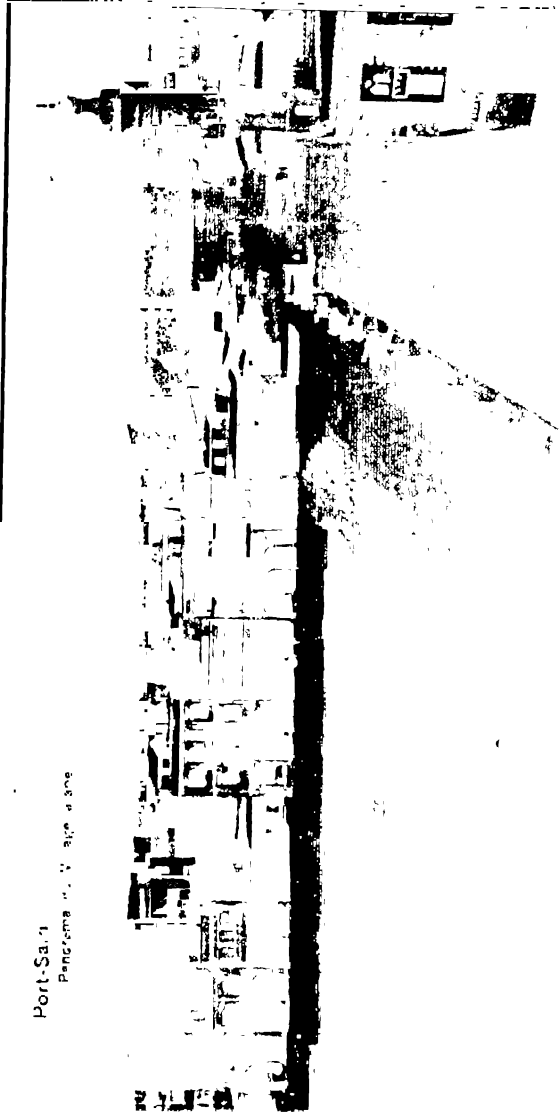
ভূমধ্যসাগরের কূলস্থিত আরবমহাল্লা—পোর্টসৈয়দ

সহরে প্রবেশ করিয়াই দেখি—এই নির্ম্মাণ-প্রণালীই সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। কি আফিস, কি হোটেল, কি দোকান, কি কারখানা, সর্ব্বত্র এক ছাঁচ, এক ধরণ, এক কায়দা। ইহাতে কলা-কৌশলের ঐক্য ও সামঞ্জস্য সর্ব্বদা চোখে পড়ে। আধুনিক ভারতবর্ষের গৃহনির্ম্মাণে কোন বিশিষ্ট কায়দার অনুসরণ করা হয় না। কেহ প্রাচীন প্রথায়, কেহ নবাবী আমলের কায়দায়, কেহ ইউরোপীয় মধ্যযুগের নিয়মে, কেহ 'গথিক্ ষ্টাইলে,' কেহ গ্রীক 'ষ্টাইলে' যাহার যাহা খুসী সে সেইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করে। বলা বাহুল্য নগরের শোভাসম্পদ ইহাতে একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। সৌন্দর্য্য হিসাবে কলিকাতা ও বোম্বাই নগরদ্বয়ের নির্ম্মাণ অতি জঘন্য শ্রেণীর অন্তর্গত। আমাদের জাহাজে এক ওলন্দাজ চিত্রকর বোম্বাই নগরের গৃহ-নির্ম্মাণব্যাপারে এই খিচুড়ি কায়দার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি গোয়ালিয়ার নগরের সৌধনির্ম্মাণপ্রণালী দেখিয়া সন্তুষ্ট, কারণ সেখানকার শিল্পকার্য্য এক বিশিষ্ট নিয়মে পরিচালিত, সকল গৃহই এক নিয়মে প্রস্তুত। কাইরো নগরে এবং মিশরীয় বদ্বীপের পূর্ব্ব অঞ্চলে সাধারণতঃ গৃহনির্ম্মাণ-কৌশলের যেরূপ সামঞ্জস্য, ঐক্য ও শৃঙ্খলা দেখা যায় তাহাতে গোয়ালিয়ারের কথাই মনে পড়িবে। অবশ্য গোয়ালিয়ারে ভারতীয় হিন্দুকায়দা, আর এখানে মিশরীয় ফরাশী প্রভাবযুক্ত মুসলমানী কায়দা, এই যা প্রভেদ।

রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট কাইরোর বাড়ীঘরগুলি দেখিয়া বোম্বাই সহরের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্ ষ্টেসনের সমীপবর্ত্তী বাড়ীঘরের কথা মনে পড়ে। কাইরো একপ্রকার পাশ্চাত্য ইউরোপীয় সহর বলিলেই চলে। কলিকাতায় বা বোম্বাই নগরে এতগুলি বড় বড় প্রাসাদতুল্য পাশ্চাত্য হোটেল, আফিস, দোকান ইত্যাদি নাই। সহরের অধিকাংশই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বড় বড় ফুটপাথ। এরূপ প্রশস্ত খট্‌খটে রাস্তা কলিকাতায়

চৌরঙ্গী রোড ভিন্ন আর একটিও নাই। বোম্বাই নগরেও একাধিক দেখি নাই।

এই সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু বাস্তু-শাস্ত্রের নিয়মে গঠিত জয়পুর-নগরের নির্ম্মাণকৌশল উল্লেখ করা যাইতে পারে। সৌন্দর্য্য, সামঞ্জস্য, বাহ্যশোভা, ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দুজাতির কিরূপ দৃষ্টি ছিল, জয়পুরে তাহা বুঝা যায়। জয়পুর দেখিয়া ভারতীয় সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান অনুমান করা যায়। তাহার মধ্যে গৃহ-রচনা-কৌশলের এবং নগর-নির্ম্মাণ-রীতির ঐক্য সবিশেষ দৃষ্টি-গোচর হয়। বোম্বাই কলিকাতা ইত্যাদির তুলনায় জয়পুর অত্যুচ্চ কলাজ্ঞানের পরিচায়ক। লক্ষ্ণৌনগর-নির্ম্মাণেও ভারতীয় মুসলমানী কায়দার একাধিপত্য দেখিয়া পুলকিত হওয়া যায়। পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত মিশরীয় মুসলমানী কায়দায় নির্ম্মিত কাইরো নগর লক্ষ্ণৌ নগর হইতে স্বতন্ত্র নিয়মে স্থাপিত। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে একটা নিজস্ব সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার জ্ঞান পরিস্ফুট। লক্ষ্ণৌর প্রধান লক্ষণ গম্বুজ ও মিনার বা স্তম্ভ। ভারতীয় সকল মুসলমানী সৌধ নির্ম্মাণেই এই রীতি অবলম্বিত। কিন্তু কাইরো নগর গঠনে গম্বুজের বাহুল্য নাই দেখিতেছি। স্থানে স্থানে গম্বুজবিশিষ্ট মস্‌জিদ্ আছে মাত্র—এবং মাঝে মাঝে মিনার দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এগুলি বোধ হয় এখানকার বিশেষত্ব নয়।

কাইরো নগরে অসংখ্য প্রকার ইউরোপীয় ও এশিয়াবাসী জাতিপুঞ্জের বাস ও কারবার। কাজেই ডাচ, গ্রীক, ইতালীয়, ব্রিটিশ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালীর প্রভাবও লক্ষিত হয়। কিন্তু সকলগুলির ভিতর দিয়া মোটের উপর একটা মুসলমানী রীতির পরিচয় পাইয়া থাকি।

কাইরোনগরের মুসলমানপাড়া।

দ্বিতীয় দিবস—মুসলমানের কাইরো

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর Dr. R. Von Wettsteinএর সঙ্গে দেখা করিলাম। ইনি প্রায় ৪০০ ছাত্র সঙ্গে করিয়া মিশর ভ্রমণে আসিয়াছেন। ইনি উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের অধ্যাপক—ইংরেজী জানেন না। আমাদের মিশর-প্রদর্শক মহাশয় দোভাষী—তিনি ফরাসীতে কথা বলিয়া আমাদের মধ্যে আলাপ করিয়া দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন, ভাষা ইত্যাদি বিষয় চর্চ্চার ব্যবস্থা আছে কি?" তিনি বলিলেন "বড় বেশী না। এক-জন প্রাচ্যদেশীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপক আছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাঁহার নাম অধ্যাপক D. Schroider." আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছাত্রগণ যে বিদেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে তাহার খরচ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনভাণ্ডার হইতে বহন করা হইবে?" তিনি বলিলেন "কিছু খরচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রমণ-ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হয়। ছাত্রদের নিজেও কিছু খরচ করিতে হয়।"

আলাপে জানা গেল—এই ছাত্রদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটই প্রায় ⅓ অংশ। ইঁহারা মিশর হইতে সীরিয়া, প্যালেষ্টিন, ক্রীট, কাণ্ডিয়া ইতালি ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিবেন। প্রতিবৎসরই এইরূপ ৪০০।৫০০ ছাত্র ইউরোপের নানাদেশে পর্য্যটন করিতে বাহির হইয়া থাকে। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে এখনও কেহ ভারতবর্ষে আসে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বসমেত ১০,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করে।

আমরা আধুনিক কাইরো-নগরের একটা জর্ম্মাণ হোটেলে বাস করিতেছি। এই অঞ্চলের বাড়ীঘরগুলি দেখিতে সবই নূতন—এই-সমুদয় একশত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মিশরীয় সুলতান মহম্মদ আলির আমলে এই বিভাগের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিলাম। ঐ দিকে মিশরের স্বদেশী মহল্লা—প্রাচীন কাইরো-নগরের জনপদ।

যাইতে যাইতে একপ্রকার গাড়ী দেখিলাম। ইহাতে ৮।১০ জন লোক বসিতে পারে। ট্রামগাড়ীর মত টিকেট লইয়া আরোহীরা এই গাড়ীতে চড়ে। গলীতে গলীতে এইগুলি যায়। সুতরাং এক হিসাবে এসমুদয় ইলেক্‌ট্রিক ট্রামের প্রতিদ্বন্দ্বী—অন্য হিসাবে ট্রাম অপেক্ষা ইহার দ্বারা বেশী উপকার পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দেশীয় লোকেরা এই ভাড়াটিয়া গাড়ী ব্যবহার করে। ইহার নাম "স্যুয়ারেস"।

পূর্ব্বভাগের এক স্থানে বিশাল মস্‌জিদ-বিদ্যালয়। ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং পারী, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ হইতেও ইহা প্রাচীন। ইহাতে ২৫,০০০ ছাত্র ও শিক্ষক পঠন পাঠন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাই প্রধান। সমস্তই প্রাচীন রীতিতে নির্ব্বাহিত হয়। এই মস্‌জিদের চারিদিককার আব্‌হাওয়া মুসলমানী ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতার অনুকূল। ভারতবর্ষের বড় বড় মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যেরূপ হিন্দুধরণের দোকান-বাজার, ধর্ম্মশালা, ইত্যাদি অবস্থিত, এই মস্‌জিদ দেখিয়াও সেইরূপ ধারণা হয়। কাশীর বিশ্বেশ্বর-মন্দির, পুরীর জগন্নাথ-মন্দির, কামাখ্যার মাতৃমন্দির, ইত্যাদি মন্দিরের ন্যায় এই মস্‌জিদ-বিদ্যালয় নানাপ্রকার জাতীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে পরিবেষ্টিত। ইহার আবেষ্টন এবং চারিদিককার ভাব ধারণা কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালী সবই মুসলমানী রীতির পরিপোষক।

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি পার হইয়া এই মস্‌জিদে আসিতে হয়। আমরা প্রায় বেলা ৩টার সময় পশ্চিম দরজায় উপস্থিত হইলাম। তখন নামাজের সময়। আমাদের মাথায় পাশ্চাত্য টুপি ছিল—এজন্য আমরা প্রবেশ করিতে পারিলাম না। অন্য সময়ে ভিতর দেখিতে পাইব আশা পাইলাম।

এই মস্‌জিদ-বিদ্যালয়ের অনতিদূরে সৈয়দ হাসান-মস্‌জিদ। কারবালার যুদ্ধে হাসানের মৃত্যুর পর তাঁহার মস্তক আরব হইতে মিশরে আনা হইয়াছিল। এই স্থানে মস্তকের কবর। ইহার মধ্যেও ইউরোপীয়েরা প্রবেশ করিতে পারে না। মহরমের সময়ে মুসলমানেরা দলে দলে আসিয়া এখানে শোকপ্রকাশ করে। শোক প্রকাশের সময়ে ইহারা এত প্রচণ্ড ও অধীর হইয়া পড়ে যে ইহাকে সৈন্য দ্বারা রক্ষা করা হইয়া থাকে। তাহা না হইলে শোকার্ত্ত মুসলমানেরা এই সৌধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অগ্রসর হয়।

সৈয়দ হাসানের নিকটেই "কাদির প্রাসাদ"। ইহা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। কেবল দুই দিকের সামান্য দুই অংশ মাত্র বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের ও ফটকের খানিকটা দেখিতে পাইলাম। আর ইহারই সংলগ্ন দক্ষিণদিকে একটা সুন্দর উচ্চ হল দেখা গেল। এই হল দোতলায় অবস্থিত। নীচে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা। এই হলে বসিয়া বিচারকার্য্য বা খোসগল্প হইত। হল বেশ সুচিত্রিত। সোণালি অক্ষরে কোরানের বয়েৎ ইহার দেওয়ালে এবং ভিতরকার ছাদে লিখিত, এই লেখাগুলিই আবার সৌধের অলঙ্কারস্বরূপ। "কাদি" প্রাচীন আমলের রাজকর্ম্মচারীর নাম। বিবাহভঙ্গ-ঘটিত বিচার-কার্য্যের জন্য কাদি নিযুক্ত হইতেন। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনটি সেই বিচারালয় ছিল।

এখান হইতে অল্প দূরে কলাবন সুলতানের মস্‌জিদ, কবর এবং

পাগলা-গারদ বা হাঁসপাতাল। এই সুলতান একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকও ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি রোগীদিগের জন্য একটা হাঁসপাতাল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই হাঁসপাতাল মস্‌জিদের সংলগ্ন ছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কবরও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই-সমুদয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি "ওয়াকৃফ্" বা দেবোত্তর করেন। মধুর ব্যবসায় হইতে যে আয় হইত তাহার কিয়দংশ এই মস্‌জিদের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছিল। লোকে এই সৌধগুলিকে পাগলা-গারদ-মসজিদ নামে জানে।

পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের বহির্ভাগে দেখিলাম—এক কোণে একটা জলের ঘর রহিয়াছে—পথিক ও মস্‌জিদের লোকজনের জন্য এখানে জল সঞ্চিত হইত। এই গৃহের ভিতরকার ছাদ সোণালি অলঙ্কারে সুচিত্রিত। প্রাচীরের অন্যান্য ভাগে কতকগুলি স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। এইগুলি একএকখানা পাথরে নির্ম্মিত—গোলাকার ও বেশ মসৃণ। স্তম্ভের উপরিভাগে প্রাচীন গ্রীসের "কোরিন্থীয়" অথবা "ডোরিক" রচনা-রীতির কারুকার্য্য। সন্ধান লইয়া জানিলাম—মিশরে প্রাচীনকালে অনেক খ্রীষ্টান গির্জ্জা ছিল। সেই-সকল গির্জ্জায় রোমান এবং গ্রীকেরা স্বজাতীয় গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী অবলম্বন করিতেন। সেই সমুদয় বিনষ্ট করিয়া সেখান হইতে মালমসলা, ইষ্টক, প্রস্তরস্তম্ভ, অলঙ্কার ইত্যাদি মুসলমানেরা বহন করিয়া আনিত। পরে মুসলমানী প্রাসাদ, ধর্ম্মমন্দির, কবর ইত্যাদির গঠনে সেই-সমুদয় ব্যবহৃত হইত। পাগলা-গারদ মস্‌জিদের বাহিরে ও ভিতরে এইরূপ অনেক গ্রীক ও রোমান গির্জ্জার উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে। নানাপ্রকার স্তম্ভই প্রধান। ভারতবর্ষেও মুসলমানেরা হিন্দু মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মস্‌জিদ ও কবর নির্ম্মাণ করিত। মন্দিরের উপকরণগুলিই মুসলমানী সৌধের মসলায় পরিণত হইত।

কাইরে জনস

পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ তাহার সর্ব্বপ্রধান সাক্ষী। কাইরোয় এই মসজিদ দেখিয়া আদিনার কথা মনে পড়িল।

কলাবন মস্‌জিদ প্রস্তরনির্ম্মিত। পূর্ব্বদিকের ফটক দিয়া প্রবেশ করিলাম। প্রবেশপথ বেশ প্রশস্ত ও উচ্চ গৃহের ন্যায়। গ্রীষ্মকালে রোগীরা এই স্থানে বিশ্রাম শয়নাদি করিত। এই পথের ছাদে কড়ি বরগা ইত্যাদি নাই।

কবরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে অতি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে চক। চকের স্তম্ভগুলিতে খ্রীষ্টান গ্রীক সাম্রাজ্যের রচনারীতি পরিস্ফুট। এই সমুদয় অন্য স্থান হইতে আনীত হইয়া এই মস্‌জিদে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কবরের গৃহ বা mausoleum প্রস্তরনির্ম্মিত; কঠিন গ্রানাইট পাথর, ঈষৎ ধূসর বর্ণ; মিশরের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত আলোয়ানের পর্ব্বতে এই পাথর পাওয়া যায়। আদিনা মস্‌জিদের গ্রানাইট পাথর কৃষ্ণবর্ণ। কলাবনের পাথর সেরূপ নয়।

মসলিয়ামের ভিতর চারিটি প্রকাণ্ড উচ্চ এবং স্থূল স্তম্ভ উপরের গম্বুজ ধারণ করিয়া আছে। স্তম্ভগুলির পরিধি দুইজন লোকে বাহু প্রসারিত করিয়া বেষ্টন করিতে পারে। এক একখানা বৃহদাকার অখণ্ড প্রস্তরে প্রত্যেকটি নির্ম্মিত।

গম্বুজের ভিতরকার অংশ অষ্টকোণবিশিষ্ট। উল্লিখিত চারিটি গোলাকার স্তম্ভ ভিন্ন অপর চারিটি চতুষ্কোণ ইষ্টকাদি নির্ম্মিত স্তম্ভ এই গম্বুজের খুঁটিস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। এই আটটি স্তম্ভের ভিতর কাষ্ঠনির্ম্মিত চতুষ্ক। চতুষ্কের দৈর্ঘ্য উত্তরে দক্ষিণে। সিকামোর বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা এই সুন্দর অলঙ্কৃত আবেষ্টন বা চতুঃসীমা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আবেষ্টনের ভিতরে কবর অবস্থিত।

সমস্ত মসলিয়ামের প্রাচীর ও ছাদ নানা অলঙ্কারে ভূষিত। মোটা মোটা সোণালি অক্ষরে কোরানের বচন লিখিত। স্থানে স্থানে নানা প্রকার মণি মাণিক্য প্রস্তরটুকরা দ্বারা প্রাচীরগাত্র অলঙ্কৃত। তাজমহলে এইরূপ প্রস্তরখচিত অঙ্কলার বেশী দেখা যায়। এই অলঙ্কার-রচনা-প্রণালী জ্যামিতিক ক্ষেত্রের নিয়মানুযায়ী। অষ্টকোণ, ষট্‌কোণ, পঞ্চকোণ ইত্যাদি ক্ষেত্রের বাহুল্য দেখিতে পাইলাম। ভারতীয় মুসলমানী সৌধেও এই অলঙ্কার-রচনা-প্রণালী সুপ্রচলিত। কলাবনের কোন কোন স্থানে দেখিলাম সোজা সোজা রেখা দ্বারা প্রাচীর চিত্রিত। রেখা-সমূহ নানারঙ্গের প্রস্তরে গঠিত। আমাদের গাইড্ মহাশয় বলিলেন "ঐ রেখাগুলি কেবলমাত্র জ্যামিতিক আকৃতিবিশিষ্ট অলঙ্কার নয়। এই সমুদয় কুফিক ভাষার বর্ণলিপি। প্রত্যেক দুই তিন রেখা দ্বারা আল্লার নাম লিখিত হইয়াছে। আরবী অক্ষর বক্রাকৃতি—সেগুলি প্রধানতঃ কোরানের বয়েৎ। কিন্তু এই সোজা রেখাগুলি দ্বারা কেবল-মাত্র আল্লার নাম প্রচারিত হইতেছে।"

আরও কয়েক স্থানে কতকগুলি চিহ্নস্বরূপ অলঙ্কার-রচনা দেখিলাম। এগুলির অর্থ বুঝা গেল না। গাইড্ বলিলেন, "আজকাল Freemason সম্প্রদায়েরা যেরূপ নানা প্রকার সঙ্কেত ও গুহ্য চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকে, এগুলি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত।" প্রাচীরের স্থানে স্থানে কতকগুলি নূতন ধরণের অলঙ্কৃতি দেখা গেল। ভারতবর্ষের মুসলমানী শিল্পে সেগুলি কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত মস্‌জিদে নানা প্রকার রংবিশিষ্ট প্রস্তর, ধাতু, মণি, অক্ষর, রেখা ইত্যাদি অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ দেখায়। রংফলান অতি সুন্দর। এরূপ রঙের খেলা বেশী শিল্পকর্ম্মে দেখিতে পাই না।

কলাবনের পূর্ব্ব প্রাচীরের জানালা হইতে একটী জীর্ণ পুরাতন

মস্‌জিদ দেখিতে পাইলাম। ইহার নির্ম্মাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রাচ্য ভারতে যাহাকে গৌড়ীয় ইট বলে তাহা কেবলমাত্র গৌড়েরই বিশেষত্ব নয়। উত্তর ভারতের নানা স্থানে সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাল্‌কা ইট দেখিয়াছি। সেই ইট কাইরোর প্রাচীন মস্‌জিদেও দেখিতেছি। এই দেশে ইহাকে রোমীয় ইষ্টক বলা হয়। প্রাচীনকালে দুনিয়ার সর্ব্বত্র কি একরূপ ইটই ব্যবহৃত হইত? কলাবন মস্‌জিদের পূর্ব্ব প্রাচীরের "কিব্‌লায়" লক্ষ্য করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রত্যেক মস্‌জিদ, কবর, মসলিয়ামেই "কিব্‌লা" থাকে। মক্কার "কাবা" যে দিকে অবস্থিত সেই দিকে মুখ করিয়া মুসলমানেরা নামাজ পড়িয়া থাকেন। মস্‌জিদাদির সেই দিকের মধ্যভাগে দেওয়ালের ভিতর কিছু অর্দ্ধগোলাকার স্থান শিল্পীরা নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য। সেই স্থানের নাম "কিব্‌লা"। কিব্‌লাতে বসিয়া ধর্ম্মগুরু নামাজ আরম্ভ করিলে তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী জনগণ নামাজ পাঠ করেন। ভারতবর্ষ মক্কার পূর্ব্বে, এজন্য ভারতীয় মস্‌জিদে কিব্‌লা পশ্চিম দিকে থাকে; ভারতীয় মুসলমানেরা পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া নামাজ পড়ে। কিন্তু মিশর মক্কার পশ্চিম দিকে, এজন্য এখানকার মস্‌জিদে কিব্‌লা পূর্ব্বদিকে; মিশরীয় মুসলমানেরা পূর্ব্বদিকে মুখ রাখিয়া নামাজ পড়েন।

কলাবনের কিব্‌লার দুইদিকে তিনটা করিয়া গ্রানাইট প্রস্তরের স্তম্ভ আছে। গোলাকার অংশের কারুকার্য্য অতি চমৎকার। নানাপ্রকার মুক্তা মাণিক্য পর্ফিরি ইত্যাদি ইহার গায়ে খচিত। নীল মণি, শ্বেত মুক্তা, কৃষ্ণ রক্ত ও পীত পর্ফিরি এবং অন্যান্য ধাতুর টুকরা দ্বারা প্রাচীরের অলঙ্কার তৈয়ারী হইয়াছে। ছাদের তলভাগ নানা রঙে চিত্রিত। সোণালি কাজের প্রভাবে সমস্ত কিব্‌লা উদ্ভাসিত। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মর্ম্মরপ্রস্তর কিব্‌লার গাত্রে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই সমুদয় ইহার একটা বিশেষত্ব।

এই কিব্‌লা সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিলাম। যাহারা সকল জিনিষ পীত দেখে, অথবা যাহাদের মাথাঘুরার ব্যারাম, তাহারা ডাহিনদিকের প্রস্তর তিনটিকে জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া অর্দ্ধগোলাকার অংশে প্রবেশ করিত। তাহার মধ্যে তাহারা লাটিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে বামদিকের গ্রানাইট স্তম্ভগুলির নিকট আসিত। সেই তিনটিকে আবার চাটিয়া তাহারা কাষ্ঠাবেষ্টনের মধ্যে কবরের নিকট যাইত। সেখানে একটা লাল প্রস্তর-ফলকে লৌহময় পদার্থ জলে ঘষিয়া তাহাদিগকে লালধাতুমিশ্রিত জল পান করান হইত। শুনা যায় এই ঔষধে মাথাঘুরা পীত দেখা ইত্যাদি অসুখ দূরীভূত হইত।

সুলতান কলাবন এই চিকিৎসার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসাপ্রণালীর আরও কয়েকটা তথ্য গাইড্ মহাশয়ের নিকট শুনিলাম। যে-সকল পাগলের নিদ্রা বেশী হইত না তাহাদিগকে ঘুম পাড়াইবার জন্য ইনি বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। তাহাদের শয্যাপার্শ্বে উৎকৃষ্ট গল্পকথকেরা কথা বা কাহিনী শুনাইত। অথবা নিকটবর্ত্তী কোন গৃহে বসিয়া বাদক ও গায়কেরা সঙ্গীত চর্চ্চা করিত। এইসকল গল্প ও গান শুনিতে শুনিতে রোগীরা ঘুমাইয়া পড়িত। তিনি আরও একটা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। রোগীদিগকে বিছানায় শোয়াইয়া তাহাদের পায়ের তলা মালিস করিবার ব্যবস্থা করিতেন। তাহাতেও সহজেই ইহাদের নিদ্রা আসিত।

এই মস্‌জিদের নানাস্থানে নানাপ্রকার স্তম্ভ দেখা গেল। এইগুলি অন্যস্থান হইতে আনা হইয়াছে। কোন কোন স্তম্ভ প্রাচীন মিশরীয় যুগের ধরণে প্রস্তুত। সেগুলির উপরে করিন্থীয় রীতির শিরোভাগ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কতকগুলি নূতন প্রকার অলঙ্কারও দেখা গেল। মোচার মত ত্রিকোণ অলঙ্কার প্রাচীরগাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর

কাইরোর স্বদেশী বাজার

দ্বারা রচিত। দুই এক স্থলে সরু পাথরের সূত্রের দ্বারা দেওয়ালের উপর জালের চিহ্ন লিখিত হইয়াছে।

কবর হইতে আমরা পাগলা-গারদের দিকে গেলাম। গারদের কোন অংশই বর্ত্তমান নাই। কেবল প্রশস্ত পথটা মাত্র রহিয়াছে—ইহার মেজে বাঁধান এবং ছাদও খিলানযুক্ত। এই পথকে গ্রীষ্মের সময়ে দিবাভাগে শয়ন-গৃহরূপে ব্যবহার করা হইত। পাগলা-গারদের এই প্রশস্ত পথে প্রবেশ করিবার সময়ে একটা প্রস্তর নির্ম্মিত জালের দিকে গাইড্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সেই জালের মধ্যে আরবী অক্ষর কৌশলের সহিত লিখিত হইয়াছে। তিনি পড়িয়া দিলেন—"আল্লা"।

কলাবনের মস্‌জিদ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে অন্যান্য মস্‌জিদের ন্যায় ওয়াকৃফ সম্পত্তির নিয়মে রক্ষিত হইতেছে। মিশর রাষ্ট্রে ওয়াকৃফ্ বিভাগের কার্য্যাবলীর জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রণাসভা আছে। খেদিভ এই সভার নায়ক।

কলাবন দেখিয়া দেশীয় বাজারের ভিতর দিয়া চলিলাম। ভারতের যুক্ত প্রদেশের পুরাতন সহরগুলির প্রায় অনুরূপ। বাজার, দোকান, গলি, জিনিষপত্র, শাকশব্জী সবই প্রায় ভারতবর্ষের মত। তরকারীও আমাদের পরিচিত। দোকানীরা বড় বড় ফরশীর নলের সাহায্যে গুড়গুড়ি হইতে তামাকু সেবন করিতেছে। এখানে পান জন্মে না, কাহাকেও পান খাইতে দেখিলাম না। এখানকার লোকেরা মাথায় বা গায়ে তেল মাখে না।

বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে নগরের একটা পুরাতন প্রাচীর দেখিতে পাইলাম—তাহার একটা ফটকও পার হইতে হইল। প্রাচীন কালে ভারতের সর্ব্বত্রই নগরের চারিদিকে প্রাচীর থাকিত। কাইরো

নগরেও ছিল বুঝিতেছি। কোন কোন গলিতে দেখিলাম—মাথার উপর বারান্দা ঝুলিতেছে, এবং দোতালার বা তিন তালার ছাদ বাড়াইয়া দিয়া গলির ছাদ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই ছাদের দ্বারা সূর্য্যের তাপ হইতে নীচের লোকেরা রক্ষা পায়। পথে বহু মস্‌জিদ ও মসলিয়াম পড়িল। অনেকগুলিতেই গম্বুজ আছে।

খানিক পরে আমরা প্রাচীন দুর্গে প্রবেশ করিলাম। ইহা সুলতান সালাদিনের সময়ে নির্ম্মিত। পুরাতনের বড় বেশী কিছু অবশিষ্ট নাই—অধিকাংশই নূতন তৈয়ারী। আজকাল এখানে ইংরাজ-সৈন্য বাস করে। ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা ৪০০০এর কিছু বেশী। মিশরে ইংরাজেরা শান্তি রক্ষার জন্য এই সৈন্য রাখিতে অনুমতি পাইয়াছেন। প্রতি রবিবার দুর্গে ইংরাজ-পতাকা উড়ান হয়—এবং শুক্রবারে মুসলমান নিশান উড়িতে থাকে।

এই দুর্গ কাইরোর সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত—প্রায় পাহাড়ের মত উচ্চ ভূমির উপর ইহা নির্ম্মিত। এখান হইতে কাইরো নগর অতি সুন্দর দেখায়। দুর্গের মধ্যে আমরা মহম্মদ আলির মস্‌জিদ দেখিলাম। ইহাকে মর্ম্মর মস্‌জিদ বলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহম্মদ আলি মিশরে নবজীবন সঞ্চারিত করিতেছিলেন। তিনি ইউরোপের নানাস্থানে মিশরীয় ছাত্র পাঠাইয়াছিলেন। ইহাঁরা ভাস্কর্য্য ও এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ফরাসী জাতির ও ফরাসী শাসনকর্ত্তাদিগের বিশেষ বন্ধুত্বও ছিল। এই কারণে ফরাসী প্রভাব তাঁহার আমলে মিশরে প্রবলরূপে প্রবেশ করে। এই মস্‌জিদ আয়তনে দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদের মত। আগ্রার সিকান্দ্রা হইতে ইহা বড়। মর্ম্মরের কার্য্য হিসাবে ইহাকে তাজমহলের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু শিল্পের রীতি হিসাবে ইহা ভারতীয়
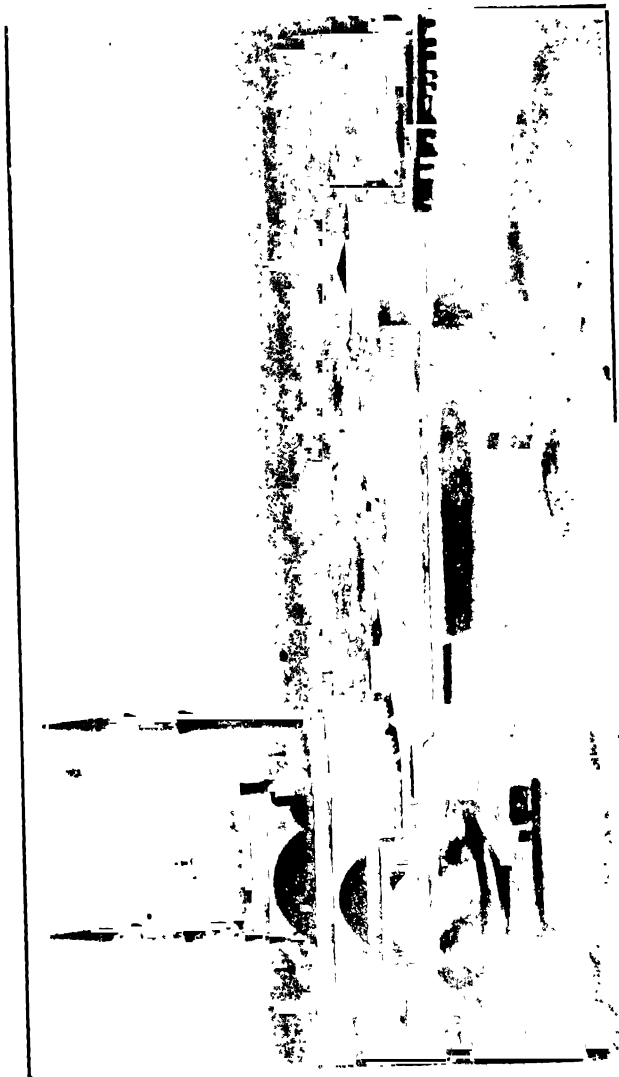
প্রাচীন সালাদিন দুর্গে মহম্মদ আলির মর্ম্মর-মস্‌জিদ।

INDIA PRESS CALCUTTA.

সৌধগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কনষ্টান্টিনোপল নগরের সেইণ্টসোফিয়া গির্জ্জা-মস্‌জিদের অনুকরণে ইহা নির্ম্মিত।

মস্‌জিদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে নূতন এক প্রকার জুতা পরিতে হইল। যে জুতা পায়ে ছিল তাহা ত্যাগ করিলাম না, দ্বাররক্ষকেরা মিশরীয় চটিজুতার দ্বারা আমাদের জুতা আবৃত করিয়া দিল। আমরা মিশরের নৌকাতুল্য পীত স্বদেশী জুতা পায়ে দিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থলে হাত পা ধুইবার জন্য মর্ম্মর-নির্ম্মিত জলের কল। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে বারান্দা, বারান্দার ছাদের উপর বারটা করিয়া অর্দ্ধ-গম্বুজ। এই গম্বুজসমূহের মাথায় ত্রিশূলাকার অর্দ্ধচন্দ্র। এক বারান্দায় একটা ঘড়ি। ফরাসী রাজা লুইফিলিপ মহম্মদ আলিকে ইহা উপহার দিয়াছিলেন।

পশ্চিমদিক হইতে মসলিয়ামে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—উৎকৃষ্ট কার্পেটে মেজে ঢাকা। প্রকাণ্ড হল—বোধ হয় আট হাজার লোক এক সঙ্গে বসিয়া নামাজ পড়িতে পারে। প্রায় দুইশত কাচের লণ্ঠন ছাদ হইতে ঝুলিতেছে, সকলের মধ্যখানে একটা প্রকাণ্ড মোম বাতির ঝাড় বোধ হয় ৩০০ ডালওয়ালা। ইহা অপেক্ষা ছোট কিন্তু বেশ বড় ঝাড় আরও ৮।১০টা হলের নানাস্থানে ঝুলিতেছে। ছাদ হইতে পিত্ত-লের শিকলে গোলাকার চক্র ঝুলান হইয়াছে। এই চক্রের সঙ্গে কাচের লণ্ঠনগুলি সংলগ্ন। এতদ্ব্যতীত বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থাও মস্‌জিদের অভ্যন্তরে দেখিতে পাইলাম।

প্রধান গম্বুজ একটি। অর্দ্ধ গম্বুজ চারিটি। পশ্চিম প্রাচীরে দুইটি প্রকাণ্ড মিনার। এই মিনার ও গম্বুজগুলি কাইরো-নগরের বহুদূর হইতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মসলিয়ামটা সমস্তই মর্ম্মরনির্ম্মিত। দেওয়াল ও ছাদ সুবর্ণের অক্ষর,

রেখা এবং জ্যামিতিকক্ষেত্রে সুচিত্রিত। আরবী কোরানের বয়েৎও অনেক। অর্দ্ধ-পদ্মফুলের চিত্র, গৃহদ্বার, এবং অন্যান্য অনেক প্রকার অলঙ্কারের দ্বারা গম্বুজের ভিতরকার ছাদ সুশোভিত।

এই মর্ম্মর মস্‌জিদের কিব্‌লার দিকে একটা নূতন জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। ডাহিন দিকে সিঁড়ির সাহায্যে একটা উচ্চ বেদীর উপর উঠা যায়। এই বেদীর উপরিভাগে হিন্দুদেবালয়ের শিখরের ন্যায় শিরোদেশ। তাহার উপর ত্রিশূলাকার অর্দ্ধচন্দ্র। বেদীর তলদেশ হইতে শিখরের উর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত সমস্তটা দেখিলে একটা হিন্দুমন্দির বলিয়া মনে হয়।

এই বেদীর উপর বসিয়া ইমাম বা প্রধান পুরোহিত ধর্ম্মবক্তৃতা পাঠ করেন। তিনি তখন পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া থাকেন—শ্রোতৃমণ্ডলী পূর্ব্বমুখ হইয়া বসে। বক্তৃতান্তে তিনি নামিয়া আসেন এবং কিব্‌লায় যাইয়া অন্যান্য লোকের ন্যায় পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া নামাজ পাঠ করিতে থাকেন।

এই মস্‌জিদের ভিতর দিয়া উপরিভাগে উঠা যায়। সেখানে চারি-দিকে বারান্দার মত স্থান আছে। পূর্ব্বে যখন বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা ছিল না তখন ভৃত্যেরা উপরে উঠিয়া বাতি জ্বালিয়া দিত।

আজ রাত্রে একবার সহর দেখিতে গেলাম। প্রত্যেক রাস্তায় অসংখ্য 'কাফে' বা কাফি, মদ, তামাক ইত্যাদির দোকান ও হোটেল। এত হোটেল ও খানাঘর ভারতবর্ষের কোন নগরেই নাই। বোম্বায়ের চা কাফির দোকানও সংখ্যায় এত বেশী নয়। কাইরোর মধ্যে এই-সকল দোকান ও হোটেল একটা প্রধান দেখিবার জিনিষ। গ্রীক, ইতালীয়, মিশরীয়, আরব, ইহুদি, ইত্যাদি জগতের সকল জাতি আসিয়া এই নগরে জুটিয়াছে। যেখানে সেখানে মদ্যপান, কাফিপান, মাংস ভোজন ইত্যাদির

আয়োজন। শত শত লোক ২৪ ঘণ্টা এই-সকল হোটেলে যাওয়া-আসা করিতেছে। রাত্রিকালেই এই-সমুদয়ের পশার। এই সময়ে কাইরো-নগর দেখিলে মিশরীয় জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। ইহারা অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়, চরিত্রহীন, ও ব্যয়শীল। ইহাদের মধ্যে গাম্ভীর্য্য, দৃঢ়তা, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আদৌ আছে কি না সন্দেহ। রাস্তার অর্দ্ধেক ভাগ জুড়িয়া হোটেলের চেয়ার টেবিল সাজান হইয়াছে। খোলা আকাশের নীচে বসিয়া বিলাসী মুসলমান খৃষ্টান সকলে আমোদ প্রমোদে মগ্ন। দুই তিনটা মাত্র রাস্তার কাফে ও হোটেলগুলি দেখিয়াই মনে হইল বোধ হয় ৩০০০ লোক রাত্রিকালে এই উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছে।

একটা আরব নৃত্যগীতের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—সেখানে প্রকাণ্ড ভাবে চরিত্রহীনতার ও অসংযমের চূড়ান্ত আয়োজন চলিতেছে। কাহারও কোন চক্ষুলজ্জা নাই। নাচ গান হাসি ঠাট্টায় কিছুমাত্র বাধা নাই। নীতিভ্রষ্ট দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী এই সংযমে যোগদান করিতে দ্বিধা করে না। মোটের উপর এই গৃহটা রাত্রিকালে জঘন্য পিশাচ-জীবনের তাণ্ডবলীলায় পরিপূর্ণ থাকে। অথচ সহরের মধ্যস্থলে জনগণের সম্মুখে এই উৎকট ক্রিয়ার অভিনয় হয়!

আরবী গীত শুনিয়া আমাদের যাত্রাদলের কথা মনে পড়িল। সেই চোগাচাপকানপরা জুড়িমহাশয়গণের গান—তাহাদের লম্বা লম্বা রাগিণীর টান, কানে হাত দিয়া চেঁচান, আরবীগণের কস্‌রতে দেখিতে পাইলাম। দেখিতেছি হিন্দু ও মুসলমানের কালোয়াতি অনেকটা একরূপ। এখানে সেতার, তবলা, বেহালা, এই-সবই প্রধান বাদ্যযন্ত্র। হার্ম্মোনিয়ামের ব্যবহার দেখিলাম না। করতাল বাজান হইতেছিল। বাদ্যযন্ত্রের সুরে ভারতীয় বাজনার আওয়াজ পাওয়া গেল। তবে গানের সুর কিছু

একঘেয়ে বোধ হইল। নাচিবার কায়দাও স্বতন্ত্র; অবশ্য পাশ্চাত্য বল নাচের সঙ্গে কোন মিল বা সংযোগ নাই; ভারতীয় বাই, খেমটা ইত্যাদি নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করা চলিতে পারে; কিছু সাম্য আছে।

তৃতীয় দিবস—মুসলমানের কাইরো

আজ মিশরবাসীদিগের এক জাতীয় উৎসবের দিন। খৃষ্টান মুসলমান সকলে মিলিয়া আজ আনন্দে মগ্ন। মিশর রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ছুটি। দোকানবাজার সবই বন্ধ। সকল শ্রেণীর লোকই উৎসবে যোগদান করিতে প্রবৃত্ত। উৎসবের নাম "সিম্মানেসিম্" বা বায়ুর ঘ্রাণ গ্রহণ। বাগানে মাঠে গাছতলায় দলে দলে লোক সমবেত হইতেছে। অনাবদ্ধ প্রকৃতির মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে আসিবার জন্য জনগণ নানাপ্রকার বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া ঘরবাড়ীর বাহিরে বেড়াইতেছে। ভারতের বসন্তোৎসব, হোলী ইত্যাদির সঙ্গে বোধ হয় এই উৎসব একশ্রেণী-ভুক্ত। উদার আকাশের তলে খোলা মাঠের বায়ুসেবন করাই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের, দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনার কোন সংশ্রব নাই। শিল্প, ব্যবসায় বা ধনসম্পত্তি সম্পর্কিত কোন হাট বাজার বা সম্মিলনও কোথাও দেখিতেছি না। বরং দোকানী বাজারী সকলেই ব্যবসায় বন্ধ রাখিয়াছে। কোনরূপ রাষ্ট্রীয় ঘটনা বা সংগ্রামে জয়-পরাজয়-ঘটিত অনুষ্ঠানেরও প্রভাব লক্ষ্য করা গেল না। বৎসরের মধ্যে একদিন মিশরবাসীরা প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া মিশিবার জন্য উদ্‌গ্রীব; এজন্য মন খুলিয়া পাখীর মত স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করে। এই স্বাধীনতার ইচ্ছাই, এই প্রকৃতির সহবাসের আকাঙ্ক্ষাই মিশরের এই সার্ব্বজনীন উৎসবের মূলকারণ বিবেচনা করা যাইতে পারে।

এই উৎসব বহুপ্রাচীন, মুসলমানদের নূতন সৃষ্টি নয়; অথচ মুসলমানেরা ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা যখন মিশর অধিকার করে তখনই ইহা সমগ্র-জাতির মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমানেরা মিশরের এই সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠানকে বর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া রক্ষা করিয়াই আসিয়াছে। রোমান ও গ্রীক আমলে ইহা বর্ত্তমান ছিল। পুরাতন মিশরীয়দিগের দ্বারা বোধ হয় ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। নাইল পূজার ন্যায় ইহা মিশরদেশের অধিবাসিগণের প্রকৃতিপূজার অন্যতম অঙ্গ।

এই প্রাচীনতম অনুষ্ঠানে মিশরের আধুনিক গ্রীক, ইহুদি, আর্ম্মিনিয়ান্, কপ্‌ট্, আরব, ইতালীয়, ফরাসী, জার্ম্মাণ, সীরিয়, সকল জাতিই সমান উৎসাহী। যুগে যুগে সকল জাতিই মিশরের এই স্বদেশী উৎসব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের আধুনিক হিন্দুগণ যে সকল পূজা উৎসব ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে সেগুলি ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে বুঝা যায় কত অহিন্দু অনুষ্ঠান ক্রমশঃ হিন্দু অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান, সকল প্রকার ধর্ম্মের বহু অঙ্গ আধুনিক হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে।

আজ কাইরোনগরের উত্তরপূর্ব্বদিকে হেলিওপোলিস্ নগর দেখিলাম। রেলে যাত্রা করা গেল। ডাহিনে সুন্দর সুন্দর নবনির্ম্মিত গ্রীক, ডাচ, ফরাসী জাতিদিগের প্রাসাদতুল্য সুরম্য অট্টালিকা। বামে কৃষিক্ষেত্র ও উদ্যান। পথে খেদিভের বাসভবন "কুব্বা" ও তৎসংশ্লিষ্ট বাগান। তাহার ডাহিনে নূতন প্রতিষ্ঠিত নগরের হর্ম্ম্যসমূহ। আমরা এই নূতন অট্টালিকা দেখিবার জন্য নামিলাম না। বরাবর প্রাচীন হেলিয়োপোলিস নগরের উদ্দেশ্যে চলিলাম।

ষ্টেশন হইতে নামিয়া তুঁতগাছের সারি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর

যীশুজননীর সিকামোর বৃক্ষ—হেলিয়োপোলিস্
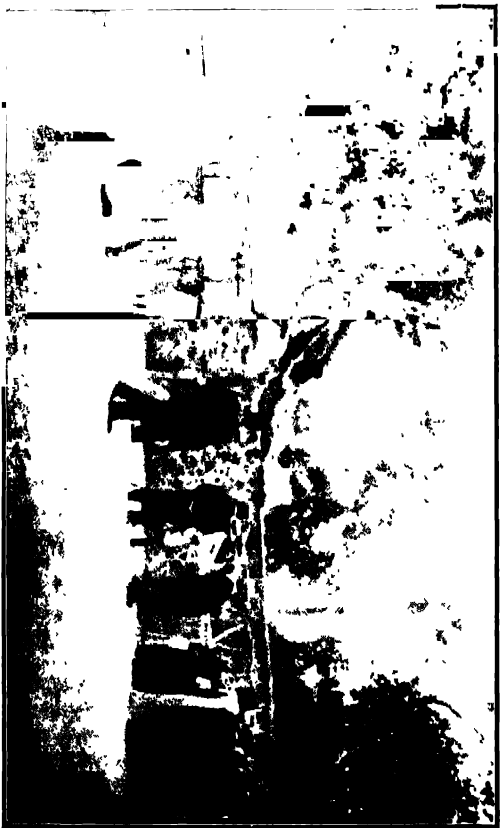
India Press, Calcutta.

হইলাম। খানিকদূর হাঁটিয়া যাইয়া একটা বাগানে প্রবেশ করিলাম লেবুগাছের সুন্দর সুগন্ধ আমাদিগকে পুলকিত করিতে লাগিল। এই বাগানে বাইবেল-বিখ্যাত সিকামোর বৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। প্রবাদ এই যে এই তরুতলে কুমারী মেরি সন্তান যীশুকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেরডের অত্যাচারে জোসেফ মেরি এবং যীশু গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে মরুভূমি পার হইয়া মিশরের এই স্থানে পলাইয়া আসেন। এইখানে একটা কূপও আছে। এই কূপের জল সুমিষ্ট। অথচ এ অঞ্চলে অন্যান্য সকল কূপের জলই ঈষৎ লবণাক্ত। খৃষ্টানগণের বিশ্বাস—ভগবৎসন্তান এই কূপের জল পান করিয়াছিলেন, এই জন্যই ইহার মাহাত্ম্য।

সিকামোর বৃক্ষ জীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। ভারতবর্ষের "অক্ষয় বট" বৃক্ষগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মেরির এই তরুটি অনেকবার শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে নূতন নূতন চারা জন্মিয়া ইহার পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে গাছটা দেখিলাম তাহা প্রায় ৩০০ বৎসরের হইবে। বৃক্ষটি গোড়া হইতেই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষত্বক্ শুকাইয়া গিয়াছে। গাছের পাতা একটি শাখায় সামান্য মাত্র দেখিতে পাইলাম। গাছের গায়ে নানা লোকে ছুরি দিয়া নাম লিখিয়া রাখিয়াছে।

কূপের জল তুলিবার জন্য দুইটি পারস্যদেশীয় চক্র ব্যবহৃত হয়। চক্র দুইটির পরিধিতে কতকগুলি জলপাত্র সংযুক্ত আছে। চক্র ঘুরিতে থাকিলে পরে পরে ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্র হইতে জল পাওয়া যায়। দুই-দিকে দুইটি বলদ তেলের ঘানি ঘুরাইবার রীতিতে ঘুরিতেছে। বলদের ঘুরিবার ফলে কূপ হইতে জল উঠিতে থাকে। এই দুইটি চক্রের জল একটি স্রোতে চালিত করা হইয়াছে। এই জলের দ্বারা বাগানের উদ্ভিদ্‌গুলি সতেজ রাখা হয়। এরূপ ঘটীচক্র ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টানের এই তীর্থক্ষেত্রে ধর্ম্মঘটিত কোন অনুষ্ঠান দেখিলাম না। গাছতলায় খৃষ্টানেরা বসিয়া বা শুইয়া রহিয়াছে মাত্র। কোন পূজা উপাসনা বা প্রার্থনা কিম্বা বক্তৃতা হইল না।

এই উদ্যান রোমীয় আমলে ক্লীয়োপেট্রার প্রমোদকানন ছিল। মিশরের এই রাণী তাঁহার বিভিন্ন প্রেমাকাঙ্ক্ষীগণকে যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ রাখিবার জন্য এই বাগানে বালসাম এবং অন্যান্য মাদক উদ্ভিদের চাষ করিতেন। এইসকল উদ্ভিদ উপহার দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতেন।

এই বাগান হইতে উত্তর দিকে মাইল খানেক যাইয়া প্রাচীন হেলিয়োপোলিস বা সূর্য্য-নগরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। কতকগুলি তুঁত গাছের বীথির ভিতর দিয়া একটা গ্রানাইট প্রস্তরের চতুষ্কোণ স্তম্ভ দেখা গেল। ইহা বিখ্যাত ওবেলিস্ক। প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরের দ্বাদশ রাজবংশসম্ভূত সম্রাট সীসষ্ট্রিস একটি উৎসবের স্মরণচিহ্নস্বরূপ দুইটি ওবেলিস্ক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত সূর্য্যমন্দিরের সম্মুখে এই ওবেলিস্ক দুইটি অবস্থিত ছিল। মন্দিরের কোন অংশই এখন বর্ত্তমান নাই। প্রাচীন নগরেরও কিছুই এখন আর দেখা যায় না। মাত্র ওবেলিস্ক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীন দেওয়ালের মৃত্তিকারাশি পাহাড়ের স্তূপের ন্যায় দেখা যাইতেছে।

প্রাচীন মন্দিরের ভূমিতে এক্ষণে তূলা, ইক্ষু, শব্জী, ঘাস, গোধূম ইত্যাদি নানা শস্যের চাষ হয়। পুরাতন ভগ্ন গৃহ ও নগরের চুন সুরকী হইতে মাটিতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়, এজন্য এই ভূমি অতিশয় উর্ব্বর।

ওবেলিস্কের নিম্নভাগ প্রায় ৭.৮ ফুট বিস্তৃত। ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া ইহা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। শিরোভাগ বেশী সঙ্কীর্ণ নয়। সর্ব্বোপরি পিরামিডের ন্যায় একটা ত্রিকোণ। উচ্চতায় স্তম্ভটি ৬৬ ফুট। একখানা ঈষৎরক্ত গ্রানাইট পাথরে ইহা নির্ম্মিত। আসোয়ানের পর্ব্বত

হইতে এই লাল গ্রানাইট সংগ্রহ করা হইত। এই বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির প্রাচীন মিশরের বিদ্যালয় ও ধর্ম্মশিক্ষালয় ছিল। এইখানেই মিশরীয় প্রধান প্রধান দেবতার পূজারীদিগের শিক্ষালাভ হইত। পরবর্ত্তী কালে গ্রীক ও রোমান পণ্ডিত সকলেই এই মন্দিরে আসিতেন। দার্শনিক প্লেটোও এইখানেই ১২ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য ওবেলিস্ক সেই প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান মানবকে মহা অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। হেলিয়োপোলিস এই কারণে দুনিয়ার বাণী-সেবক মাত্রেরই তীর্থক্ষেত্র।

ওবেলিস্ক স্তম্ভের চারি গাত্রে হায়েরোগ্লিফিক অক্ষরে লেখা আছে। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নভাগের দিকে পাঠ করিতে হয়। কোন্ সময়ে কে কি জন্য এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এই লেখার দ্বারা তাহা বুঝা যায়।

ওবেলিস্ক দেখিয়া গর্দ্দভপৃষ্ঠে চড়িয়া ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিলাম। মাথায় মিশরীয় লাল ফেজ। দূর হইতে কাইরো নগরের গৃহগুলি দেখিতে দেখিতে এবং প্রকৃত মিশরবাসীর ন্যায় প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে করিতে ষ্টেসনে আসা গেল। গর্দ্দভে আরোহণ ভিন্ন এ অঞ্চলে গতি নাই।

আজ মস্‌জিদ্-বিদ্যালয় দেখিতে পাইলাম। মাথায় মিশরীয় মুসলমান ফেজ ছিল। কেহ প্রবেশ করিতে বাধা দিল না। সাধারণ মস্‌জিদের নিয়মেই এই অট্টালিকা নির্ম্মিত। পশ্চিম দিক হইতে প্রবেশ করিয়া সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে হয়। এই প্রাঙ্গণে ৫০,০০০ লোক বসিতে পারে। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে চক্‌মিলান বারান্দা। উত্তর দক্ষিণের বারান্দার ভিতর বড় বড় হল। পূর্ব্বদিকের হল সর্ব্বাপেক্ষা—বৃহৎ—প্রায় ৩০০ প্রস্তরস্তম্ভবিশিষ্ট।

এইখানে বর্ত্তমানে ১০,০০০ ছাত্র এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ করিয়া

থাকে। ওয়াকৃফের সম্পত্তি হইতে ইহাদের এবং শিক্ষকগণের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হয়। ইহা দেখিয়া প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীঘর জীবনব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রণালী, চালচলন সবই অনুমান করিতে পারিলাম। সরল জীবন যাপন, মাদুরের উপর শত শত ছাত্রের উপ-বেশন, পঠন পাঠনে অনুরাগ, বিলাসবর্জ্জন, জ্ঞানসঞ্চয় ও জ্ঞানবিতরণে অধ্যবসায়, এই সকলই ভারতবর্ষের বিদ্যাদানবিষয়ক বিধিব্যবস্থার অনুরূপ। মিশরীয় মুসলমানদিগের অবৈতনিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেখিলে সমগ্র প্রাচ্য জগতের হাবভাব, আদর্শ ও চিন্তা অতি সহজে বুঝিতে পারা যায়। আফিসী কায়দার শাসন নাই—সকলেই স্বাধীন-ভাবে আনন্দের সহিত নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। দশম শতাব্দীতে যখন মুসলমানেরা প্রথম কাইরো নগরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন তখনই তাঁহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিগত ১০০০ বৎসর ধরিয়া নানা রাষ্ট্রীয় দুর্য্যোগ সত্ত্বেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুনিয়ার মুসলমানছাত্র শিক্ষা পাইয়া আসিতেছে। সমগ্র মুসলমান সমাজের ইহাই চিন্তা-কেন্দ্র। এখানকার আদর্শই ভারতবর্ষে, বোর্ণিয়ো সেলিবিস ও যবদ্বীপে, আফগানিস্তানে, তুরস্কে, মরক্কোতে সকলস্থানে অনুসৃত হয়। এখানে শিক্ষিত হইয়া ছাত্রগণ মুসলমান-জগতের সর্ব্বত্র উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, প্রচারক, অধ্যাপক, পুরোহিত ইত্যাদির পদে নিযুক্ত হন। মিশরের অধিকাংশ রাষ্ট্রমন্ত্রীরা এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র। এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের সুনাম সুপ্রচারিত। মহম্মদ আলি ইহাঁদিগকে ভয় ও সম্মান করিয়া চলিতেন।

এখানে ধর্ম্মগ্রন্থপাঠই বিশেষরূপে হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরবী ভাষার সাহায্যে অন্যান্য বিদ্যারও জ্ঞান বিতরণ করা হয়। ছাত্রদের জন্য বাস করিবার স্বতন্ত্র ঘরবাড়ী আছে। হলের প্রাচীরের পার্শ্বে

দেখিলাম কতকগুলি আলমারীর সারি রহিয়াছে। উহার মধ্যে ছাত্রেরা তাহাদের ব্যবহার্য্য পুস্তকাদি রাখিয়া থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভাগে সমীপবর্ত্তী স্থানে অসংখ্য গ্রন্থালয় দেখিয়াছি। মোটের উপর এই স্থানকে মুসলমান সভ্যতার প্রধানতম কেন্দ্র বলিয়া মনে হইল।

অবশ্য নব্য-পাশ্চাত্য-আলোক-প্রাপ্ত মিশরীয়েরা আজকাল এই বিত্থালয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছেন। তাঁহারা মনে করেন এখানে শিক্ষা-লাভ কিছুই হয় না। তাঁহারা এই সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ধরণের বিত্থালয়াদি গড়িতে চাহেন। অথচ স্বাধীনভাবে নবনব শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা ইঁহাদের নাই।

এতগুলি বিভিন্ন জাতীয় যুবক ও প্রৌঢ় মুসলমান একস্থানে দেখিয়া ভাবিলাম—মুসলমানেরা নিতান্তই শান্তিপ্রিয়। ইহাদিগকে উগ্রস্বভাব, তীব্রপ্রকৃতি, ভয়াবহ জাতিরূপে বর্ণনা করা উচিত নয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির চেহারার পার্থক্য অবশ্য লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু সকল মুসলমানের মধ্যে একটা কমনীয় ভাব—একটা কোমলতা, সৌজন্য ও নম্রতা দেখিতে পাইলাম। এমন কি যাহাদের শারীরিক গঠন খুব লম্বা চৌড়া শক্ত ও পালোয়ানোচিত, তাহাদিগকেও শান্ত শিষ্ট বোধ হইল। আর মিশরের ভিতর দোকানে হোটেলে হাটে বাজারে যত লোক দেখিয়াছি তাহাদের কাহাকেও প্রচণ্ডপ্রকৃতির ভাবিতে পারি নাই। ইহাদের সর্ব্ব অঙ্গে, চোখে, মুখশ্রীতে বেশ শান্তিপ্রিয়তা বিরাজ করিতেছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় দেখা হইয়া গেলে আজ আবার দুর্গে প্রবেশ করিলাম। তাহার পশ্চিম কোণ হইতে সমগ্র কাইরো-নগরের দৃশ্য দেখা যায়। সেখানে দাঁড়াইয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত নগরীর অট্টালিকা, প্রাসাদ, মসজিদ, মিনার, গম্বুজ ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। এই নগরের পশ্চিমে নাইল নদের উজ্জ্বল জলরাশি—তাহার পশ্চাতে অপরকূলে

আবার নগর পল্লী ও প্রান্তর। সমস্ত কাইরো সহর এক সঙ্গে দেখিলে মনে হইবে ভারতবর্ষের কোন স্থানে এমন বৃহৎ ও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নগর বোধ হয় নাই। নানাপ্রকার সৌধ—গ্রীক ষ্টাইল, রোমান ষ্টাইল, তুরকী ষ্টাইল, আধুনিক ইউরোপীয় ষ্টাইল—সকল ষ্টাইলই সাধারণ মিশরীয় মুসলমানরীতিতে নির্ম্মিত হর্ম্ম্যমালার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তথাপি একবার দেখিলেই মুসলমান-নগর বলিয়া বুঝিতে ভুল হয় না।

সহরের কোথায়ও খোলার ঘর বা চালার ঘর নাই। সবই ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত। কাইরো-নগরের সৌধসমূহ দেখিলে মিশরীয়দিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে বড় বড় কারবার, কৃষি ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক, সবই বিদেশীয়গণের হাতে। মিশরীয়দিগের স্বদেশী কৃষি শিল্প বা ব্যবসায়ের কোন অনুষ্ঠান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কাইরো-নগর ইউরোপের বাজারে পরিণত হইয়াছে। আজকাল যে সম্পদ্ দেখিতেছি তাহা মিশরীয়দের পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত ধনের সাক্ষী। আধুনিকগণের বেশভূষা, পোষাক পরিচ্ছদ, কায়দাকানুন, চলাফেরা, সবই বিলাসিতার এবং সুখভোগেচ্ছার পরিচায়ক। নগরের বাহ্য শোভা—দোকান বাজার, উদ্যান, হোটেল, 'কাফে' জনগণের যাতায়াত, ভিক্টোরিয়া গাড়ী ও ট্রাম গাড়ীর লোকসংখ্যা সকলই এক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মিশরের ধনধান্য এই দেশবাসীকে সুখী বিলাসী করিয়া তুলিয়াছে। আজ ইহাদের কোন ব্যবসায়ই স্বহস্তগত নয়। জার্ম্মাণ, ফরাসী, গ্রীক, ইতালীয়, ইংরেজ, ওলন্দাজ, আর্ম্মিনিয়ান, ইহুদি—জগতের সকল জাতি মিশরের বুকে বসিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। চারিদিককার শোভা সৌন্দর্য্য এই বিদেশীয় বণিকদিগেরই কৃতিত্বের এবং ঐশ্বর্য্যের ফল। ভবিষ্যতে মিশরবাসীর অবস্থা কিরূপ হইবে ভাবিয়া স্থির করা কঠিন। মিশরীয়দিগের ঘুম কবে ভাঙ্গিবে কে বলিবে?

দুর্গের পশ্চিমকোণ হইতে পূর্ব্বদিকে তাকাইয়া দেখি বালুকাময় প্রস্তরপূর্ণ শৈলমালা দণ্ডায়মান। তাহার পাদদেশেই এই দুর্গ। পাহাড়ের উপর সমতলক্ষেত্র বা টেব্‌লল্যাণ্ড। তাহাতেও একটা দুর্গ। পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ দূরে একটা মস্‌জিদ। ইহা অতি পুরাতন। এই পর্ব্বতে বাইবেলবিখ্যাত মকাওম শৈল। এখানে নোয়ার জাহাজ জলপ্লাবনের সময়ে ঠেকিয়াছিল। মিশরের বহু স্থানের সঙ্গে প্রাচীন খ্রীষ্টানধর্ম্ম, সমাজ ও ইতিহাসের অনেক কথা বিজড়িত। মিশর খ্রীষ্টান-দিগের তীর্থক্ষেত্র।

পশ্চিমকোণে দাঁড়াইয়া আবার পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। যতদূর দেখা যায় দেখিতে লাগিলাম। নাইল নদের উভয়কূলে নগর পল্লী উদ্যান প্রান্তর। মিশরের এই ভূমি ধনধান্যপুষ্পেভরা, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। মধ্যভাগে নদী, দুইধারে জনপদ ও লোকাবাস—পূর্ব্বে আরব দেশীয় মোকাতাস পর্ব্বত ও মরুভূমি, পশ্চিমে আফ্রিকার লীবীয় পর্ব্বতশ্রেণী ও মরুভূমি। এই দুই পর্ব্বতমালা পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রাচীরের ন্যায় মিশরের উর্ব্বরভূমিকে রক্ষা করিতেছে। এই ভূমির উপরই যুগে যুগে মানবসভ্যতার বিকাশ সাধিত হইয়াছে।

পশ্চিম দিকে দেখিলাম—সম্মুখেই কাইরো নগরের অতি সন্নিকটে তিনটি পিরামিড বা ত্রিকোণস্তম্ভ। এই জনপদের নাম গীজা। কিয়দ্দূরে, দক্ষিণে, নাইলের পশ্চিমে আরও কতকগুলি পিরামিড দেখিতে পাইলাম। এই স্থানে উর্ব্বরক্ষেত্রের শস্যসম্পদও দেখা গেল। ঐ জনপদের নাম সক্কারা। এই খানেই প্রাচীন মেম্‌ফিস্‌-নগর। গ্রীক ও মিশরীয় ইতিহাসে এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ। এই স্থানের বৃষবাহন "তা" দেবতা সূর্য্যদেবের ন্যায় প্রাচীন মিশরের প্রধান দেবতা।

কুতুবমিনারের শিরোভাগে দাঁড়াইয়া দিল্লীর নবীন প্রাচীন জনপদ-

গুলি যেরূপ দেখায়, কাইরোদুর্গের এই স্থানে দাঁড়াইয়া সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। সত্য সত্যই এদেশ "স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপ, প্রাচীন মন্দিরাদির চিহ্ন, অজর অমর শিল্পকার্য্য, পুরাতন মসজিদ প্রাসাদ, এই সমুদয়ের দৃশ্য অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে নূতন নূতন ঐশ্বর্য্য ও কারুকার্য্যের পরিচয়স্বরূপ অট্টালিকাসমূহ সতেজে দণ্ডায়মান। কিন্তু এই-সমুদয় যে কোন্ "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী" তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। আধুনিক মিশরীয়দিগের কোন স্বপ্ন বা আশা আছে কি ?

দুর্গের মধ্যে এক স্থানে একটা সুগভীর কূপ আছে। প্রবাদ এখানে জোসেফ নামধারী এক ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার কাহিনী কোরানে, বাইবেলে এবং ফার্শী কবি জামি প্রণীত "ইউসুফ-জুলেখা" নামক কাব্যগ্রন্থে বিবৃত আছে। এই কূপের নিম্নে যাওয়া যায়। কুতুবমিনারে যেমন নিম্নভাগ হইতে শিরোভাগে উঠা যায়, এই কূপেও সেইরূপ উপরিভাগ হইতে নিম্নতম স্থানে জলের নিকট যাওয়া যায়। কূপের পথ মিনারের ন্যায় গোলাকার। আমরা অর্দ্ধ ভাগ পর্য্যন্ত নামিলাম। দেখা গেল—প্রকাণ্ড প্রস্তরপ্রাচীরে নির্ম্মিত চতুষ্কোণ গহ্বর, প্রত্যেক দিক প্রায় ১২ ফুট বিস্তৃত। কূপ প্রায় ৪০০ ফুট গভীর। বহু নীচে জল। গাইড বলিলেন—উহা নাইল নদের জলের সঙ্গে সংযুক্ত।

এই অন্ধকারময় পথের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে জোসেফের কাহিনী শুনা গেল। তাঁহাকে এখানে সাত বৎসর বাস করিতে হইয়াছিল। মিশরের রাজা একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এ দিকে দেশময় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরম্ভ হইল। একব্যক্তি রাজাকে খবর দিল—একজন সাধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। জোসেফকে মুক্তিদান করা হইল। পরে তিনি মিশরের খেদিভপদে নিযুক্ত হন।
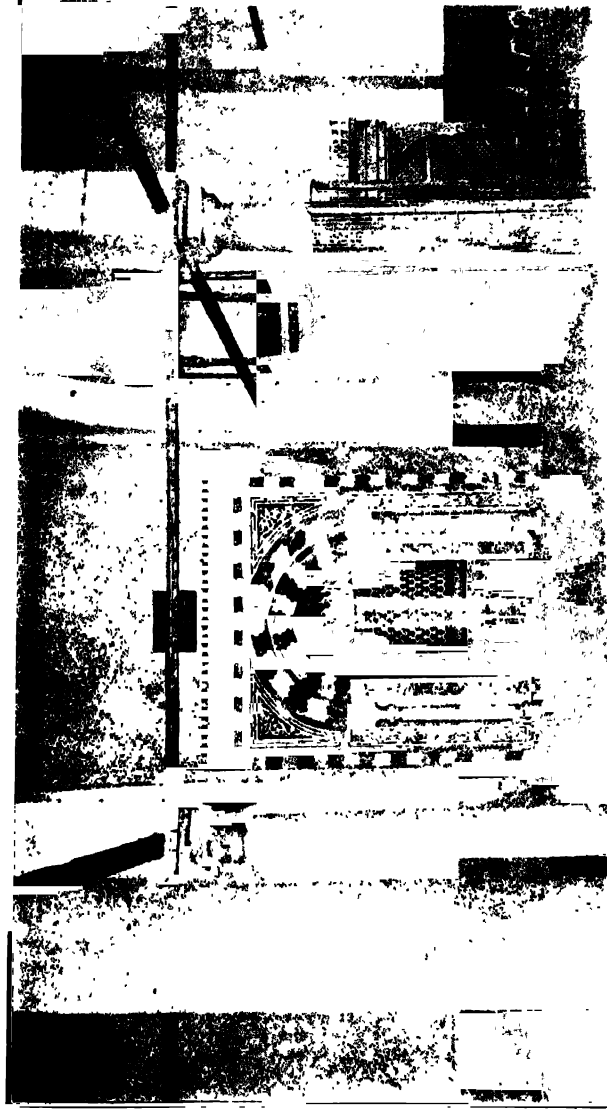
কাইরো   .রর সর্ব্বপুরাতন মস্‌জিদ

এই কূপ সম্বন্ধে আর একটা কথা শুনিলাম। দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার সময়ে সৈন্যগণের জন্য জল সরবরাহই এই কূপ খননের উদ্দেশ্য ছিল। কথাটা সমীচীন বোধ হইতেছে। এই দুর্গ ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে সালাদিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রস্তরসমূহ গীজা পিরামিডের সমীপস্থ ভূমি হইতে আনীত হয়। পুরাতন মেম্‌ফিস্-সাক্কারা-আবুসির গীজা-ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষের উপকরণে মধ্যযুগের মুসলমান কাইরো-নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

তারপর পুরাতন কাইরো-নগরের অবস্থিতি দেখিতে গেলাম। গ্রীক ও রোমীয় যুগে উহা ব্যাবিলন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে মিশরীয় সর্ব্বপুরাতন মুসলমান মসজিদ দেখিলাম। মুসলমানেরা মিশর দখল করিবামাত্র যে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন তাহা এই স্থানে অবস্থিত। নাম "ওমারের মসজিদ।" খলিফা ওমারের আমলে মিশর মুসলমান-দখলে আসে। অবশ্য ১১০০ বৎসরের পুরাতন মসজিদ অনেকবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রাচীনকালের কিবলা মাত্র বর্ত্তমান। ১৪০টা স্তম্ভ মসজিদের হলের ভিতর দেখিলাম। মসজিদ-বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ক্ষুদ্র নয়। অবশ্য সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য এখানে কিছুই পাইলাম না। প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার ভিতর কয়েকটা গাছ পালা। হলের মধ্যে একটা স্তম্ভ দেখিলাম। ইহা নাকি মক্কা হইতে উড়িয়া আসিয়া এই স্থানে পড়িয়াছিল। এই স্তম্ভ কিব্‌লার সমীপস্থ ইমামের আসনের (মেম্বার্) পাদদেশে দণ্ডায়মান। হলের মধ্যে অন্ততঃ ১২০০০ লোক বসিতে পারে। স্তম্ভগুলি মর্ম্মরময়—গ্রীক-ও-রোমান রচনা-রীতির নিয়মে গঠিত।

ওমারের সেনাপতি যে স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন ঠিক সেই স্থানেই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মসজিদ হইতে ব্যাবিলনের প্রাচীন জনপদের দিকে অগ্রসর হইলাম। পুরাতন নগরের ক্ষুদ্রইষ্টকনির্ম্মিত উচ্চ দেওয়ালের কিয়দংশ স্থানে স্থানে দেখা গেল। প্রাচীন রোমীয় অট্টালিকাসমূহের সামান্য সামান্য চিহ্ন নানা জায়গায় বিদ্যমান।

এই জনপদে এক্ষণে একটি পুরাতন খৃষ্টান গির্জ্জা প্রধান দ্রষ্টব্য। কপ্ট জাতির এখানে বসবাস। ইহারা খৃষ্টান—মিশরীয় কায়দাতেই অবশ্য বেশভূষা করে এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের রং ফরসা। ইহুদিদিগের সঙ্গে থাকিলে ইহাদিগকে চেনা যায় না। আজ-কাল দেখা যায় যতদিন ইহারা দরিদ্র ততদিন ইহারা মিশরের সাধারণ মুসলমানদিগের কায়দাকানুন মানিয়া চলে। কিন্তু হাতে পয়সা হইলেই ইহারা ইউরোপীয়দিগের চালচলন শিখে। ইহারা পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত হইতেছে। আফিসে, ব্যাঙ্কে ইহারা বেশ সুদক্ষ কেরানী ও কর্ম্মচারী হইয়া থাকে।

এই কপ্ট জাতি যখন প্রথম খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে তখন রোমীয়-দিগের এখানে প্রতিপত্তি ছিল। তাহারা এই নূতন খৃষ্টানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একটা মহাল্লা প্রস্তুত করিয়াছিল। এই মহাল্লার ফটক দিয়া আমরা প্রবেশ করিলাম। সেই ফটকের পুরাতন কাঠের দরজা আমাদিগকে দেখান হইল—অতি স্থূল ও বৃহদাকার সিকামোর বৃক্ষের কাঠে এই ফটক নির্ম্মিত।

রোমীয়-ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের ভিতরে ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গলি। এই-সকল গলির ভিতর দিয়া পুরাতন গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। এই গির্জ্জার এক অংশে জোসেফ, মেরী এবং যীশু একমাস বাস করিয়া-ছিলেন। হেলিয়োপোলিসের নিকটবর্ত্তী কূপে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া তাঁহারা এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

চতুর্থ দিবস—জগতের সর্ব্বপুরাতন রাষ্ট্রকেন্দ্র

কাইরো হইতে লুক্‌সর যাত্রা করিলাম। কাইরোর নিকটেই রেলওয়ে-পুলে নাইল পার হইতে হয়। গাড়ী হইতে দেখিলাম, নদী গ্রীষ্মকালের যমুনা অপেক্ষা প্রশস্ত নয়। জল বেশ ফরসা। নীলনাইল-অংশ কত নীল বা কাল তাহা এখান হইতে ধারণা করা গেল না।

গাড়ী এক্ষণে কাইরোর অপর পার অর্থাৎ নাইলের পশ্চিম কিনারা দিয়া যাইতে লাগিল। আমাদের পূর্ব্বে আরবের মকাওম শৈলশ্রেণী, পশ্চিমে আফ্রিকার লীবিয়া পাহাড়—মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুই দিকে শস্যশ্যামল উর্ব্বর ভূমি এবং নাইলনদ—সকলই উত্তরদক্ষিণে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। আমাদের রেলপথও এই সকলের সঙ্গে সমান্তরালরূপে নির্ম্মিত। গাড়ীতে বসিয়া সমস্ত মিশরের প্রাকৃতিক শোভা এবং পূর্ব্বপশ্চিমের বিস্তৃতি এক-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত ভারতবর্ষের পশ্চিমঘাটের মত উচ্চ ও সমতলভূমি-ক দেখাইতেছে। উদ্ভিদশূন্য, ঈষৎ রক্তবর্ণ, বালুকা প্রস্তরময় মকাওম শৈল দেখিতে দেখিতে বিন্ধ্য ও সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের টেব্‌ল্‌ল্যাণ্ডের কথা মনে পড়িল। পশ্চিমদিকে কোন নগর বা পল্লী চোখে পড়িতেছে না। কেবল কৃষিক্ষেত্র। 'ফেলা'-নামক মিশরীয় কৃষক, কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ 'গালাবিয়া' পরিয়া জমি চষিতেছে। অদূরে গীজা পল্লীর তিনটী

পিরামিড্। দূরবীণ দিয়া দেখিলাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরামিডের মধ্যে স্ফিঙ্কস্ বিরাজিত। মধ্যে মধ্যে তাল ও খেজুর বৃক্ষের সারি। এই গীজার দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম—লীবিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে প্রথম তিনটি পিরামিডের প্রায় একই সরলরেখার মাপে অন্যান্য পিরামিড্ অবস্থিত। প্রথমে আবুসিরের তিনটি পিরামিড্, পরে সাক্কারা পল্লীর পিরামিড্শ্রেণী।

কাইরো হইতে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে আমরা প্রাচীন মেম্ফিস নগরের ক্ষেত্র অতিক্রম করিলাম। এই স্থানেই আবুসির ও সাক্কারা। ভগ্ন গ্রানাইট প্রস্তরের বিক্ষিপ্ত টুকরা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাদা-মাটির পাত্র ইত্যাদি এক্ষণে প্রাচীন জনপদের সাক্ষ্য দিতেছে।

এই জনপদ মিশরীয় সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপুরাতন কেন্দ্র। উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের সঙ্গমস্থলে মেন্ফিস্-নগর অবস্থিত ছিল। মিশরের প্রথম ১১ রাজবংশের রাষ্ট্রকেন্দ্র এই অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রাজা মিনিস্ উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে এক রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া এই সঙ্গমস্থলে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। মেমফিস্ নগর দক্ষিণদিক হইতে ক্রমশঃ উত্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। সাক্কারা, আবুসির, গীজা, কাইরো, হেলিয়োপোলিস ইত্যাদি জনপদসমূহ একই নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। এইরূপে মিশরের প্রাচীনতম রাজধানী প্রায় ৪০ মাইল উত্তরে দক্ষিণে বিস্তারলাভ করিতেছিল। মধ্যযুগের মুসলমানী কাইরো-নগর ব্যাবিলনপল্লীর সীমা হইতে উত্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহম্মদ আলির আমলে আধুনিক পাশ্চাত্য ফ্যাশনের নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার ফলে আধুনিক নগর মুসলমানী সহরের উত্তরাংশ হইতে নব-গঠিত হেলিয়োপোলিস-নগর পর্য্যন্ত অবস্থিত। এই হেলিয়ো-

লুক্সারের মন্দির
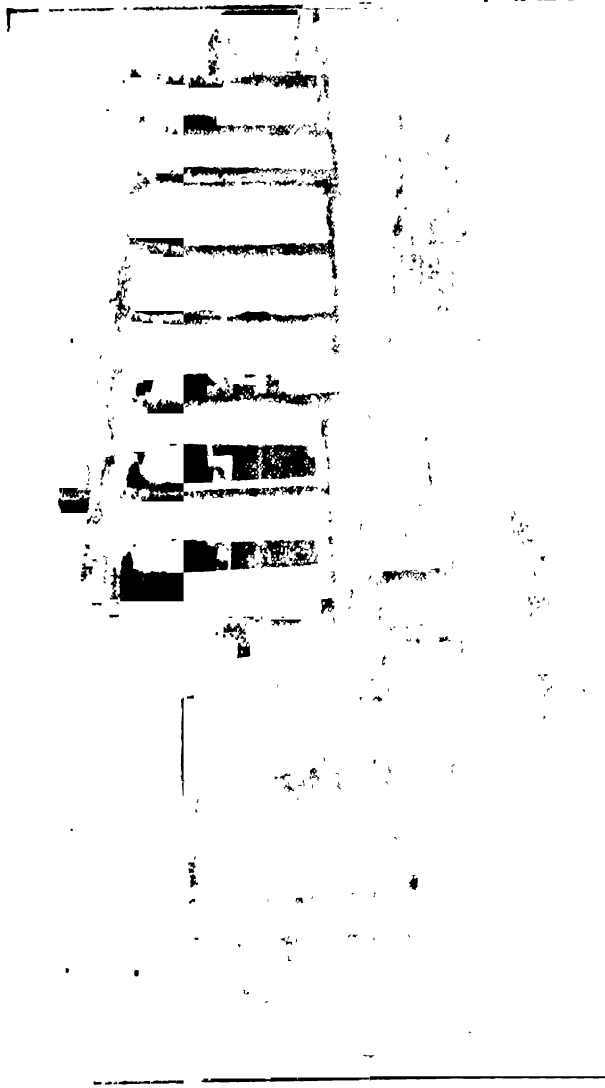
পোলিস নগর প্রাচীন হেলিয়োপোলিসের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে। বর্ত্তমান খেদিভের কুচ্চা বা প্রাসাদ ও উদ্যান এই নবনির্ম্মিত নগরেরই এক অংশে বিরাজিত।

গাড়ী হইতে উত্তরদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কাইরোনগরের পরিমাণ ও বিস্তৃতি এবং প্রাচীন ও আধুনিক স্থানপরিবর্ত্তন বুঝিতে লাগিলাম আমাদের হস্তিনাপুর ইন্দ্রপ্রস্থ, হিন্দু দিল্লী মুসলমানী দিল্লী, এবং ইংরাজের প্রস্তাবিত নূতন দিল্লী—এই সমুদয়ের অবস্থান এবং পরিবর্ত্তন কল্পনা করিতে লাগিলাম। কুতুবমিনারের শিরোদেশ হইতে ৪০।৫০ মাইল বিস্তৃত ভূমি যেরূপ প্রাচীন ও আধুনিক দিল্লীনগরের যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস-কথা বুঝাইয়া দেয়, গাড়ীতে বসিয়াও সেইরূপ মেম্ফিস—কাইরো—হেলিয়োপোলিসনগরের যুগযুগান্তরব্যাপী ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন-সমূহ কল্পনা করিয়া লইলাম।

প্রাচীন হিন্দুবৌদ্ধ গৌড়নগরের চতুঃসীমার পরিবর্ত্তনসমূহও স্মরণে আসিল। বোধ হয় এই জনপদ দিল্লী অপেক্ষাও প্রাচীন। মেম্‌ফিসের প্রতিষ্ঠাতা মিনিসের যুগ আজকাল পণ্ডিতেরা ৩৪০০খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ফেলিতে-ছেন। এমন পুরাতন স্মৃতিময় স্থান ভারতবর্ষে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই প্রাচীন নগরের জনপদে কত প্রাসাদ, কত মন্দির, কত কবর, কত পিরামিড নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? এখানে প্রাচীন স্মৃতি-বাহক যে-সমুদয় প্রস্তর, 'মাম্মি' এবং গৃহ ও পিরা-মিড আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রায়ই ৪০০০—২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তী মিশরীয়যুগের শিল্প এবং কলার সাক্ষ্যও এই স্থানে পাওয়া যায়। ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের পর মিশরের রাজধানী, মেম্ফিসনগর হইতে থীব্‌স্‌নগরে স্থানান্তরিত হয়। আমরা সেই থীব্‌স্-

নগর দেখিবার জন্যই কাইরো হইতে ৪০০ মাইল দক্ষিণে যাত্রা করিয়াছি। সেই জনপদের আধুনিক নাম লুক্সর। কিন্তু থীব্‌সের অভ্যুদয়যুগেও মেম্‌ফিসের প্রভাব নিতান্ত মলিন হয় নাই। থীব্‌সের নরপতিগণ মেম্‌ফিসেও স্বীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া যাইতে চেষ্টিত হইতেন। পারস্য-সম্রাট ক্যাম্বাইসিস্ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মেম্‌ফিস্‌নগর দখল করিয়াই মিশরে রাজ্য বিস্তার করেন। পরে গ্রীক ও রোমানদিগের আমলেও মেম্‌ফিসের গৌরব লুপ্ত হয় নাই। এমন কি মুসলমানেরা যখন সপ্তম শতাব্দীতে মিশর জয় করেন তখন মেম্‌ফিসের প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি সবই বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা এই নগর পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তরে ব্যাবিলনের নিকটে নূতন নগর আরম্ভ করেন। এই নগর নির্ম্মাণের জন্য তাঁহারা প্রাচীন মেম্‌ফিস্ হইতে স্তম্ভ, প্রস্তর, ইত্যাদি লইয়া আসিতেন। এই উপায়েই খলিফা ওমারের মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আব্দুল লতিফের সময়েও মেম্‌ফিসের ধ্বংসাবশেষ কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান ছিল। তাহার পর হইতে সবই লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে কেবলমাত্র সাক্কারা ও আবুসিরের পিরামিড্ এবং অন্যান্য কবরের স্থান বর্ত্তমান।

অন্যান্য কবরের মধ্যে মেম্‌ফিস নগরের অধিষ্ঠাতৃদেব "তা" (Ptah) এবং তাঁহার বাহন বৃষের কবরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। মেম্‌ফিসের গৌরবযুগে তা-দেব সমগ্র মিশরে পূজা পাইতেন। পরে থীব্‌সের অভ্যুদয়-কালে সেই জনপদের দেবতা য়্যামনের প্রতিপত্তি তা-দেবের ক্ষমতা লুপ্ত করিয়াছিল। কিন্তু দুই নগরের দেবতত্ত্ব এবং ধর্ম্মতত্ত্বই হেলিয়োপোলিসের সূর্য্যদেব, সূর্য্যমন্দির, এবং তাহার পূজারী অধ্যাপকগণের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। কি তা-দেব, কি থীব্‌সের য়্যামন-দেব উভয়ই সূর্য্যদেবের ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত হইতেন। হেলিয়োপোলিস প্রাচীন মিশরের ধর্ম্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই সূর্য্যনগরের পুরোহিত ও

স্তর-বিন্যস্ত মন্দির

অধ্যাপকগণ চিরকালই মিশরবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইয়া আসিয়াছেন। মেম্‌ফিস এবং থীব্‌সের প্রবল-প্রতাপ নরপতিগণও ইহাঁদের প্রভাব পুরা-পুরি অতিক্রম করিয়া স্বীয় জনপদের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে সূর্য্যপূজা-তত্ত্বের অনেক কথা তা-তত্ত্বের এবং য্যামন-তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইয়াছিল। সূর্য্যপূজক অধ্যাপকগণও এই-সকল রাজবংশের উপর অসামান্য ক্ষমতা বিস্তার করিতেন।

পৃথিবীর এই সর্ব্বপুরাতন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মিশরে আমাদের দুই সপ্তাহমাত্র আয়ু। কাজেই মেম্‌ফিসের কাহিনী গাইডের মুখে ও পুস্তকের সাহায্যে জানিয়া লইলাম। এখানকার মন্দির ও কবরগাত্রে নানাপ্রকার চিত্র আছে। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ-বিহার-চৈত্য-স্তূপসমূহে যেরূপ দৃশ্য ও অভিনয় দেখা যায়, এখানকার মস্তাবা ও রাজকবরাদিতে সেইরূপ প্রাচীর-চিত্র রহিয়াছে। এইগুলি দেখিয়া প্রাচীন মিশরের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাষ্ট্র-শাসন ইত্যাদি সকল বিষয়ই অবগত হওয়া যায়। ভারহুত ও সাঁচি স্তূপগাত্রে খোদিত চিত্রের সাহায্যে বৌদ্ধ-ভারতের সকল বৃত্তান্তই আমরা জানিতে পারি।

সাক্কারায় প্রাচীন রাজকর্ম্মচারী বা জমিদারগণের কয়েকটা কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলিকে "মস্তাবা" বলে। এই মস্তাবার গাত্রে যে সমুদয় কাহিনী চিত্রিত রহিয়াছে তাহার কয়েকটা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। কোন স্থানে একটি জাহাজ সমুদ্র বাহিয়া যাইতেছে। কোথায়ও বা মিশর-রমণীরা শস্য ঝাড়িতেছে। কোন চিত্রে প্রাচীনকালের রোপণ ও শস্যকর্ত্তনপ্রণালী দেখিতে পাই। এক এক অংশে দেখা যায় বহু সূত্রধর সমবেত হইয়া কাঠ চিরিতেছে, এবং জাহাজ তৈয়ারী করিতেছে। চিত্রগুলি জীবন্ত বোধ হয়, যেন আমাদের সম্মুখে বসিয়া

কারিগরেরা হাতিয়ার চালাইতেছে। কোন স্থলে রাষ্ট্রশাসনের এক চিত্র দেখিতে পাই, সাক্ষ্য দিবার জন্য পল্লীর প্রবীণ ব্যক্তিরা বিচারালয়ে আসিয়াছে। কোথায়ওবা আফিসের কর্ম্মচারী ও কেরাণীরা বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে। কোন চিত্রে গোশালা, গোদোহন, লাঙ্গল-চালান, গোচারণ, মাছধরা, ইত্যাদি দেখা যায়। কোথাও অনেক গাভীর দলকে নদী পার করান হইতেছে। কৃষকপত্নীরা মাথায় করিয়া নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার লইয়া যাইতেছে—এরূপ চিত্রও বিরল নয়। মাথার চুপড়ীগুলি দেখিয়া বুঝা যায় মাছমাংস, শাকশব্জী, ফলমূল, পাখী, পানীয় ইত্যাদি বহুপ্রকার খাদ্যদ্রব্য দেবতার জন্য আনীত হইতেছে। রাস্তায় বাহক-দিগের সারি দেখিয়া আধুনিক কলিকাতায় "বিবাহের তত্ত্ব" পাঠাইবার দৃশ্য মনে আসে। এই-সকল চিত্র দেখিলে মনে হয়—৫০০০।৬০০০ বৎসর পূর্ব্বেও মানবজাতি তাহার আধুনিক বংশধরগণের ন্যায়ই ছিল, তাহাদের জীবন-যাত্রায় আর আজকালকার জীবন-যাত্রায় বড় বেশী প্রভেদ নাই। খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা, লেনদেন, সকল বিষয়েই প্রাচীন মিশরবাসীরা আধুনিক লোকসমাজের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত। ভারতবর্ষের আধুনিক ও প্রাচীন গোচারণ, কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, রাষ্ট্রকার্য্যপরিচালন, ইত্যাদি অনেক অনুষ্ঠানেই প্রাচীন মিশরের জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখিতে পাই। মিশরে ও হিন্দুস্থানে একই আদর্শের চরিত্রগঠন, একই ছাঁচের সমাজগঠন, একই ধরণের জীবন-গঠন হইয়াছিল কি? হিন্দু ও মিশরীয়েরা কি একই নিয়মে বিশ্বে বসতি করিয়াছিল? এই-সকল প্রশ্নের আলোচনা এখনও হয় নাই।

মেম্ফিসের ধ্বংসাবশেষগুলি ছাড়াইয়া নাইলকে বামে রাখিয়া সোজা দক্ষিণে চলিলাম। সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে যত দূর দেখা যায় সেই এক দৃশ্যই দেখিতেছি। সেই লীবিয়া ও মকাওমের শৈলশ্রেণী,

সেই তাল ও খেজুর বৃক্ষের সারি, সেই তুলা গোধুম শস্যের কৃষিভূমি, সেই নাইলনদ ও সেই নাইলনদের খালসমূহ। মধ্যে মধ্যে নগর ও পল্লী। তাহাও সেই এক ছাঁচে গড়া। চতুষ্কোণ, বারান্দাহীন, হাওয়াহীন, মসজিদতুল্য অট্টালিকা চালার ঘর বা টালির ঘর একখানাও দেখি না— নগরের গৃহসমূহ সবই প্রস্তর নির্ম্মিত বোধ হয়—পল্লীর গৃহগুলি রৌদ্রে-শুকান নাইল-মৃত্তিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে গঠিত। মিশরের উত্তর হইতে দক্ষিণসীমাপর্য্যন্ত এই এক দৃশ্য, এক প্রকৃতি, এক বাড়ীঘর, এক চাষ আবাদ। কোথাও কোন বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা নাই। একটি পল্লী দেখিলেই সকল পল্লী দেখা হইল, একটি নগর দেখিলেই সকল নগর দেখা হয়। কোন একস্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা বুঝিলেই সমস্ত মিশর-দেশের জলবায়ু, মাঠঘাট, বুঝা হইয়া যায়। মিশরের বাহ্য প্রকৃতি নিতান্তই একটানা একঘেয়ে।

কেবল কি বাহ্যপ্রকৃতিই বৈচিত্র্যহীন? তাহা নহে। মিশরের যেদিকে তাকাই সেই-দিকেই একঘেঁয়ে একটানা বৈচিত্র্যহীনতার পরিচয়। আধুনিক মিশরীয় জীবনের কথাই ধরা যাউক। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইব—গ্রীক্, ইতালীয়, ফরাসী, জার্ম্মাণ, আমেরিকান, ইংরাজ, আর্ম্মিনিয়ান, ইহুদী ইত্যাদি অসংখ্য বিদেশীয় জাতি নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধি করিবার জন্য যত্নবান্। মিশরের মুসলমান সর্ব্বত্রই হতপ্রভ ও হীনবীর্য্য। মুসলমান-সমাজের উপরে পাশ্চাত্য ও বিদেশীয় সমাজের একটা স্তর বেশ শক্ত ও দৃঢ়ভাবে বসিয়া গিয়াছে।

এই পাশ্চাত্য স্তরবিন্যাস কৃষিতে দেখিতে পাই, শিল্পে দেখিতে পাই, বাণিজ্যে দেখিতে পাই, শিক্ষায় দেখিতে পাই। কোথায়ও যেন মিশরবাসীর স্বদেশী জীবন নাই! বাড়ীঘর, আদবকায়দা, লেখাপড়া, ব্যাঙ্ক, কৃষি, চিনির কল, ময়দার কল, স্কুলকলেজ, সংবাদপত্র, রাষ্ট্র-পরি-

চালনা—কোন দিকেই মিশরীয়কে প্রথম স্থানে দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য ও বিদেশীয় সমাজ মিশরের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। মিশরের উত্তরে দক্ষিণে এই পাশ্চাত্য প্রভাবের একটানা দৃশ্য দেখিতে পাই। সকল নগরে ও পল্লীতে একঘেয়ে একটানা বিদেশীয় প্রভাব।

গৃহরচনার প্রণালীতে এই বিদেশীয় স্তরবিন্যাস বেশ বুঝা যায়। পোর্টসৈয়দ হইতে যতদূর দক্ষিণেই যাই না কেন কাইরো-নগরের সৌধ-নির্ম্মাণ-রীতি দেখিতেছি। মুসলমানী মস্‌জিদতুল্য চতুষ্কোণ হর্ম্ম্যাবলীর উপর গ্রীকোরোমান, গথিক, বাইজেণ্টাইন, তুরকী, ওলন্দাজ ফরাসী ইত্যাদি নানাবিধ বিদেশীয় কায়দার অলঙ্কার ও স্তম্ভ, বারান্দা, বাল্কনি ইত্যাদি একঘেয়ে মুসলমানী কায়দার নিম্নস্তর—তাহার উপর এই ইউরোপীয় কায়দার প্রভাব। যে পল্লী বা যে নগরেই যাই—এই উভয়বিধ স্তরবিন্যাস যুগপৎ দেখিতেছি। এই জন্যই বলিতেছিলাম, একটি নগর দেখিলেই সকল নগর দেখা হয়।

তাহার পর প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ, হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও অট্টালিকাবলী। এগুলিও মিশরের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। কোন স্থানই পুরাকহিনীশূন্য নয়—কোন জনপদই প্রাচীনস্মৃতিহীন নয়। সর্ব্বত্রই 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' স্থান—পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি।

প্রথমতঃ মধ্যযুগের পুরাকীর্ত্তি। এগুলি মুসলমান অধিকারের যুগ, খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মহম্মদ আলির আমল পর্য্যন্ত ১০০০।১১০০ বৎসর কাল এই যুগ চলিয়াছে। এই সময়ের মসজিদ, গম্বুজ, মিনার, মসলিয়াম, কবর ইত্যাদিতে সমস্ত মিশর-দেশ পরিপূর্ণ। এই-সমুদয়ের মধ্যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক ও রোমীয় যুগের কীর্ত্তিও মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ মুসলমানী শিল্পে গ্রীকো-রোমান কায়দার প্রভাব লক্ষ্য করিতে বেশী সময় লাগে না। এইরূপ

মুসলমানী সৌধমালার দ্বারা সমগ্র মিশর-রাজ্যে একটানা একঘেয়ে দৃশ্যও কম সৃষ্ট হয় নাই।

তারপর প্রাচীনতম যুগের কথা—৫০০০ বৎসর পূর্ব্বেকার কাহিনী। তাহাতে মিশরের সর্ব্বনিম্ন স্তর রচনা করিয়াছে। তাহার স্মৃতি মধ্য-যুগের এবং আধুনিক মিশরের সকল কাজকর্ম্মের সঙ্গে ন্যূনাধিক বিজড়িত। তাহা আর এক্ষণে সজীব নাই—তাহার আদর্শে আর আধুনিক মিশরবাসীর জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় না। সে ধর্ম্ম, সে চিত্রকলা, সে ভাস্কর্য্য, সে কবর, সে 'ফ্যারাও' সম্রাট আর নাই। কিন্তু পর্ব্বতশ্রেণী-দ্বয়ের পাদদেশে নাইলনদের কিঞ্চিৎ দূরে সেই যুগের স্মৃতিচিহ্ন উত্তর-দক্ষিণে অসংখ্য রহিয়াছে। পিরামিড্, ওবেলিস্ক, মস্তাবা, মন্দির, প্রাচীর ইত্যাদিতে মিশরদেশ পরিপূর্ণ। এইজন্য থীব্স্ দেখিলেই মেম্ফিস দেখা হইল, মেম্ফিস দেখিলেই থীব্স্ দেখা হইল।

দক্ষিণ মিশরকে উচ্চতর মিশর বলে। উত্তর মিশরকে নিম্নতর মিশর বা বদ্বীপ বলে। মিশর রাজ্যের এই দুই বিভাগ ৬০০০ বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী মিশরদেশকে এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। আধুনিক কাইরো ও হেলিয়োপলিস-নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান এই দুই বিভাগের সঙ্গমস্থল প্রাচীন মেম্ফিস—ব্যাবিলন—সূর্য্যনগরও এই সঙ্গমস্থলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আমরা সাক্কারা ছাড়াইয়া উচ্চতর মিশরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিবার নূতন কিছুই আর নাই। এই অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ প্রধান—উত্তর অঞ্চলে বা বদ্বীপে তূলার চাষ প্রধান, এই যা প্রভেদ। এই অঞ্চলে কতকগুলি চিনির কল আছে। পূর্ব্বে এই-সমুদয় খেদিভের সম্পত্তি ছিল; এক্ষণে সবই বিদেশীয় বণিকগণের সম্পত্তি। স্থানে স্থানে বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের সাহায্যে চাষ হইতেছে

—মাঝে মাঝে দুই একটা বাজার দেখিতে পাইলাম। এইগুলি দেখিতে ভারতবর্ষের হাট-বাজারের ন্যায়। বাজারের দুইএকটিমাত্র আবৃত স্থান। প্রায়ই অনাবৃত—‘ফেলা’-রমণীরা কেনাবেচা করিতেছে। পুরুষের সংখ্যা কম।

এই অঞ্চলে মিনিয়া একটি প্রধান নগর। এখানে বড় বড় জমিদার-গণের সম্পত্তি আছে। কাহারও কাহারও আয় প্রায় দেড় কোটি টাকা। এই জমিদারেরা পূর্ব্বে স্বদেশীভাবে জীবনযাপন করিতেন। এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রভাবে চরিত্রহীন, নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতে-ছেন।

লুক্সারের পথে আর-একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পাইলাম। প্রাচীন য়্যাবাইডস্ নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনে রহিয়াছে। আধুনিক জনপদের নাম বালিয়ানা। এইখানে অসিরিস দেবের মন্দির সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। খননকার্য্য এখনও চলিতেছে। পণ্ডিতেরা আশা করেন অসিরিস দেবের কবর ও মাম্মি তাঁহারা খুঁজিয়া পাইবেন।

কাইরোর নিকটেই একবার নাইল পার হইয়াছি। নাগা হাম্মাদি ষ্টেশনে আর একবার নাইল পার হইলাম। অনতিবিলম্বে প্রাচীন থীব্‌স্-রাজধানীর অবস্থানক্ষেত্র লুক্সরে আসিয়া পৌছিলাম। লুক্সর নাইলের পূর্ব্বতীরে কাইরো-নগরের কূলে। আমরা সকাল ৮৷৷০ টায় কাইরো ছাড়িয়াছিলাম। রাত্রি ১১টায় লুক্সরে উপস্থিত হইলাম। কাইরোর একজন গুজরাটী হিন্দু দোকানদার আমাদিগকে স্বদেশী খাদ্য দিয়াছিলেন। রেলে চাপাটি রুটি, তরকারী, আলুভাজা ইত্যাদি খাইতে খাইতে আসিয়াছি! নাইল-নদের উপরেই পূর্ব্বকূলে আমাদের হোটেল। এখান হইতে পশ্চিমকূলের সমতলভূমি ও পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায়।

কার্ণাক—আমন মন্দিরের প্রবেশপথে স্ফিঙ্কস্

পঞ্চম দিবস—য়্যামন-দেবের নগর, কার্ণাক

আমাদের হোটেল লুক্সরের মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে। আমরা প্রথমেই কার্ণাক দেখিতে গেলাম। হোটেল হইতে নদীর ধারে সোজা উত্তর দিকে যাইতে হইল। পূর্ব্বে লুক্সরের মন্দির হইতে কার্ণাকের মন্দির পর্য্যন্ত দুইসারি স্ফিঙ্কস্ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে কেবলমাত্র তাহাদের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

আমরা 'খন্‌স্' বা চন্দ্রদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই "পাইলন" বা ফটক। ফটক টলেমির নির্ম্মিত। হেলিয়োপোলিসের ওবেলিস্কের ন্যায় ইহা উচ্চ—দেখিতেও ইহা সেইরূপ। নিম্নে প্রশস্ত, শিরোভাগ সঙ্কীর্ণতর। ফটকের দুইপার্শ্ব হায়েরোগ্লিফিক লিপিদ্বারা উৎকীর্ণ। গাত্রে টলেমির চিত্র। নানা থীবস্ দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। দক্ষিণ ও উত্তর উভয়দিকেই একপ্রকার শিল্প ও চিত্র। উত্তরে ও দক্ষিণে ফটকের উপরিভাগে পক্ষযুক্ত সূর্য্যমূর্ত্তি। এই ফটকে টলেমি তাঁহার স্বদেশীয় গ্রীকো-রোমান পোষাকে ভূষিত।

এই ফটক হইতে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্ফিঙ্কসের গলির ভিতর দিয়া প্রাচীনতর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এই মন্দির উত্তরে দক্ষিণে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে প্রবেশদ্বার। এই দ্বারের গাত্রে সম্রাট্ রাম্‌সেস নানাভাবে চিত্রিত। 'রা' এবং অন্যান্য মিশরীয় দেবগণের উদ্দেশ্যে তিনি লতা-পাতা, পদ্ম, এবং অন্যান্য উপহারদ্রব্য প্রদান করিতেছেন।

এই প্রবেশদ্বারের পর উত্তরদিকে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের উভয়দিকে স্তম্ভশ্রেণী। এক একদিকে ১৩টা স্তম্ভ। স্তম্ভগুলি 'প্যাপিরাস' নামক নলতরুর চিত্রসংযুক্ত। স্তম্ভগাত্রে এবং প্রাচীরে ও ছাদে নানাপ্রকার লিপি ও চিত্র। রামসেস দেবতাগণকে পূজা করিতেছেন—এইরূপ বুঝা যায়। প্রাঙ্গণের পার্শ্বে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরজা—এইগুলি দিয়া পুরোহিতেরা সমীপবর্ত্তী সরোবরে স্নান করিতে যাইতেন।

প্রাঙ্গণ হইতে একটি ক্ষুদ্রতর গৃহে প্রবেশ করা গেল। ইহাতেও সর্ব্বসমেত ১২টা স্তম্ভ। তাহার পর আর একটা গৃহ—তাহাতে দুই পার্শ্বে দুইটা করিয়া স্তম্ভ এবং তাহার পার্শ্বে কিছু কম উচ্চ স্তম্ভদ্বয়। সর্ব্বসমেত ৮টা স্তম্ভ। স্তম্ভগুলি দেখিতে একপ্রকার। স্তম্ভের শিরোভাগে চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ড।

এই গৃহের পর মন্দিরের প্রধান অংশ। তাহার উত্তর পার্শ্বে কয়েকটা অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহ।

মন্দির সর্ব্বাংশে প্রস্তর-নির্ম্মিত—সাধারণ লাইমষ্টোন প্রস্তর আরব্য মকাওম পর্ব্বত হইতে আনীত হইত। মন্দিরের ছাদে কোন শিখর বা গম্বুজাদি কিছুই নাই। সাধারণ গৃহছাদের ন্যায় সমতল। কোন খিলান কোথাও নাই। আগাগোড়া সুচিত্রিত। মিশরীয় ধর্ম্মতত্ত্বের নানা কথা এই চিত্রে বুঝান হইয়াছে। যে রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার নাম এবং মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূজা, আরাধনা, যজ্ঞ, দান ইত্যাদি ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানও প্রাচীরগাত্রে এবং ভিতরকার ছাদে উল্লিখিত। নৌকার ভিতর দেবতা বসিয়া আছেন। এবং রাজা তাঁহাকে ভক্তিভরে পূজা করিতেছেন—এই দৃশ্য অতি সাধারণ। পক্ষযুক্ত সূর্য্যমূর্ত্তিও ফটকমাত্রের উপরিভাগে দেখিতে পাইলাম।

কার্ণাকের স্তুপ

মন্দির-নির্ম্মাণকৌশলে কিছু কিছু হিন্দু দেবালয় নির্ম্মাণের রীতি মনে পড়ে। ফটক, প্রাঙ্গণ, স্তম্ভ, ভোগমন্দির, পার্শ্বগৃহ, প্রধানমন্দির—ইত্যাদি ভারতীয় মন্দিরের নানা অঙ্গ। জগন্নাথের মন্দির, কালীঘাটের মন্দির, কামাখ্যার মন্দির, বিশ্বেশ্বরের মন্দির ইত্যাদির সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে প্রাচীন থীব্‌সের দেবমন্দিরসমূহের তুলনা করা চলে।

মন্দিরের শেষভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে একটা দরজা ছিল। ইহার ভিতর দিয়া নিকটবর্ত্তী য়্যামনদেবের মন্দিরে যাওয়া যাইত। এই দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে তাকাইয়া দেখিলাম। 'খন্‌স' মন্দিরের ভিতরকার অংশ সমস্ত একেবারে দেখা গেল। বিরাট স্তম্ভসমূহই ইহার বিশেষত্ব, এবং সর্ব্বমেত পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন গৃহ বা প্রাঙ্গণের সমবায়ে মন্দির রচিত। ভিতরকার গৃহে অর্থাৎ প্রধান মন্দিরে কোন স্তম্ভ নাই—ইহা চতুষ্কোণ। ইহার চারিদিক সমান। দুই পার্শ্বে বারান্দার ন্যায় পার্শ্বগৃহ আছে। ভিতরকার পথ অন্যান্য গৃহের ভিতরকার সমান বিস্তৃত। এই গৃহের কোন্ স্থানে দেবতার পীঠ ছিল বুঝা যায় না।

কোন কোন প্রাচীরে ও স্তম্ভে দেখিলাম গ্রানাইট প্রস্তরের কার্য্য। প্রাচীন মিশরবাসীরা আসোয়ান পর্ব্বত হইতে এই পাথর আনাইত।

প্রধান মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণ-গৃহে যে চারিটা স্তম্ভ দুইপার্শ্বে দেখা যায় তাহার গঠনকৌশল কিছু নূতন। স্তম্ভের পাদদেশ পদ্মফুলের পাপ্‌ড়িযুক্ত এবং শিরোদেশ পুষ্পের সর্ব্বোপরিস্থ আবরণের আকৃতি-বিশিষ্ট।

চন্দ্রমন্দির দেখিয়া জগদ্বিখ্যাত য়্যামন-মন্দিরে গেলাম। এই মন্দির নাইলের পূর্ব্বকিনারায় অবস্থিত, নদী হইতে উঠিয়াছে বলা যায়। পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ইহার বিস্তৃতি। নাইল হইতে উঠিবার পথে প্রথমেই

দুই সারি স্ফিঙ্কস্ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সারিতে ২০টা করিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত মেষ উচ্চ প্রস্তরমঞ্চের উপর উপবিষ্ট। এগুলি এখনও নষ্ট হয় নাই, পূর্ব্বেকার মতই সজীব সতেজ আছে।

এই স্ফিঙ্কস্ শ্রেণীদ্বয়ের শেষসীমার নিকটে খানিকটা বাঁধান প্রাঙ্গণ। তাহার পাদদেশে ভূমিগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গ দিয়া নাইলের জল মন্দিরের চরণতল ধৌত করিত। এই স্থান হইতে পশ্চিম নাইলের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া সমস্ত মন্দিরের বিস্তৃতি ও আয়তন দেখিয়া লইলাম। সম্মুখেই অত্যুচ্চ ফটক বা "পাইলন।" মাদুরার এবং দক্ষিণভারতের "গোপুরম্"গুলির ন্যায় এই পাইলনের গাম্ভীর্য্য ও উচ্চতা চিত্তে অভিনব জগতের বার্ত্তা আনিয়া দেয়। হেলিয়োপোলিসের ওবেলিস্ক এবং চন্দ্রমন্দিরের ফটক ইহার তুলনায় বামন মাত্র। কি স্থূলতা, কি বিশালতা, কি দৃঢ়তা, কি উচ্চতা, সকল বিষয়েই য্যামনদেব-মন্দিরের ফটক হৃদয়কে বিস্ময়াপ্লুত করে। ধীরে ধীরে স্ফিঙ্কসের সারির মধ্যকার গলির ভিতর দিয়া ফটকের নিম্নে আসিলাম। তাহার পর উন্মুক্ত বিশাল প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলাম। প্রাঙ্গণের সম্মুখে, পার্শ্বে, সর্ব্বত্র বিরাট ও বিপুল স্থাপত্য এবং বাস্তুবিদ্যার নিদর্শন। নানা স্তম্ভে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটাই একএকটা মিনার ওবেলিস্ক বা শিখরের তুল্য গরীয়ান্।

প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়া উত্তর দিকের দরজার নিম্নে আসিলাম। ঊর্দ্ধে তাকাইয়া দেখি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডে দরজার ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন খিলান বা কাষ্ঠাশ্রয় নাই। ২০ ফুট আন্দাজ বিস্তৃত দরজা একখণ্ড শিলার দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। এই দরজা দিয়া মন্দিরের উপরে উঠিলাম। সেখান হইতে মন্দিরের যে দৃশ্য দেখা গেল জগতে আর কোথাও তাহা দেখা যাইবে কি না সন্দেহ। সর্ব্বত্র অসীম অনন্ত শিল্পকার্য্যের সাক্ষ্যস্বরূপ অসংখ্য বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে। সুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে মানবসভ্যতার
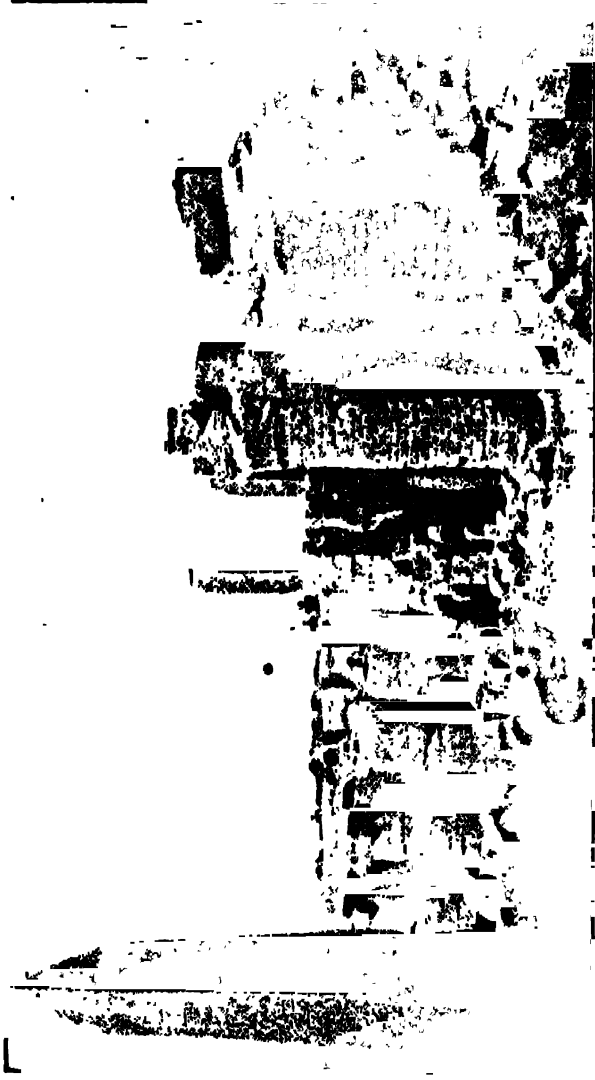
য়্যামন-মন্দিরের এক অংশ।

প্রাচীন নিদর্শনগুলি স্তূপীকৃত ধ্বংসাকারে অথবা অর্দ্ধপরিষ্কৃত অবস্থায় দেখা যাইতেছে। কোথাও ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা, হীনতা, পঙ্গুতা, দুর্ব্বলতার চিহ্ন মাত্র নাই। প্রবল রাষ্ট্রশক্তি, প্রবল ধনশক্তি, বিরাট অতুল ঐশ্বর্য্য, অগণিত শ্রমজীবীকুল, কর্ম্মকুশল স্থপতি ও ভাস্কর, ধর্ম্মভাবের ও ভক্তিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা—এই-সকল কথাই সেই উর্দ্ধস্থান হইতে কল্পনা ও ধারণা করিতে লাগিলাম। এখানে মিশরীয়দিগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং কলা-নৈপুণ্যের কথা চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। তাহাদের বিপুল বিস্তৃত অধ্যবসায়, জগদ্ব্যাপী সাধনা এবং অসীম ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাইয়াই স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। মানব-শিল্পের এরূপ বিরাট্ কাণ্ড জগতের কোন এক স্থানে পুঞ্জীকৃত ভাবে আর কখনও দেখিতে পাইব কি?

প্রথমে পশ্চিম দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। দেখা গেল—নিম্নে স্ফিঙ্কসের সারি-গঠিত গলি এবং পুরাতন রোমীয় ইষ্টকের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীরের স্তূপ। তারপর খেজুর বৃক্ষের কুঞ্জ এবং কৃষিভূমি। তাহার পাদদেশে নৌকা-শোভিত নাইল নদ। অপর পারে আবার চাষ আবাদ—শেষে আফ্রিকার লীবিয় পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গাবলী।

উত্তর দিকে দেখিলাম—সম্মুখে পুরাতন মন্দির ও নগর বা পল্লীসমূহের ধ্বংসীভূত স্তূপীকৃত ইষ্টক ও আবর্জ্জনারাশি। প্রাচীন দেওয়ালের উপকরণসমূহও যথাস্থানে দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ন্যায় দেখাইতেছে। কোন মন্দিরে প্রবেশ করিবার পথস্বরূপ একটা ফটক বা 'পাইলন'। পরে অসংখ্য উদ্ভিদ্‌রাজি—খেজুর বৃক্ষের বন।

পূর্ব্বদিকে দেখা গেল—ভগ্নস্তূপ ও পুরাতন প্রাচীর, বৃক্ষরাজি এবং কৃষিক্ষেত্র। বহুদূরে মকাওম পর্ব্বতের ধূসর প্রস্তর বালুকার ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে।

সর্ব্বশেষে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। পুরাতন প্রাচীরের চিহ্ন সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ইষ্টক এবং আবর্জ্জনার স্তূপের ত অন্ত নাই। সম্মুখেই চন্দ্র-মন্দির। তৎপার্শ্বে খেজুর বন। পরে শ্যামল বৃক্ষরাশির অভ্যন্তরে লুক্‌সরনগরের হর্ম্ম্যাবলী।

সমস্ত মন্দির এবং চারিদিককার আবেষ্টন এক দৃষ্টিতে দেখিয়া সমগ্র অট্টালিকার আয়তন ও পরিমাপের সম্যক ধারণা জন্মিল। একটা প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ ক্ষেত্র। প্রত্যেক ভূজ প্রায় ½ মাইল লম্বা। প্রথমে বৃক্ষশ্রেণীর চতুর্ভুজ—পরে রোমীয় ইষ্টকের প্রাচীরনির্ম্মিত চতুর্ভুজ। তাহার ভিতর য়্যামন-মন্দির বা য়্যামন-নগর। ইহাকেই গ্রীকেরা শতদ্বারবিশিষ্ট নগর-রূপে জানিত। দক্ষিণ দিকের চন্দ্রমন্দিরের ন্যায় উত্তরে এবং পশ্চিমেও দুইটি মন্দির, বোধ হয় এই আবেষ্টনেরই অন্তর্গত ছিল।

চতুঃসীমা দেখিয়া মন্দিরের ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। সেই উচ্চ স্থান হইতে দেখা গেল—পাদদেশে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। এত বড় প্রাঙ্গণে বোধ হয় দিল্লীর সমস্ত জুম্মা মসজিদ অবস্থিত হইতে পারে। প্রাঙ্গণের দুই ধারে বারান্দা। বারান্দার সম্মুখে স্তম্ভরাশি। স্তম্ভগুলির শিরোভাগে চতুষ্কোণ প্রস্তরফলক। স্তম্ভশ্রেণীর সম্মুখে স্ফিঙ্কের সারি। প্রাঙ্গণের ভিতরে পূর্ব্বে-পশ্চিমে দণ্ডায়মান স্তম্ভসমূহ, তাহাদের কয়েকটি মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান। এইগুলির শিরোদেশ পুষ্পের সর্ব্বোপরিস্থ আবরণের আকৃতিবিশিষ্ট।

প্রাঙ্গণের পর গৃহ—গৃহের ভিতর বহু স্তম্ভ। সেই ঊর্দ্ধভূমি হইতে বেশী দেখা গেল না। তাহার পূর্ব্বে একটি ওবেলিস্ক দেখিতে পাইলাম। ঐ স্থানে একটা নিম্নতর ওবেলিস্কও আছে। তাহা দেখা গেল না। সমস্ত মন্দির পূর্ব্বে-পশ্চিমে বিস্তৃত; চন্দ্র-মন্দির উত্তরে-দক্ষিণে বিস্তৃত। প্রাচীন মিশরের মন্দিরগুলি সমচতুর্ভুজ নয়—চৌড়া অপেক্ষা লম্বায় বড়। য়্যামন-মন্দিরের কুত্রাপি শিখর বা গম্বুজ দেখিতে পাইলাম না।
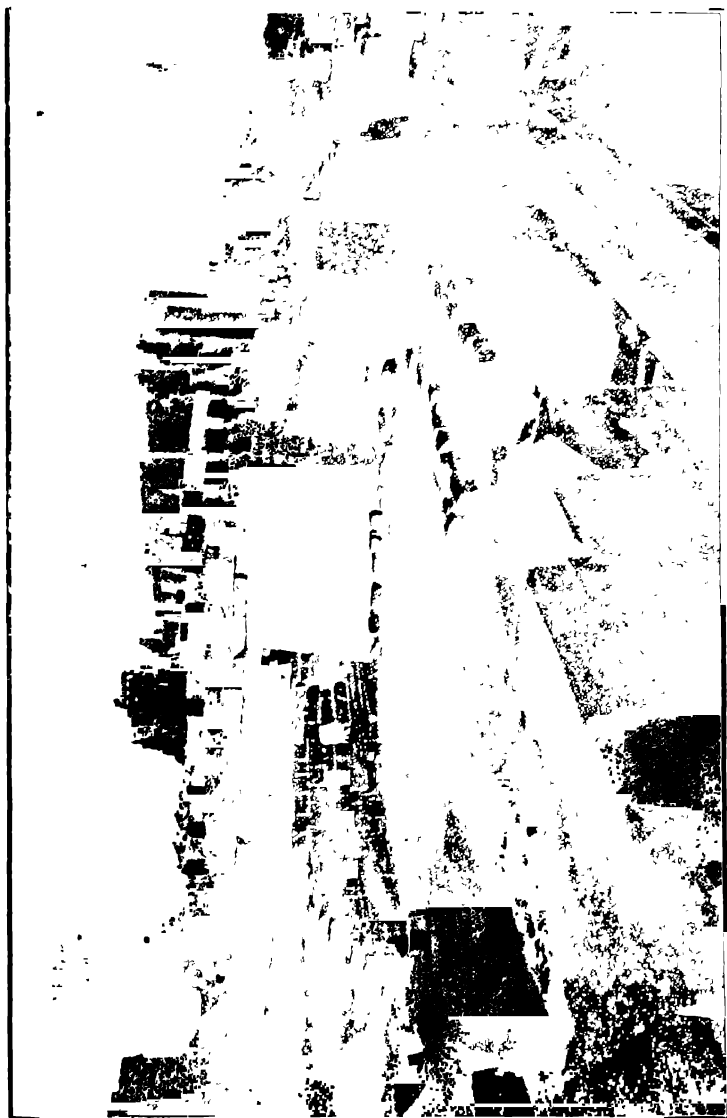
প্রাঙ্গণের ভিতরে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আর একটা মন্দির। এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। চন্দ্র-মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরটি পঞ্চগৃহবিশিষ্ট:—(১) পাইলন, (২) প্রাঙ্গণ, (৩) গৃহ, (৪) গৃহ (৫) মন্দির।

ফটকে রাম্‌সেসের দুইটি বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি, ফটকের বহিঃপ্রাচীরে নানা চিত্র। রাম্‌সেসের যুদ্ধকৌশল এবং সংগ্রামে জয়লাভ এবং য়্যামনদেবের আশীর্ব্বাদ চিত্রিত রহিয়াছে। প্রাঙ্গণে রাম্‌সেসের মূর্ত্তি—এক এক দিকে আটটি। চন্দ্রমন্দির দেখা থাকিলে এই মন্দির-নির্ম্মাণের কারিগরি নূতন করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হয় না। তবে এই মন্দিরে তিনটি দেবতার স্থান—মধ্যস্থলে য়্যামন, ডাহিনে চন্দ্র, বামে 'মত'। প্রত্যেক দেবতাই নৌকায় আরূঢ়-রূপে চিত্রিত। রাম্‌সেস বাম হস্তে ধূপ জ্বালাইয়াছেন, এবং দক্ষিণ হস্তে জলপাত্র হইতে পূজার জল ঢালিতেছেন, এইরূপ বুঝা যায়।

রাম্‌সেসের এই ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া প্রাঙ্গণের ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণ হইতে প্রধান মন্দিরের পূর্ব্বদিকের গৃহে গমন করিলাম। এই গৃহ প্রায় অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে। প্রায় ২০৭ স্তম্ভ। স্তম্ভে নানা সম্রাটের নাম ও কীর্ত্তি খোদিত এবং তাঁহাদের উপাস্যদেবতাগণের পূজা চিত্রিত। অধিকাংশ স্তম্ভের শিরোদেশে চতুষ্কোণ প্রস্তর-ফলক। কতক-গুলিতে পুষ্পের সর্ব্বোপরিস্থ আবরণের আকৃতি। প্রাচীরগাত্র, স্তম্ভগাত্র, এবং ভিতরকার ছাদ সবই নানা রংএ চিত্রিত। কয়েকটি মাত্রের রং এখনও দেখা যাইতেছে।

এই গৃহের বিস্তৃতি ৩৩৮ ফুট এবং উচ্চতা ১৭০ ফুট। ১৬ সারি স্তম্ভ হার ভিতর বিদ্যমান। সকল স্তম্ভই এক সময়ে এক ফ্যারাও ব্র

নির্ম্মিত হয় নাই। এক এক অংশ এক এক জনের আমলে প্রস্তুত। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন রাজা ও ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম দেখা যায়। লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথাও বিভিন্ন।

লিপিগুলি আলোচনা করিলে মিশরের প্রাচীন ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে। কোন চিত্রে হেলিয়োপোলিসের সূর্য্য-মন্দিরে তরুতলে সম্রাট্‌ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইতেছেন। কোন চিত্রে ম্যামন-মন্দিরের পুরোহিতগণ মাথা কামাইয়া ভক্তিভাবে দেবতার নৌকা বহন করিতেছেন। কোন চিত্রে অতি সুন্দর নানা রংএর প্রতিমূর্ত্তি দেবতার সম্মুখে পূজার উপকরণ লইয়া দণ্ডায়মান। প্রাচীরগুলির বহির্ভাগে যে-সকল চিত্র ও লিপি রহিয়াছে তাহা দেখিলে প্রাচীন লড়াইয়ের দৃশ্য বুঝা যায়। দেখিলাম নানাপ্রকার গাড়ী ঘোড়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অথবা যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মিশরবাসীরা এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত। ভিন্ন ভিন্ন জাতির আকৃতি, বেশভূষা, কেশবিন্যাস ইত্যাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপায়ে দেখান হইয়াছে। নদী পার হইবার চিত্রে দেখা গেল—প্রস্তরের উপর তরঙ্গাকার রেখা উৎকীর্ণ হইয়াছে। তাহার মধ্যে কুমীর, হাঙ্গর, কচ্ছপ, মৎস্য ইত্যাদির চিত্র। কোথায়ও শত্রুগণকে বন্দী করিয়া রাজা স্বদেশে ফিরিতেছেন। কোথাও শত্রুরমণীগণ কৃপাভিক্ষা করিতেছে। বন্দীদিগকে বাঁধিয়া আনিবার নানা চিত্র দেখিতে পাইলাম। যুদ্ধের শকটও দেখা গেল। একটা দুর্গ আক্রমণের চিত্র বেশ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সকল চিত্রেই লোকজনের দৃঢ়তা, সজীবতা, তেজস্বিতা, অথবা অন্যান্য ভাব অতিশয় দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

বৌদ্ধমন্দিরাদির প্রাচীরগাত্রে যে-সকল ইতিহাস-চিত্রণ দেখিয়াছি, এগুলি সেই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের ও মিশরের মন্দিরনির্ম্মাণে,

চিত্রকলায় এবং স্থাপত্য-শিল্পে একই আদর্শ, একই নৈপুণ্য, একই ক্ষমতা দেখিতে পাইতেছি।

য়্যামন-মন্দিরের প্রধান গৃহ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে আসিলাম। এখানে দুইটি ওবেলিস্ক রহিয়াছে—পূর্ব্বে আরও ছিল।

এই পূর্ব্বদিকেই য়্যামন-মন্দির প্রথম নির্ম্মিত হয়। দ্বাদশ রাজবংশ যখন থীব্‌স্‌নগরে রাজধানী প্রবর্ত্তন করেন তখন এই অংশেই তাঁহাদের উপাস্য দেবতার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ফ্যারাওগণ নিজ নিজ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি অনুসারে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে হইতে নাইলের কিনারায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ যে চমৎকার গৃহ দেখিতে পাইতেছি তাহা পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণের প্রস্তুত। ইহারা ১৫০০—১০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ কালের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমেনহপিস, থুট্‌মসিস, সেথস্, রামসেস ইত্যাদি এই বংশীয় রাজগণের নাম।

পূর্ব্বদিকের একটা গৃহগাত্রে উদ্যানের চিত্র অঙ্কিত দেখিলাম। অষ্টাদশ রাজবংশের ইহা কীর্ত্তি। ১৫০০—১৩০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দকালে এই বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। থুট্‌মসিস এই রাজবংশের প্রবর্ত্তক। এই উদ্যানে নানাবিধ জীবজন্তু ও উদ্ভিদের চিত্র দেখা গেল। কতকগুলি উদ্ভিদ্ চিনিতে পারা গেল না। সেগুলি বোধ হয় আধুনিক মিশরে আর পাওয়া যায় না।

মন্দিরের পূর্ব্বদিক শেষ করিয়া বাহিরে আসিলাম। পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে একটা সরোবর দেখিলাম এই সরোবরে আসিবার জন্য য়্যামন-মন্দির হইতে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ আছে। এই সরোবর ভূগর্ভস্থ স্বাভাবিক জলস্রোত দ্বারা পুষ্ট হয়। এই সরোবরের উত্তরপূর্ব্ব কোণে একটি উচ্চ মঞ্চের উপর একটি গোলাকার জন্তু দেখিতে কচ্ছপের মত। ইহার

নাম "স্কারাব"। এই জন্তুই প্রাচীন মিশরের ধর্ম্মতত্ত্বে আদি জীব। সূর্য্যদেবের প্রভাবে এই জীব জগতের সকলপ্রকার জীবের সৃষ্টি করে।

আর একটি সরোবর ইহার পার্শ্বে পশ্চিমদিকে ছিল। তাহার মধ্যে ৭০০০।৮০০০ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এগুলি এক্ষণে কাইরোর মিউজিয়মে রক্ষিত হইতেছে। সরোবরের জল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে—এবং মৃত্তিকা দ্বারা ইহাকে পূর্ণ দেখিতে পাইলাম।

কর্ণাকের মন্দির দেখিলে লুক্সরের মন্দির না দেখিলেও চলে। রচনা-কৌশল একপ্রকার—সম্রাটের ক্ষমতা, শিল্পীদিগের কল্পনা, ইত্যাদি সকলই একপ্রকার মনে হয়। কোন বিষয়ে খর্ব্বতা লক্ষ্য করিবার নাই। লুক্সর আয়তনে কিছু ক্ষুদ্র।

কার্ণাকের ন্যায় লুক্সরও যুগে যুগে পরিবর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। এখানেও স্তম্ভসমূহই বিশেষত্ব, প্রাচীরগাত্র এবং ছাদসমূহ লিপি-খোদিত। স্তম্ভসমূহের শিরোদেশে প্রস্তরফলক অথবা পুষ্পের বহিরাবরণের আকৃতি। তবে স্তম্ভগাত্রে লিপি ও চিত্রসংখ্যা কিছু অল্প। এবং মন্দির উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। কিন্তু য়্যামনমন্দির পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত।

সর্ব্বপুরাতন অংশ অষ্টাদশ রাজবংশের আমেনহোপিস ফ্যারাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই অংশ দক্ষিণদিকে অবস্থিত। রোমীয়েরা এই অংশকে গির্জ্জায় পরিণত করিয়াছিল।

ঊনবিংশ রাজবংশীয় রামসেস উত্তরদিকের মন্দিরকে পরিবর্দ্ধিত করেন। তাঁহার আমলের স্তম্ভগুলি অতিশয় বৃহদাকার গাম্ভীর্য্যবিশিষ্ট এবং বিপুলায়তন। এই অংশে রামসেসের কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি আছে। মর্ম্মরের ন্যায় শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি প্রস্তরাসনে সস্ত্রীক উপবিষ্ট। তাহার উত্তরে, প্রাঙ্গণের ভিতরে স্তম্ভের মধ্যে একটি করিয়া দণ্ডায়মান গ্রানাইট প্রস্তরের রামসেস-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি লুক্সর মন্দিরের

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। দুইটি কৃষ্ণ গ্রানাইট-পাথরের মূর্ত্তি প্রাঙ্গণের শেষে গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মস্তকে দক্ষিণ বা উত্তর মিশরের রাজমুকুট। কোন কোন রামসেস-মূর্ত্তির পার্শ্বভাগে তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি খোদিত অথবা প্রস্তর-নির্ম্মিত। এই অঙ্কন ও খোদাইকার্য্যে শিল্প-নৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এই অংশের কতকগুলি স্তম্ভ ও মূর্ত্তি আবর্জ্জনার মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। আবর্জ্জনারাশির উপর নূতন মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং মৃত্তিকাখনন করিয়া অনুসন্ধান করা এক্ষণে অসম্ভব।

উত্তরাংশের প্রাঙ্গণে, প্রাচীরের একস্থানে সমস্ত লুক্সরমন্দিরের রচনারীতি চিত্রিত আছে।

রামসেসের মূর্ত্তিগুলি দুইশ্রেণীর অন্তর্গত। উত্তরদক্ষিণে দণ্ডায়মান-গুলির মস্তকে কোন আভরণ নাই। পূর্ব্বপশ্চিমে দণ্ডায়মানগুলির উপর মুকুট আছে। সকলেরই দাড়ি দেখিলাম। বাম পা অগ্রসররূপে তৈয়ারী। মূর্ত্তিগুলি বিশাল ও তেজস্বী।

এই মন্দিরের পাইলনও রামসেস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মন্দিরের উত্তরে ইহা অবস্থিত। ইহার গাত্রে রামসেসের সমর-কাহিনী চিত্রিত, সীরিয়ার হিটাইটেরা তাঁহার দ্বারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছে।

ষষ্ঠদিবস—পর্ব্বত-গুহায়
মিশরীয় শিল্প

কাল প্রাচীন থীব্‌স-নগরের পূর্ব্বার্দ্ধ দেখিয়াছি। আজ পশ্চিমার্দ্ধ দেখিতে গেলাম। হোটেলের নৌকায় নাইল পার হওয়া গেল। একগণ্ডূষ জল মুখে দিলাম। স্বাদ মন্দ নয়—জলে বালু কিম্বা অন্য কোন ময়লা ভাসে না। মোটের উপর জলের বর্ণ ঈষৎ পীত। এপ্রিল মাস—গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে—জলের স্রোত বেশী নাই। নদীর বিস্তৃতিও অল্পই। মথুরায় যমুনা যত বড়, লুক্‌সরে নাইল প্রায় তত বড়। আমরা সমুদ্র হইতে প্রায় ৬০০ মাইল উর্দ্ধে আছি। কানপুরের গঙ্গা হইতে বঙ্গোপসাগর যতদূর, আমরা এক্ষণে নাইলের মুখ হইতে ঠিক ততদূরে রহিয়াছি। এজন্য নদী এখানে কম প্রশস্ত হইবারই কথা। অবশ্য কাইরোর নিকটেও নাইল বেশী প্রশস্ত নয়।

নৌকাবক্ষ হইতে পূর্ব্বতীরের সৌধসমূহ দেখিতে সুন্দর। লুক্সর-মন্দিরের স্তম্ভশ্রেণী ঈষৎ রক্তবর্ণ আভায় অন্যান্য গৃহাবলী হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমরা যে হোটেলে আছি সেইটাই নদীর ধারের আধুনিক গৃহগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও বৃহৎ।

নদীবক্ষে কতকগুলি ফেরিনৌকা লোকজনকে পার করিতেছে। শীতকাল চলিয়া গিয়াছে। পর্য্যটক এখন একেবারেই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে দুই চারিজন আছেন তাঁহাদিগকে অপর পারে লইয়া

যাওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গাধা ঘোড়া গাড়ী কুলী ইত্যাদিও চলিয়াছে। আরও কতকগুলি নৌকা নদীবক্ষে দেখা গেল। এই-সমুদয় ব্যবসায়-তরণী। সকল নৌকায়ই দুইটি করিয়া মাস্তুল ও পাল। দেখিতে মন্দ নয়।

আমাদের মাঝিরা গান ধরিয়াছিল। গানের বিষয় মহম্মদের স্তুতি। গান শুনিতে শুনিতে পূর্ব্বতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। আমাদের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে নদী বাঁকিয়াছে। পূর্ব্বদিকের মকাওম পাহাড়ে ঠেকিয়া নদীর গতি বাধা পাইয়াছে, এজন্য নদী কিছু পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়াছে। নৌকা হইতে দেখা গেল যেন পূর্ব্বদিকের পাহাড় নদীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হইতে হইতে দক্ষিণদিকে আসিয়া নাইলের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে।

পাঁচ মিনিটের ভিতরেই নদীর অপর পারে পৌঁছিলাম। কেবল বালুকারাশি। ইহা মরুভূমির বালি নয়। বর্ষাকালে নদী বাড়িলে পশ্চিম কূল ছাপাইয়া উঠে। যতখানি পর্য্যন্ত জল যায় ততখানি পলি পড়ে। এই বালুর সঙ্গে সেই পলি মিশ্রিত। সুতরাং ইহা অতিশয় সূক্ষ্ম ও কথঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ। বালুকার উপর দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। যতখানি নদী, বালুকারাশির বিস্তৃতিও ততখানি। গ্রীষ্মকালে নদী প্রায় অর্দ্ধেক শুকাইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে নদীর ধারে পলিমাটির এবং বালির উপর যে সকল শস্য জন্মে নাইলনদীর ধারেও সেই সমুদায় দেখিলাম। তরমুজ, শসা, পেঁয়াজ, মটরশুটি, কুমড়া ইত্যাদি নানাপ্রকার শাকশব্জীর চাষ হইতেছে। মেষ ও ছাগলের পাল চরিতেছে। গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের পৃষ্ঠে লোকেরা যাতায়াত করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গোধূমক্ষেত্র ও খেজুরবন। এখানে ভূমির এত উর্ব্বরতা শক্তি যে সামান্য চাষেই অতিঘনসন্নিবিষ্ট উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়। চাষের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল নাইলের পলিমাটিতে

বিঘায় প্রায় ২০।২৫ মণ গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্জাবের খালের সমীপবর্ত্তী জমি এবং যুক্তপ্রদেশের গঙ্গার কিনারা ব্যতীত এই পরিমান শস্য ভারতবর্ষের আর কোথাও বোধ হয় জন্মে না।

বরাবর উত্তরদিকে চলিলাম। নাইলের একটা খাল রাস্তায় পড়িল। আখের ক্ষেতের ভিতর দিয়া একটা ছোট রেলপথও দেখিতে পাইলাম। চিনির কলের জন্য এই রেল প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের রাস্তায় কুশের ঘাসও দেখা গেল। স্থানে স্থানে দেখিলাম—কুম্ভকারেরা বড় বড় মাটির ভাঁড় তৈয়ারী করিতেছে। কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য পারস্যচক্রে এই-সকল ভাঁড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের পাঁজাও মাঠের মধ্যে দেখা গেল।

পূর্ব্বদিকে লীবিয় পাহাড়ের পাদদেশে পুরাতন অট্টালিকার বহু ধ্বংসাবশেষ গাড়ী হইতে দেখিতে পাইলাম। আমরা প্রথমেই এখানে নামিলাম না। পাহাড়ের ভিতরকার একটা নবনির্ম্মিত রাস্তা দিয়া আমরা ইহার অপরদিকে যাইতে লাগিলাম। দুই পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বতগাত্র। সর্ব্বত্র শ্বেত অথবা ঈষৎ কাল লাইমষ্টোন পাথর। রাস্তা প্রস্তরময়। পাহাড়ের গায়ে একটি তৃণও জন্মে না। কোন স্থানে একটা ঝরণাও নাই; চারিদিক্ রৌদ্রে পুড়িয়া যাইতেছে। আমরা একটা অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতেছি বোধ হইল।

নাইলের অপর পারে যেখানে কার্ণাকে য্যামন-মন্দির, আমরা পশ্চিম পারের ঠিক সেই স্থানে এই রৌদ্রতপ্ত পার্ব্বত্য উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছি। বিন্ধ্যপর্ব্বত বা দাক্ষিণাত্যের শৈলমালার ন্যায় এই পর্ব্বতশ্রেণী। আমরা পাহাড়ের ভিতর দিয়া দক্ষিণদিকে চালাইতে লাগিলাম। চারিধারের প্রস্তরচূর্ণ ও পর্ব্বতগাত্র দেখিয়া মনে হইল, ইহার কর্দ্দমে অত্যুৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হইতে পারে।

প্রায় আধঘণ্টা এই পথে আসিয়া বিবান-এল্-মুলকে উপস্থিত হই-লাম। প্রাচীন ফ্যারাও-সম্রাটগণের এখানে অসংখ্য কবর পর্ব্বতগহ্বরে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

এই পর্ব্বতের পাদদেশেই বহু উত্তরে কাইরোর সন্নিকটে সাক্কারা, আবুসির ও গীজার পিরামিড ও অন্যান্য সৌধসমূহ বিরাজিত। সেইগুলি অতি পুরাতন। মিশরের প্রথম সপ্তদশ রাজবংশীয় নরপতিগণ কবরের জন্য পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিতেন। কিন্তু অষ্টাদশবংশীয়গণের আমল হইতে পিরামিড রচনা স্থগিত হইয়াছে। তখন হইতে পর্ব্বতের ভিতর গুহা খনন করিয়া তাহার মধ্যে শবরক্ষা করিবার রীতি প্রচলিত হইয়া-ছিল। বিবান্ এল্-মুলকে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ রাজবংশের ফ্যারাওদিগের সমাধি রহিয়াছে। সুতরাং এই স্থানে ১৫০০ খ্রীঃ-পূর্ব্ব যুগের পরবর্ত্তীকালের গৃহনির্ম্মাণ, শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কন দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কাল দেখিয়াছি—অপরপারে কার্ণাক ও লুক্সরের সৌধশ্রেণী। সেই-সমুদয়ে দ্বাদশরাজবংশীয়কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী যুগের শিল্পজ্ঞান এবং বাস্তুবিদ্যার পরিচয় পাইয়াছি। তাহাতে প্রাচীন মিশরীয়দিগের কল্পনাশক্তির বিপুলতা, বিশালতা এবং নির্ভীকতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আজ তাহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, মাধুর্য্যবোধ, ললিত-কলা, এবং রং ফলাইবার ক্ষমতা ইত্যাদি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম!

গিরিগহ্বরে গৃহনির্ম্মাণ এবং চিত্রাঙ্কন দেখিবামাত্র দাক্ষিণাত্যের কার্লি, ভাজা, অজন্তার কথা মনে পড়িল। গোয়ালিয়ারের লস্করদুর্গেও এইরূপ সুচিত্রিত গহ্বরগৃহ দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষের সেই গৃহগুলি মঠের জন্য, বিহারের জন্য, ও বিদ্যালয়ের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিশরের এই গৃহসমূহের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। এইগুলি সম্রাটশবের প্রাসাদ; কোন

লোকে না দেখিতে পায় এই উদ্দেশ্যেই পর্ব্বতের ভিতর কবর প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই প্রভেদ প্রথমে বুঝিয়া লইলে ভারতীয় এবং মিশরীয় শিল্পে বোধ হয় আর কোন প্রভেদ পাওয়া যাইবে না পাহাড়ের গা কাটিয়া দ্বার নির্ম্মাণ করা, ভিতর খুঁড়িয়া ঘর প্রস্তুত করা, গৃহগুলির ভিতরকার প্রাচীর ও ছাদ সুচিত্রিত করা, এবং চিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট দক্ষতা, বৈচিত্র্য ও কারিগরি দেখান—এই-সমুদয়ই দুই শিল্পে বর্ত্তমান। এক শিল্পীই ভারতে ও মিশরে কর্ম্ম করিয়াছেন—একথা বলিলে বোধ হয় দোষ হয় না। দুই স্থানের কাজেই এক হাতের পরিচয় পাই। তবে ভারতবর্ষের চিত্রে যে সকল তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারিত করা হইয়াছে, মিশরের চিত্রে সে-সকল বিষয় প্রকাশ করা হয় নাই। দুইদেশের ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। কিন্তু দুইদেশে বোধ হয় এক শিল্পবিজ্ঞানের নিয়মই অনুসৃত হইয়াছে। ভারতীয় কারিগর এবং মিশরীয় কারিগর এই শিল্পীবিদ্যালয়ের সহপাঠী ও গুরুভাই হওয়া অসম্ভব নয়।

অষ্টাদশরাজবংশের অন্যতম সম্রাট্ দ্বিতীয় আমেনহোপিসের (১৪৪৭-১৪২০ খৃঃ পূর্ব্ব) শব যে-কবরে রক্ষিত আছে আমরা সেইটার ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রবেশদ্বার পূর্ব্বদিকে। যে পর্ব্বতগাত্রে ইহা অবস্থিত তাহা দ্বারের ঊর্দ্ধদেশ হইতে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ। ঈষৎ রক্তবর্ণ লাইমষ্টোন পাহাড় আমাদের সম্মুখে মাথা তুলিয়া পূর্ব্বদিকে নাইলের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া লুক্সর ও কার্ণাকের মন্দিরসমূহ দেখিতেছে।

গহ্বরের সকল অংশ দেখাইবার জন্য আজকাল ইহার ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শীতকালে যখন দর্শকসংখ্যা বেশী হয় তখন এই-সকল বাতি জ্বালাইবার হুকুম হয়। আমরা এপ্রিলমাসে গরমের দিনে আসিয়াছি—এখন বেশী লোকজন দেখিতে আসে না। কয়েকজন আমেরিকান ও জার্ম্মাণমাত্র আসিয়াছেন

কাজেই হাতে মোমবাতি জ্বালাইয়া কবর-রক্ষক আমাদিগকে কবরের ভিতর লইয়া গেল। বলাবাহুল্য উপযুক্ত আলোকের অভাবে গৃহগুলির সৌন্দর্য্য তত বেশী উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

গড়ান রাস্তা দিয়া পর পর দুইটি গৃহ পার হইলাম। সবগুলিই প্রায় ১৪ ফুট উচ্চ এবং ৭ ফুট চওড়া। প্রাচীরগুলি ধূসরবর্ণ বালুকাময় প্রস্তরে নির্ম্মিত। পাহাড়ের উপরিভাগ কিন্তু লালবর্ণ। কোন গৃহ চিত্রিত ও লিপিযুক্ত, কোন গৃহে লেখা বা চিত্রাদি নাই।

এই তিন ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে অনেকটা গভীরস্থানে পৌঁছিলাম। তাহার পর চতুর্থ ঘর। এটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত। ইহার মেজে তৃতীয় গৃহের মেজে অপেক্ষা ২৫ ফুট নিম্নে বোধ হইল। এই চতুর্থ গৃহের ছাদে কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ প্রলেপ। তাহার উপর শ্বেত বা পীতবর্ণ তারকাসমূহের চিত্র। ইহার প্রাচীরগাত্রে লাল কাল পীত ইত্যাদি নানা রংএ চিত্রিত অসংখ্য স্তম্ভের শ্রেণী অঙ্কিত রহিয়াছে। এই গৃহ পার হইবার জন্য একটা ক্ষুদ্র পুলের উপর দিয়া যাইতে হইল। চতুর্থ গৃহ পার হইয়া পঞ্চম গৃহে আসিলাম। এই গৃহে দুইটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ। এতক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে আসিয়াছি। এইবার পঞ্চমগৃহের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে গেলাম। সেখানে একটা গড়ান সিঁড়ির সাহায্যে প্রায় ১০ ফুট নীচে নামিতে হইল। নামিয়াই একটা প্রকাণ্ড গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

এই গৃহ উত্তরে-দক্ষিণে লম্বা। সর্ব্বসমেত ছয়টা চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে। এইগুলির সাহায্যে ছাদ সুরক্ষিত। ছাদে আকাশ ও তারকার চিত্র। প্রাচীর ও স্তম্ভের গাত্রে নানাপ্রকার ধর্ম্মতত্ত্বের কাহিনী চিত্রিত। চারিটা স্তম্ভ পার হইয়া দক্ষিণদিকের শেষ দুই স্তম্ভের নিকট আসিলাম। সেইখানে কবর-রক্ষক আলোক নামাইয়া দেখাইল গৃহের

দক্ষিণতম অংশ সাধারণ মেজে অপেক্ষা প্রায় ৮।১০ ফুট নিম্নতর। কিন্তু তাহার ছাদ একই। এই নিম্নতর মেজের ভিতরে একটা "সার্কোফেগাস্' বা পাথরের সিন্দুক। পাথরের গায়ে চিত্র অঙ্কিত ও লিপি খোদিত এই সিন্দুকের ভিতর মানবমূর্ত্তি—জীবন্ত মানুষের মত এই শব দূর হইতে দেখা যাইতেছে। মুখমণ্ডলের ভাব কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। মস্তক পশ্চিমদিকে শায়িত। পূর্ব্বে একখানা প্রস্তরফলক সিন্দুকের ঢাকনি ছিল। এক্ষণে তাহা নিকটে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে একটা কাচের আবরণে সিন্দুক ঢাকা রহিয়াছে, এবং মুখের উপরে একটা বৈদ্যুতিক আলোর বাতি রক্ষিত হইয়াছে। বাতি জ্বলিলে মস্তকের নিকট হইতে সমস্ত মৃতদেহ ও মুখশ্রী অতি সুন্দর দেখায়। এই দেহ সম্রাট আমেনহোপিসের। তিনি ৩৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

এই সুবৃহৎ গৃহের পশ্চিমে একটা ক্ষুদ্র গৃহ। তাহার মধ্যে দেখিলাম তিনটি 'মাম্মি', একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী ও অপরটি ইহাদের কন্যা। স্ত্রীদ্বয়ের চুল এখনও রহিয়াছে—পাটের চুলের মত পাকা দেখাইতেছে। অবয়ব কিছু শীর্ণ—মুখের গঠন কিছুই বিকৃত হয় নাই, দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। শরীরের স্বাভাবিক রং লুপ্ত হইয়াছে। পেটের ভিতরকার নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছিল। এই শবদেহগুলি বোধ হয় সম্রাটের আত্মীয় ব্যক্তিগণের হইবে, পার্শ্বের এই গৃহে রক্ষিত ছিল। পশ্চিম পার্শ্বেও দুই একটি ক্ষুদ্র কামরা আছে দেখিলাম। ইহাতেও এইরূপ 'মাম্মি' ছিল। সেগুলিকে কাইরোর যাদুঘরে সরান হইয়াছে।

এই কবরের 'মাম্মি' কয়েকটা যথাস্থানেই রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আধুনিক তত্ত্বাবধায়কগণ দর্শকদিগকে প্রাচীন প্রথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য মাম্মিগুলির আবরণ-বস্ত্রসমূহ খুলিয়া ফেলা হইয়াছে। অনাবৃত শরীর দূর হইতে সকলেই দেখিতে পাইবেন।

মেনহোপিসের কবর দেখিয়া তৃতীয় রামসেসের কবর দেখিলাম। ইনি ১২০০-১১৭৯ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কবরটি প্রথম অপেক্ষা বিস্তৃত এবং বৃহৎ। গৃহসংখ্যা এবং গৃহের নির্ম্মাণ-প্রণালী একরূপ, কেবল প্রথম তিনটি গৃহের দুই পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা আছে, কিন্তু প্রথম কবরে এই-সমুদয় কামরা নাই। এই কামরাগুলির প্রাচীর নানা চিত্রে সুশোভিত। রন্ধন, পশুহত্যা, নৌচালন, জাহাজের গতি, নাইল-দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রদান, যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র ও সাজসজ্জা, কৃষ্ণ বৃষ ও কৃষ্ণ গাভী, রাজকোষ ও ধনাগার, শিশি বোতল, পেয়ালা, নানা প্রকার তৈজসপত্র, হাতীর দাঁত, গহনা, এবং আরও বহুবিধ বিষয়ের চিত্র এই দশ এগারটা গৃহের মধ্যে দেখা গেল। মিশরের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের নানা তথ্য এই গৃহগুলির কারু-কার্য্যের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। অন্যান্য গৃহের প্রাচীরগাত্রেও অতি সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত। সর্ব্বত্র রং ফলাইবার ক্ষমতা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইতে হয়। বদনমণ্ডলের লাবণ্য অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

একে একে সকল গৃহ দেখা হইয়া গেল। ইহার ভিতর হইতে সার্কোফেগাস এবং মম্মি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কাইরো-মিউ-জিয়ামে এই-সমুদয় এক্ষণে রক্ষিত হইতেছে।

সকল কবরের রচনাপ্রণালী একরূপ—গৃহসংখ্যা এবং প্রাচীর ও পার্শ্বগৃহের চিত্রাঙ্কন এক নিয়মেই পরিচালিত। কোন কোন অঙ্গে কথঞ্চিৎ বৈচিত্র্য লক্ষিত হইবে মাত্র। কিন্তু সকলগুলিই যে এক ছাঁচে গড়া তাহা বুঝিতে দেরী লাগে না।

প্রাচীরের চিত্রগুলিতে মিশরের ধর্ম্মকাহিনী দেবতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। প্রাচীন মিশরবাসীরা বিবেচনা করিতেন, মৃত্যুর পর

মানুষ পাতালে প্রেরিত হয়। সেইখানে প্রেতাত্মা রাত্রিকালে নৌকা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পাতালে মৃত ব্যক্তির এই ভ্রমণ-কাহিনী মিশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বহু গ্রন্থে আমরা জানিতে পারি। সেই-সকল গ্রন্থে যে-সমুদয় বচন ও উপদেশ আছে প্রধানতঃ সেই-সমুদয়ই প্রাচীরগাত্রে চিত্রিত ও অঙ্কিত হইত. মিশরবাসীদিগের বিশ্বাস ঐ-সকল গ্রন্থের সারমর্ম্ম জানা থাকিলে মৃত ব্যক্তি সহজে যথাস্থানে পৌঁছিতে পারে।

তৃতীয় রামসেসের কবর পাহাড়ের পশ্চিম দিকের পাদদেশে। এই পাহাড়ের পূর্ব্বভাগের পাদদেশে রাণী হাৎসেপ্‌সুটের মন্দির। পাড়ার পার হইয়া পূর্ব্বদিকে যাওয়া যায়। পাহাড়ের পৃষ্ঠ হইতে লুক্‌সর, কার্ণাক, নাইলের উভয় কূল, মকাওম পর্ব্বত এবং ইহার পূর্ব্বচরণস্থিত মন্দির, কবর, প্রতিমূর্ত্তি, ধ্বংস, স্তূপ প্রভৃতি একদৃষ্টিতে দেখা যায়। কিন্তু দ্বিপ্রহরে এই গরমের মধ্যে পাহাড়ে উঠিবার বাসনা ত্যাগ করিয়া যেপথে আসিয়াছি গাড়ীতে সেই পথেই চলিলাম। পাহাড়ের উপত্যকা শেষ করিয়া উত্তরদিক দিয়া উহার পূর্ব্বচরণতলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উত্তরসীমায় কার্ণাকের মন্দির নাইলের অপর পারে দেখিতেছিলাম। দক্ষিণসীমায় লুক্‌সরের মন্দির নাইলের অপর পারে দেখিতেছি। এইখানে ডেরেল-বাহরির মন্দির।

এই রাণী অষ্টাদশ রাজবংশসম্ভূতা ছিলেন। সম্রাট তৃতীয় থুটমসিস ইহাঁর ভ্রাতা ও স্বামী। ইহাঁরা ১৫০০-১৪৪৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছেন। ইহাঁদের উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব ছিল না, পরস্পর প্রতিযোগিতা অতিশয় প্রবল ছিল।

এই মন্দিরের রচনাকৌশল বিচিত্র। লুক্‌সর ও কার্ণাকে দেখিয়াছি প্রথমে যেস্থানে মন্দির নির্ম্মিত হয় পরবর্ত্তী সম্রাটেরা সেখান হইতে উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে ইহার আয়তন বাড়াইয়া দিতেন। এইরূপে

প্রাথমিক ক্ষুদ্র দেবালয় বিশাল ধর্ম্ম-মন্দিরে পরিণত হইত। ডেরেল-বাহরিতেও সেই পরিবর্দ্ধন দেখিতেছি। কিন্তু এই পরিবর্দ্ধনের রীতি স্বতন্ত্র। এখানে ক্রমশঃ নিম্নভাগ হইতে উর্দ্ধভাগে মন্দির পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। নদীর ঘাটে ইষ্টক বা প্রস্তরেব সিঁড়ি যেরূপ দেখায়, এখানকার মন্দিরও সেইরূপ নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে সিঁড়ির মত উঠিয়াছে।

এই মন্দির বর্ত্তমানে তিনটি ধাপে বা স্তরবিন্যাসে সম্পূর্ণ। প্রত্যেক স্তর-বিন্যাসই সুবিস্তৃত এবং বিশাল—প্রকাণ্ড মাঠ বা প্রাঙ্গণের উপর প্রত্যেকটি স্থাপিত। তিনটি ধাপেরই মধ্যভাগ দিয়া একটা গড়ান প্রশস্ত রাস্তা নিম্নভাগ হইতে উর্দ্ধদিকে গিয়াছে। এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক স্তরের অর্দ্ধাংশ। উঠিতে গেলে ডাহিনে ও বামে প্রত্যেক স্তরকে দুই অংশে বিভক্ত দেখা যায়। সুতরাং সর্ব্বসমেত ছয়টি অংশে এই মন্দির সম্পূর্ণ—উত্তরে তিনটি, দক্ষিণে তিনটি।

প্রত্যেক স্তরবিন্যাসে সাধারণ মন্দির-রচনার রীতি কথঞ্চিৎ দেখিতে পাইলাম। সর্ব্বোচ্চ স্তরেই একটা পূর্ণাঙ্গ মন্দির রহিয়াছে। ফটক, প্রাঙ্গণ, স্তম্ভের সারি, গৃহ, ইত্যাদি সবই এই স্তরে দেখা গেল। কিন্তু মন্দিরের বহিরংশ ভগ্ন—ভিতরকার গৃহগুলি এক্ষণে দেখা যায় মাত্র। প্রাচীরগাত্র যথারীতি চিত্রিত ও অঙ্কিত।

এই মন্দিরের প্রত্যেক ধাপেই কতকগুলি খিলান-করা গৃহ ও বারান্দা আছে। দ্বিতীয় স্তরের উত্তরাংশের বারান্দায় দেখিলাম রাণী পাণ্টদেশে বাণিজ্যতরী পাঠাইতেছেন। সেখান হইতে ধূপ, হাতীর দাঁত, মূল্যবান্ ধাতু ইত্যাদি জাহাজে করিয়া আনা হইতেছে। দক্ষিণাংশে রাণীর জন্ম হইতে বয়োবৃদ্ধি পর্য্যন্ত নানা অবস্থার চিত্র অঙ্কিত। এই অংশের অঙ্কনগুলি দেখিয়া মিশরীয়দিগের জীবনতত্ত্ব এবং দেবতাদের

সঙ্গে মানবের সম্বন্ধবিষয়ে জ্ঞান সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। এই অংশের প্রাঙ্গণে দেখিলাম একটা সুবৃহৎ স্থূলাকার সর্পের প্রস্তরমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। এক্ষণে নানা টুকরায় ইহা বিভক্ত। সর্ব্বোচ্চ স্তরের একটি গৃহের প্রাচীর দেখিয়া প্রাচীন মিশরের সকল প্রকার কৃষি ও শিল্প বুঝিয়া লইলাম। মিশরের প্রত্যেক জেলা হইতে লোকেরা নিজ নিজ বিশিষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য বহিয়া আনিয়াছে। এইগুলি রাণীর নিকট উপহার প্রদত্ত হইতেছে। কোন গৃহে দেখিলাম গো-পূজা ও গো-সেবার চিত্র। এক চিত্রে রাণী গাভীর বাঁট হইতে পবিত্র দুগ্ধপানে নিরত। আর একস্থানে কুলীরা রাণীকে চেয়ারে করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেছে।

এই মন্দির কোন একসময়ে বা একজনের আমলে সম্পূর্ণ হয় নাই। স্থানে স্থানে দেখিলাম রাণীর চিত্র ও নাম প্রাচীর হইতে সযত্নে মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। তাঁহার স্বামী তৃতীয় থুট্‌মসিস যখন তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া একাকী সম্রাট হন তখন তিনি রাণীর চিত্র যথাসম্ভব ধ্বংস করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

নাইলের পশ্চিম পারের কবরসমূহ এবং এই মন্দিরটি দেখিয়া প্রধানতঃ ও বিশেষভাবে মিশরীয় চিত্রশিল্পেরই পরিচয় পাওয়া গেল। এই-সকল চিত্রে বহিরাকৃতির সৌষ্ঠব এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। রেখাপাত অতি দক্ষতার সহিতই হইয়াছে। চিত্র-গুলি কোন কোন স্থলে খোদিত—কোন কোন স্থলে "রিলিফ্"রূপে গঠিত। উভয়প্রকার শিল্পেই রংএর বৈচিত্র্য ও সামঞ্জস্য প্রকটিত। রংএর সন্নিবেশে ও রীতিতে মাধুর্য্যের এবং সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। চিত্রগুলি দেখিলে মনে হয় আমরা জীবন্ত নরনারীর সঙ্গে চলাফেরা করিতেছি। পশুপক্ষী তরুলতাগুলিও জগতের যথার্থ উদ্ভিদ্ ও জীব-জন্তুর অনুরূপ। মূর্ত্তিগুলির অবয়বের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে একটা

সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা এবং যথোচিত অনুপাত রক্ষা করা হইয়াছে। চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে কোনরূপ ভুল হয় না।

কোন চিত্রে দুর্ব্বলতা, হীনতা, বা দৈন্যের পরিচয় পাইলাম না। জীবজন্তুগুলি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ। সর্ব্বত্র সজীবতা, তেজস্বিতা, প্রফুল্লতা এবং শক্তিমত্তার চিহ্ন ও নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি। বৃহদাকার মূর্ত্তি ও চিত্রের মধ্যে একসঙ্গে তেজ ও লাবণ্য, শক্তি ও কমনীয়তা প্রকাশ করা সহজ কথা নয়। এইরূপ আশ্চর্য্য সমন্বয় কেবল একটি বা দুইটি-মাত্র চিত্রেই আছে তাহা নয়। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র বৃহৎ মধ্যমাকৃতি চিত্রের অঙ্কনে শিল্পীরা এই অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

এই গেল চিত্রাঙ্কনের ও মূর্ত্তিগঠনের বহিঃশিল্প বা টেক্‌নিক। মূর্ত্তি-গুলির ভিতরকার কথাও অতি সুচারুরূপে প্রকটিত। হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, নানাবিধ মনোভাব, হিংসাদ্বেষ, শত্রুতা, প্রেম, স্নেহ, সৌহার্দ্দ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বাৎসল্য ইত্যাদি সবই আমরা এই চিত্র-জগতে দেখিতে পাই। ছবি দেখিলেই বুঝিয়া লইতে পারি—কোন্ আদর্শ, কোন্ মনোভাব, কোন্ চিন্তা প্রচার করিবার জন্য শিল্পী বাটালী ও তুলি হাতে লইয়া-ছিলেন। মিশরের প্রাচীন ইতিহাস, জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গ, বিচিত্র অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, সংগ্রাম ইত্যাদি সকল বিষয়ই কেবলমাত্র চিত্রসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে শিখিতে পারি। এই চিত্রসমূহই প্রাচীন মিশরবাসীর প্রকৃত ইতিহাস।

চিত্রগুলির মধ্যে মিশরীয়দিগের ভক্তিভাব অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মতত্ত্বে পশুপক্ষী তরুলতার মর্য্যাদা খুব বেশী। হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বে যেমন জগতের নিকৃষ্ট জীবজন্তু উদ্ভিদাদি উচ্চস্থান পাইয়াছে, মিশরবাসীর ধর্ম্মেও সেইরূপ। চিত্রগুলি দেখিলে দেবতার আদর্শ, পূজারীদিগের চরিত্র, যজমানের মনোভাব, সাধকের ধর্ম্মজ্ঞান,

পশুপক্ষীর উচ্চসম্মান, জীবে দয়া, সর্ব্বস্বদানের প্রবৃত্তি, পরলোকে বিশ্বাস, ইহজীবনে অনাস্থা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সকল চিত্রের মধ্যে জীব-জন্তু এবং নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অতিশয় পরিস্ফুট। হিন্দুস্থানের শিল্পে আমরা যে ভক্তির পরিচয় পাই, এই শিল্পেও আমরা সেইরূপ ভক্তি-প্রবণতা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছি।

ফিরিবার সময়ে মেমনের দুইটি বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া আসিলাম। বহুকাল হইতে প্রবাদ উত্তরদিকের মূর্ত্তি হইতে সূর্য্যোদয়কালে একটা গান উত্থিত হয়। বস্তুতঃ তাহার কোন প্রমাণ নাই।

সপ্তম দিবস—মিশরের দক্ষিণ-দ্বার

আজ দক্ষিণ-মিশরের শেষ সীমায় চলিয়াছি। নিউবিয়া প্রদেশ ও উচ্চতর মিশরের সঙ্গমস্থলে যাইতেছি। এই স্থান মিশরের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। এই অঞ্চল রক্ষা করিতে পারিলেই মিশরের উর্ব্বরভূমি দক্ষিণ হইতে রক্ষিত হইত। আবার এইখানেই নাইল নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নিউবিয়া ও মিশরদেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিত। মিশরের জল সরবরাহ এবং ভূমির উর্ব্বরতার জন্য এই স্থান মিশরের অধিকারে থাকা নিতান্তই আবশ্যক ছিল। অধিকন্তু, এই পথ দিয়াই সুডান নিউবিয়া ইত্যাদি আফ্রিকার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব জনপদসমূহে বাণিজ্য প্রবাহিত হইত। প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্র, শিল্প, কৃষি, ব্যবসায় সকলই এই স্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। এই কারণে প্রাচীনতম যুগে, গ্রীক ও রোমান আমলে এবং মুসলমানকালেও নরপতিগণ এই স্থান আয়ত্ত করিতে চেষ্টিত হইতেন। দক্ষিণে অন্তত এই পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত না হইলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন না। এইজন্য এই প্রদেশে মিশরীয়, গ্রীক-রোমান, মুসলমান সকল যুগের পুরাতন কীর্ত্তি কিছু কিছু বর্ত্তমান। আমরা মিশরের সেই দ্বারদেশ পরিদর্শন করিতে আজ অগ্রসর হইয়াছি।

সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ৭০০ মাইল দক্ষিণে নাইল মিশর ও নিউবিয়ার এই সঙ্গমস্থল সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা লুক্সর হইতে প্রায় ৭ ঘণ্টায় এই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। উত্তর-মিশরে এবং দক্ষিণমিশরের

কিয়দংশে কয়দিন আমরা কাটাইয়াছি। এতদিন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমি আমাদের সর্ব্বদা চক্ষুগোচর হইত। আজ কিন্তু গাড়ী হইতে যেদিকে তাকাই সেই দিকেই শুষ্ক পাথর, মরুভূমির ন্যায় অনুর্ব্বর প্রান্তর। রেলপথ নদীর পূর্ব্ব কিনারার উপর দিয়া বিস্তৃত। আরব্য পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশেই গাড়ী চলিতেছে। স্থানে স্থানে নদীর সঙ্গে পর্ব্বত মিশিয়া গিয়াছে—মধ্যবর্ত্তী স্থানের প্রসার অতি অল্প। অপর কূলেও বেশী ক্ষেত্র নাই। পর্ব্বত প্রায় নদীতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। বালু, ধূলা ও তাপে নিতান্ত কষ্ট পাইতে পাইতে কোন উপায়ে যথাস্থানে পৌঁছিলাম।

স্থানের নাম আসোয়ান। চারিদিকে অনুর্ব্বর পর্ব্বত ও প্রান্তর। নদীর উপরেই আমাদের হোটেল। এখান হইতে আসোয়ানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম দেখাইতেছে। নাইলের দুই পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড় এখানে নদীর দুই কিনারায় দণ্ডায়মান। নদী আরব্য মোকাওম এবং আফ্রিকার লীবিয় পর্ব্বতশ্রেণীর চরণতল ধৌত করিয়া খরস্রোতে প্রবাহিত। কেবল তাহাই নহে—দুই পর্ব্বতশ্রেণী নদীর তলদেশে মিশিয়া গিয়াছে। নদীর ভিতরেই মধ্যে মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গ—নদীর দুই ধারে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ডের স্তূপ এবং পর্ব্বতগাত্রের প্রাচীর। এদিকে উত্তরে দক্ষিণে নদী সোজা প্রবাহিত হইয়া খানিকটা বক্র হইয়াছে। ফলতঃ আসোয়ানের কোন এক নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হইবে—স্থানটা চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতবেষ্টিত, মধ্যে একটা ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী শিলাখণ্ডের ভিতর হ্রদের মত বহিয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার সময় নৌকাবক্ষে নদীতে বেড়ান গেল। সম্মুখেই একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহার নাম এলিফ্যাণ্টাইন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা প্রসিদ্ধ। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব গাত্রে নাইলের জল মাপিবার একটা প্রাচীন

কল দেখিতে পাইলাম। গ্রীক ও রোমানেরাও ইহাকে অতি প্রাচীনরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আসোয়ানের পারে নদীর ধারে একটা প্রাচীন স্নানাগারও দেখিতে পাইলাম। দ্বীপটাই এই বৃক্ষহীন পর্ব্বতরাজ্যের মধ্যে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদের আশ্রয়। আমাদের কিনারা হইতে দ্বীপের কিনারা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি অত্যল্প। লুক্‌সরে যত বড় নাইল দেখিয়াছি এঁখানে তাহার ½ অংশ হইবে। নাইল মাপিবার কলের কাছে প্রাচীন-কালে দ্বীপে যাইবার জন্য আসোয়ান হইতে একটা সেতু ছিল। তাহার চিহ্ন মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান। দ্বীপের সেই অংশে প্রস্তরের দ্বারা প্রাচীর নির্ম্মিত রহিয়াছে।

দ্বীপের পূর্ব্বাংশ ঘুরিয়া দক্ষিণ দিকে গেলাম। সেই অংশে প্রাচীন সাইন নগর অবস্থিত ছিল। গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাসে এই নগর প্রসিদ্ধ। এই স্থানে নদীর মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণ প্রস্তরের পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিলাম। বহুযুগের প্রবল তরঙ্গাঘাতে এবং স্রোতোধারায় প্রস্তরের ভিতর বড় বড় গর্ত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ প্রান্ত হইতে দ্বীপের পশ্চিম দিকে যাইয়া উত্তর দিয়া ঘুরিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পথে প্রবল ঝড় উঠিল। উত্তর দিক হইতে বাতাস বহিতে লাগিল। নৌকার পাল স্থির রাখিতে পারা গেল না। মাঝিরা একবার এপার একবার ওপার দিয়া সর্পাকার-গতিতে নৌকা চালাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু আমাদের বন্ধুগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কাজেই পাল নামাইয়া ফেলা হইল—এবং দ্বীপ প্রদক্ষিণ না করিয়া পুরাতন পথে ফিরিয়া আসিলাম।

আমাদের সম্মুখে গলানো কাচের ন্যায় ক্ষুদ্র নদী। তাহার উপর এলিফ্যাণ্টাইন দ্বীপের উদ্যান ও প্রাসাদতুল্য হোটেলগৃহ। তাহার পশ্চিমে স্বর্ণ-বালুকা-মণ্ডিত লীবিয় পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ সমগ্র দিঙ্‌মণ্ডল ও গগনকে অরুণাভায় রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। নদীবক্ষে ত্রিকোণাকার

শ্বেতপালবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার শ্রেণী। উদ্ভিদের সবুজ রং, পর্ব্বতগাত্র-স্থিত বালুকারাশির নাতিরক্ত নাতিপীত সুবর্ণের কিরণ, উভয় কূলস্থ বালুকার শুভ্র আভা, স্বচ্ছ জলের রজত বর্ণ, নদীগর্ভোত্থিত পর্ব্বতশৃঙ্গের কৃষ্ণ ত্বক্ এবং মাথার উপরে নির্ম্মল নভোমণ্ডল—এই নানাবিধ রংএর সমাবেশে মিশরের দক্ষিণ প্রান্ত অতিশয় নয়নরঞ্জক ও চিত্তবিমোহনকারী-রূপে বিরাজ করিতেছে। আর-কোন একখণ্ড অল্পবিস্তৃত স্থানে স্বাভাবিক রংএর খেলা এত সুন্দর দেখিতে পাইব কিনা সন্দেহ। প্রকৃতি দেবী যেন তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিবার জন্যই আসোয়ানের এই রম্য স্থান বাছিয়া লইয়াছেন। আমাদের আবাসের জানালায় দাঁড়াইয়া উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আবেষ্টনের বর্ণ-বৈচিত্র্যে ও গঠন-গরিমায় মুগ্ধ হইতে হয়।

এখানে আমাদের হোটেলের স্বত্বাধিকারী একজন সুইস্। কাইরোর হোটেলের স্বত্বাধিকারী একজন জার্ম্মাণ। লুক্সরে যে হোটেলে ছিলাম তাহার স্বত্বাধিকারী একটা কোম্পানী—ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণের সমবায়ে ঐ হোটেল পরিচালিত। সুতরাং এ কয়দিনে ইউরোপের নানাজাতির সঙ্গে বসবাস করিয়া লইলাম। কিন্তু সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি—রান্নাঘরের কাজকর্ম্মের জন্য সুইসেরা নিযুক্ত। সুইসেরাই নাকি ইউরোপে শ্রেষ্ঠ রাঁধুনি। ইহাদের হাতে কোন জিনিস নষ্ট হয় না।

প্রত্যেক হোটেলে জনপ্রতি দৈনিক খরচ ১২৲ হইতে ১৫৲ লাগিতেছে। গাড়ী ভাড়া করিয়া নগর দর্শন এবং পুরাতনকীর্ত্তিপূর্ণ ধ্বংস-রাশির ভিতর গমনাগমন করিতেও রোজ ১০৲ টাকার কম খরচ হয় না। তাহার উপর মিশরের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে রেলভাড়া অল্প নয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক উঠাবসায় বকশিসের যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। রেলওয়ে-কুলীদের মজুরী আমাদের দেশের মুটে-

এলিফ্যাণ্টাইন দ্বীপ।
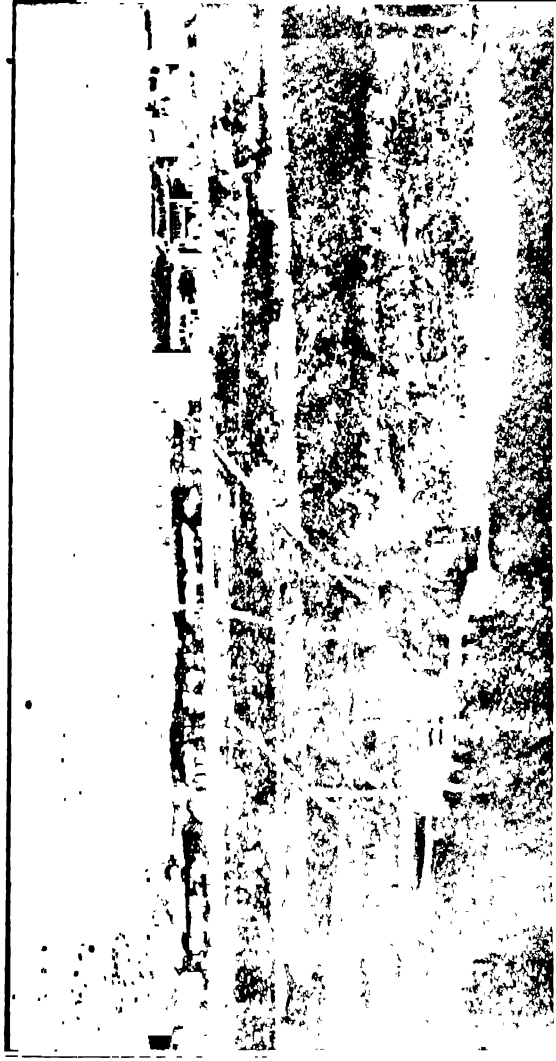
INDIA PRESS, CALCUTTA.

খরচ অপেক্ষা চারিগুণ। এই-সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে মিশর-ভ্রমণ ইউরোপীয় ও আমেরিকান ধনীদিগেরই সাজে। মিশর ভারতবর্ষের এত নিকটে বটে, ভারতবর্ষের বহুলোক মিশরের পথ দিয়াই ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিবৎসর যাতায়াত করিতেছেন সত্য, কিন্তু মিশরে পদার্পণ করিয়া কয়েক দিন বাস করা সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব।

এই জন্যই বুঝিতেছি—কেন ভারতবর্ষের লোকেরা ইউরোপীয় ও আমেরিকান্ সুধীগণের ন্যায় নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে অসমর্থ। ইহাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি বা নৈতিকবল বা চরিত্রশক্তি ভারতীয় শিক্ষিত লোকগণের অপেক্ষা বেশী এরূপ ত মনে হয় না। তাঁহাদের পয়সা আছে—আমাদের পয়সা নাই। তাঁহাদের নিজ তহবিলে পয়সা না থাকিলে তাঁহাদিগকে অর্থ-সাহায্য করিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের নিজ তহবিলে পয়সা ত নাইই—আর অর্থসাহায্য দ্বারা আমাদিগকে দেশ-বিদেশে পাঠাইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার বা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে ব্রতী করিতে পারে এরূপ প্রতিষ্ঠানও নাই।

পাশ্চাত্যসমাজের দুইশ্রেণীর লোক সাধারণত মিশরাদি দেশভ্রমণে বহির্গত হন। প্রথমত লক্ষপতিরা—যাঁহাদের নিকট টাকাকড়ি খেলার সামগ্রীমাত্র। এরূপ ধনবান্ লোক ভারতবর্ষে দুইচারিজন আছেন কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়ত, প্রধান অধ্যাপকগণ এবং তাঁহাদের সাহায্যকারী নবীন অধ্যাপক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ। ইহাঁদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল হইতে অথবা গবর্ণমেণ্টের কোষাগার হইতে অর্থ সাহায্য করা হয়। এই কারণেই ইহাঁরা ৫।৭।১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একদেশে বসিয়া নিশ্চিন্তভাবে লেখাপড়ায় মনোযোগী হইতে

পারেন। "সংরক্ষণ-নীতি" অবলম্বন পূর্ব্বক পণ্ডিতগণের অন্নচিন্তা দূর না করিলে কি কখনও কোথাও "বিশেষজ্ঞ" বা ধুরন্ধর সৃষ্টি করা যায়? পাশ্চাত্য দেশের সকল সমাজই জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য এইরূপ বিশেষজ্ঞ ও ধুরন্ধরের সংখ্যা বাড়াইতে ব্যগ্র। কিন্তু ভারতবাসীর জাতীয় গৌরব পুষ্ট করিবার জন্য কাহার মাথাব্যথা পড়িয়াছে? এইজন্যই আমাদের দেশে উচ্চ-অঙ্গের-পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট ধুরন্ধর ও বিশেষজ্ঞ বেশী দেখিতে পাই না।

আজকাল ভারতবর্ষের বহু উচ্চশিক্ষিত ছাত্র নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইবার জন্য জার্ম্মাণি, জাপান, আমেরিকায় যাইতেছেন। ঘরের কোণে মিশর—ইহাকেও আমাদের বিদ্যালয়রূপে বিবেচনা করিলে মন্দ হয় না। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদির জন্য এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ইতিহাস-চর্চ্চায় ব্রতী হইয়াছেন বা হইবেন তাঁহারা কিছুকাল মিশরে বাস করিলে প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারেন।

মিশরের তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে যশস্বী হইতে পারিব—সম্প্রতি সে উচ্চ আশার বা ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগকে এখন ছাত্র ও শিক্ষার্থীর ন্যায় মিশরে আসিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত মিশরের প্রাচীন শিল্পে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের কোন উপকরণ পাইব কি না সম্প্রতি তাহাও বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। যেমন চোখকান বুজিয়া আমরা জার্ম্মাণিতে যাইয়া পি, এইচ্, ডি উপাধি আনিতেছি, আমেরিকায় যাইয়া এঞ্জিনীয়ারি বা ডাক্তারি শিখিতেছি, বিলাতে ব্যারিষ্টারী শিখিতেছি, সেইরূপ মিশরেও প্রত্নতত্ত্ব শিখিব মাত্র। মিশর প্রত্নতত্ত্বের খনি। এই খনির চারিদিকে ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ ও

আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নিজ নিজ হাতিয়ার লইয়া খননকার্য্য, লিপি-পাঠ, চিত্রসমালোচনা, ও মূর্ত্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিতেছেন। মিশর সমগ্র পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক সমাজের একটা বিরাট ল্যাবরেটরী। আধুনিক মিশর এই কারণে পাশ্চাত্য দেশেরই এক অংশ হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের উত্তরদক্ষিণ পূর্ব্বপশ্চিম প্রান্তে পর্য্যটন করিয়া দেশীয় পুরাতত্ত্বের আকর ও ল্যাবরেটরীসমূহে কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে মিশরের আটঘাট, পর্ব্বত, নদী, মরুভূমি, ধূলিকণা, নূতন নূতন ঐতিহাসিক উপকরণ দান করিবে। এই উপকরণসমূহের আবেষ্টনের ভিতর একবার বসিতে পারিলে স্বতই ইতিহাস-চর্চ্চায় উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে থাকিবে। বিদেশীয় পণ্ডিত ও ধুরন্ধরগণের কার্য্যপ্রণালী, আলোচনাপ্রণালী সকলই জানিতে পারা যাইবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহা-দের সঙ্গে যথার্থ ও আন্তরিক বন্ধুত্ব জন্মিবার সুযোগও হইতে পারে। তাহার ফলে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তুলনামূলক আলো-চনা-প্রণালী অবলম্বিত হইবে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও মিশরীয় পুরাতত্ত্বের সমীকরণ ও সামঞ্জস্য বিধানের কাল সমীপবর্ত্তী হইবে। এইরূপে নব নব উপায়ে ভারতের ঐতিহাসিকগণ জগতের চিন্তাক্ষেত্রে নূতন নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইবেন। বার্লিন, অক্সফোর্ড বা হারভার্ডে বসিয়া এত বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ধুরন্ধর ও বিশেষজ্ঞ-গণের সাহায্য, উপদেশ বা পরামর্শ পাওয়া যাইবে না। মিশরকেই ভারতবাসীর ইতিহাস-বিদ্যালয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

অষ্টম দিবস—আসোয়ানের গ্রানাইট পাহাড়

হেলিয়োপোলিসের গ্রানাইট ওবেলিস্ক পূর্ব্বে দেখিয়াছি। কাইরোর নানা মস্‌জিদে গ্রানাইট প্রস্তরের ফলক ও স্তম্ভ দেখিয়াছি। লুক্‌সার এবং কার্ণাকেও গ্রানাইট প্রস্তরের মূর্ত্তি, সার্কোফেগাস এবং ওবেলিস্ক দেখিয়াছি। আজ সেই গ্রানাইট প্রস্তরের জন্মভূমিতে উপস্থিত। এখানকার পাহাড় গ্রানাইটময়। এই অঞ্চল হইতেই গ্রানাইট পাথর নদীবক্ষে ৪০০।৫০০ মাইল উত্তর পর্য্যন্ত নীত হইত। ভারতবর্ষের নানা মসজিদ, প্রাসাদ ও মন্দিরে বৃহদাকার শিলাখণ্ডের উপর বিচিত্র কারু-কার্য্য দেখা গিয়াছে। অথচ তাহার নিকটে সেই পাথরের খনি বা পাহাড় নাই। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের আদিনামসজিদের কৃষ্ণবর্ণ গ্রানাইট প্রাচীর দেখিয়া মনে হইত এতপরিমাণ কাল পাথর কোথা হইতে আসিল? মিশরের উত্তরাঞ্চলেও ঈষৎরক্তবর্ণ গ্রানাইট প্রস্তরের কার্য্য দেখিয়া সেই প্রশ্নই মনে উদিত হয়। ওখানে গ্রানাইট-পর্ব্বত নাই—এই গ্রানাইট কিরূপে আসিল? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর "আসোয়ানের পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং নাইলের পার্ব্বত্য উপত্যকা প্রাচীন মিশরীয় ফ্যারাওদিগের একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল।"

আজ সেই গ্রানাইট-পাহাড় ও গ্রানাইট-খনি দেখিতে চলিলাম। আসোয়ান নগরের বাহির হইয়াই পূর্ব্বদিকের আরব্য শৈলশ্রেণী রক্তি-মাভ দেখিতে পাইলাম। তাহার পাদদেশের উপত্যকায় লক্ষ লক্ষ প্রস্তর-

ফ্যারাও যুগের অর্দ্ধপ্রস্তুত গ্রানাইট মূর্ত্তি—আসোয়ান পর্ব্বত।

INDIA PRESS, CALCUTTA.

ফলক ছড়ান রহিয়াছে—ভূমি পীত-রক্ত স্বর্ণরেণুসদৃশ বালুকাময় মরুদেশ। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর চিহ্নমাত্র নাই। গর্দ্দভ ও উষ্ট্রই এই অঞ্চলের একমাত্র প্রাণী। স্থানে স্থানে আধুনিক মুসলমানদিগের ইষ্টকনির্ম্মিত কবরসমূহ মরুপৃষ্ঠে বিরাজমান।

পাহাড়ের উপর উঠিয়া দেখিলাম ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরীয়েরা পাহাড় কাটিতেছিল, পাথরের টুকরা তৈয়ারী করিতেছিল, এবং ওবেলিস্ক নির্ম্মাণ করিতেছিল, দৈবক্রমে সেই-সমুদয় স্থগিত হইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধ-সমাপ্ত ওবেলিস্ক বালুকার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। পাথরকাটা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। পর্ব্বতগাত্রে বাটালির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন এই মাত্র কারিগরেরা কাজ সম্পূর্ণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্রামের পর ফিরিয়া আসিয়া আবার কাজে লাগিবে। পাহাড়ের যেদিকে তাকাই সেইদিকেই বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য মরুভূমি। মরুভূমির উপর অসংখ্য শিলাখণ্ড। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই সহস্র সহস্র প্রস্তরশিল্পীর আসনে এক্ষণে রৌদ্র ও বায়ুর অবিরাম অভিনয় চলিতেছে মাত্র

এখানে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না। এজন্য পাথরের দাগ মুছিয়া নষ্ট হয় নাই। পাহাড়ের গায়ে হাতুড়ির সাহায্যে বাটালি বসাইবার নিয়ম ছিল। রেখার মাপ অনুসারে ফ্যারাওর কারিগরেরা পর্ব্বতগাত্রে আঘাত করিত। সেই রেখার মাপ, সেই বাটালির ছিদ্র, সেই প্রস্তরফলকের রাশি, সেই পাহাড় কাটার দাগ আজও দেখিতে পাইলাম!

গ্রানাইটের খনি ও পর্ব্বত দেখা হইল। এক্ষণে নগরের পূর্ব্বদিকস্থ গ্রানাইট-মরুর প্রান্তর দিয়া বরাবর উত্তরে অগ্রসর হইলাম। অল্পদূর যাইয়াই দেখি একটি প্রাচীন মিশরীয় রীতির পল্লী। আমাদের পথ-প্রদর্শক বলিলেন "এই গ্রামের নাম বিশেরিন। লোকেরা মুসলমান।

কিন্তু প্রাচীন ফ্যারাওদিগের ইহারা বংশধর বলিয়া খ্যাত। অবশ্য ইহারা তাহা জানে না। এই জাতির লোকসংখ্যা এক্ষণে অতি অল্প। এইরূপ দুই একটি পল্লীতে ব্যতীত আর কোথায়ও ইহাদিগকে দেখা যায় না।"

কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা আমাদের গাড়ীর নিকট আসিল। দেখিলাম ইহারা অধিকাংশই শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মুখশ্রী মন্দ নয়। প্রশস্ত ললাট, হ্রস্ব ওষ্ঠপ্রান্ত, উজ্জ্বল চক্ষু, সঙ্কীর্ণ চিবুক—সমগ্র বদনমণ্ডল লম্বাকৃতি, গোলাকার নয়। নাসিকা সুন্দর—চক্ষুর ভ্রূযুগল পৃথক সন্নিবিষ্ট। মস্তকের আকৃতিও সুগঠন। নিগ্রো বা সাঁওতাল বা বর্ব্বর- জাতীয় লোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে ইহাদের অবয়বের কোন সাদৃশ্য নাই।

কেশবিন্যাসের বৈচিত্র্য আছে। ইহাদের মাথায় দুই গোছা চুল। প্রথমতঃ মস্তকের উপরিভাগ পাটের মত চুলের নরম দড়িতে পরিপূর্ণ। চুল খুব ঘন—মাথার চামড়া দেখা যায় না। ইহারা কখনও মাথা ধুইয়া ফেলে না এজন্য চুলের রং ধূসর। আর এক গোছা চুল তাহাদের মস্তকের পশ্চাদ্দেশে ঝুলিতেছে। ইহা স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং দুই কানের উপরেও আবরণস্বরূপ লম্বমান।

এই জাতীয় লোক দেখিয়া প্রাচীন মিশরীয় ফ্যারাও এবং মিশরবাসী জনসাধারণের আকৃতি বুঝিতে পারা যায় কি না জানি না। মন্দিরগাত্রে এবং কবরাদির চিত্রে যে-সমুদয় মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে ইচ্ছা করিলে এই জাতীয় লোকের মুখমণ্ডল ও কেশবিন্যাসাদি তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু নৃ-তত্ত্ব বড় সহজ নয়। আকৃতি দেখিয়া জাতি নির্ণয় করা এখনও সুসাধ্য নয়। বিশেষতঃ প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও চিত্রে অঙ্কিত নরনারীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের আধুনিক বংশধরগণের সন্ধান পাওয়া আরও কঠিন।

ফ্যারাওগণের বংশধর।

India Press. Calcutta.

বিশেরিন পল্লী
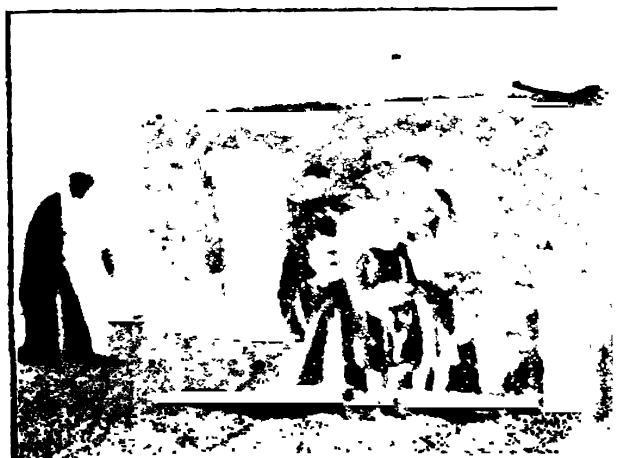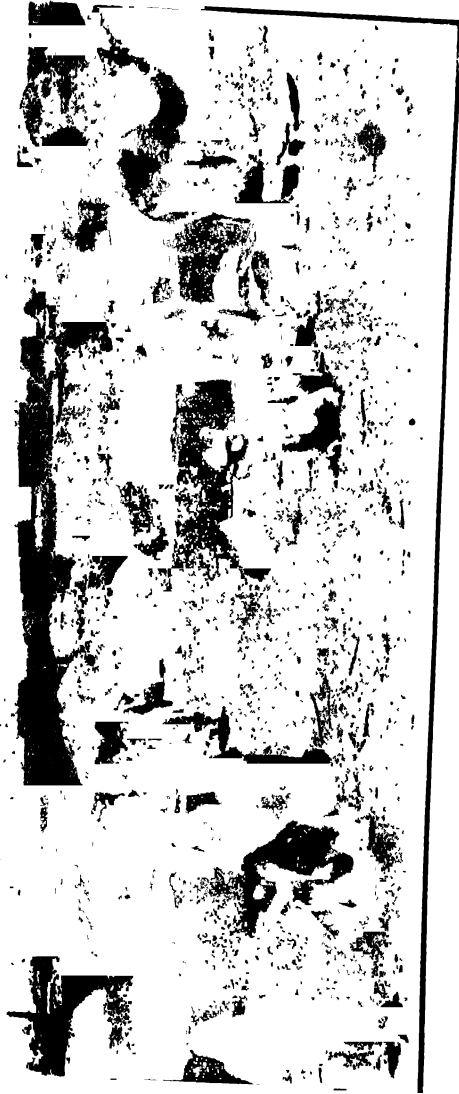
NDIA PRESS, CALCUTTA.

মিশরীয় শিল্পীরা যে তাঁহাদের কারুকার্য্যে স্বজাতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আকৃতির সৌষ্ঠবই প্রধানত অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের প্রত্যেক মূর্ত্তিতে এবং চিত্রে মিশরবাসীর একই রূপ-কল্পনা দেখিতে পাই। মিশরবাসীর পোষাক-পরিচ্ছদ ও নাক, কান, চক্ষু, মস্তক, কেশ, মুখের আয়তন ও বিস্তৃতি সবই এক ছাঁচে তৈয়ারী বোধ হয়। কিন্তু শিল্পীরা যখন পারস্য, হোয়াইট, সীরিয়, লীবিয় ইত্যাদি অন্যান্য শত্রু-জাতিসমূহের চিত্র আঁকিয়াছেন তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বেশে সজ্জিত দেখাইয়াছেন, তাহাদের স্বতন্ত্র গঠনাকৃতি এবং মুখের ও মস্তকের ভিন্নপ্রকার পরিমাণ বুঝাইয়াছেন। ইহার দ্বারা মিশরবাসীরা যে পার্শ্ববর্ত্তী নরসমাজ হইতে শারীরিক গঠনে স্বতন্ত্র ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু আধুনিক বিশেরীন গ্রামের আকৃতি-সৌষ্ঠবযুক্ত বিচিত্র কেশবিন্যাসশীল কৃষ্ণাভ নরসমাজ প্রাচীন মিশরবাসীর বংশধর কি না তাহা বিচার করা একপ্রকার অসম্ভব।

বিশেরীন পল্লী ত্যাগ করিয়া আরও উত্তরে অগ্রসর হইলাম। স্বুবর্ণ মরুপথেই চলিতেছি। পূর্ব্বে গ্রানাইট পাহাড়, পশ্চিমে খেজুরবনের ভিতর আসোয়ান-নগর, দূরে নাইলের অপরকূলস্থ স্বুবর্ণরঞ্জিত বালুকা-ময় শৃঙ্গ। খানিক পরে মর্ম্মরপর্ব্বতে পৌঁছিলাম। এই গ্রানাইটের জন্মনিকেতন, ইহাই একমাত্র মর্ম্মরশৃঙ্গ।

মর্ম্মরশিলার উর্দ্ধদেশে উঠিলাম। দেখিলাম যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল স্বর্ণরেণুসদৃশ বালুকারাশি এবং স্বুবর্ণ স্তূপের আভা উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণের প্রভাবে চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে। "স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি রেখো হৃদে এ ধ্রুবজ্ঞান।" মিশরের এই অঞ্চলবাসী জনগণ বঙ্গকবিতার এই পদ যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। শোণ ও ফল্গুনদীর বালুকা-রাশি দেখিয়া ভারতবাসী এই স্বুবর্ণভূমির কথঞ্চিৎ আভাস পাইবেন।

গ্রীক্ পর্য্যটকেরা বিহারের "হিরণ্যবাহু" নদীর নাম বালুকার বর্ণ দেখিয়াই দিয়াছিলেন। হুয়েন্থসাঙের ভারতবিচরণেও এই স্বর্ণ নদীর সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ২০।৩০ মাইল বিস্তৃত আবেষ্টনের সর্ব্বত্র ঊর্দ্ধে ও নিম্নে, স্বর্ণরেণুর স্তর এই প্রথম দেখিলাম।

মর্ম্মরশৈলের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া সমস্ত নাইল উপত্যকার দৃশ্য দেখিয়া লইলাম। লুক্‌সর ও কার্ণাক পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে ভাবিয়াছিলাম—মিশরের একস্থান দেখিলেই সকলস্থান দেখা হইল—মিশরের প্রাকৃতিক দৃশ্য সর্ব্বত্রই একরূপ। আজ মর্ম্মরশৃঙ্গ হইতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতেছি—মিশরের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে, নিউবিয়ার উত্তরাঞ্চলে, আসোয়ানের এই পার্ব্বত্য মরুপ্রান্তরে সে কথা খাটে না। এখানে অভিনব জগৎ, নূতন দৃশ্য, নূতন ক্ষেত্র, নূতন দিঙ্‌মণ্ডল, নূতন সৌন্দর্য্যের আকর। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে সর্ব্বত্রই পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহ দাঁড়াইয়া ভিতরকার উপত্যকার উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। এই আবেষ্টনের মধ্যে বাহিরের কোন শক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল উত্তর হইতে বায়ুর প্রবল নিঃশ্বাস এবং ঊর্দ্ধ হইতে অগ্নিময় রৌদ্রতাপ এই উপত্যকার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

মর্ম্মরশৈলের পশ্চাদ্‌ভাগেই উচ্চতর গ্রানাইট পর্ব্বত উত্তরে দক্ষিণে লম্বমান। সম্মুখে পশ্চিম দিক্। পাদদেশে স্বর্ণরঞ্জিত মরুপ্রান্তর—প্রান্তরের উপর কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক নাইল-মৃত্তিকার ইষ্টক-নির্ম্মিত চতুষ্কোণ কুটীরের পল্লী উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই স্বর্ণাভ মরুক্ষেত্রের উপর কৃষ্ণ 'গালাবিয়া'-পরিহিত কৃষকগণ চলাফেরা করিতেছে। তাহার পর একসারি খেজুর বৃক্ষ নদীর কিনারায় শীতল ছায়া বিতরণ করিতেছে। সেই ছায়া উপভোগ করিবার জন্য কোন পাখী, জন্তু বা নরনারী দেখিতেছি না। দক্ষিণ দিকে খেজুর-কুঞ্জের ভিতর আসোয়ান

বিশেরিন পল্লীর অধিবাসী

নগরের অট্টালিকাসমূহ। উত্তরে বৃক্ষশ্রেণীর নিম্নদেশেই স্ফটিক রেখার ন্যায় ক্ষুদ্রকায় নাইলনদ বিরাজিত। এই কাচসদৃশ বক্রগতি সূক্ষ্মসূত্রের পশ্চিমকূলেই সুবর্ণবালুকাময় উচ্চ গিরিশৃঙ্গ।

বাঙ্গালী কবি মিবার সম্বন্ধে গাহিয়াছেন "এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।" আসোয়ানের পাহাড় ধূম্র নয়—কিন্তু এই পর্ব্বতবেষ্টিত মরুময় উপত্যকায় মিবার, জসলমীর, এবং রাজপুতনার অন্যান্য স্থানের দৃশ্যই চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। উদয়পুরের কৃষ্ণপাহাড়, ও উদ্যান হ্রদ এবং সরোবর, অম্বরের পার্ব্বত্য মরু, এবং জয়পুরের মরুপ্রান্তর এই সমুদয়ের প্রাকৃতিক শোভা আসোয়ান উপত্যকার দৃশ্য হইতে অনেক স্বতন্ত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মিশরদেশের এই অঞ্চলের সদৃশ ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কথা ভাবিতে হইলে দিল্লী, আগ্রা ও গোয়ালিয়রের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী জলহীন তরুহীন রৌদ্রতপ্ত রাজস্থান এবং সিন্ধুদেশের নামই করিতে হইবে। আসোয়ানের জলবায়ু নদী পর্ব্বত উদ্যান প্রান্তর ক্ষুদ্রভাবে ভারতের এই বিস্তীর্ণ মরুদেশের জনপদগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়।

নবম দিবস—নাইলের বাঁধ

মিশর প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহারা মরুভূমির এক অংশ। এখানে বিন্দু-মাত্র বৃষ্টি পড়ে না বলিলেই চলে। তাহার উপর দেশের সর্ব্বত্র মরু-ভূমির বালুকা অথবা শুষ্ক পর্ব্বতের প্রস্তররাশি। অথচ এই অঞ্চলেই জগতের একটি সর্ব্বপ্রধান উর্ব্বর ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার এক-মাত্র কারণ নাইলের জল ও নাইলের মাটি।

নাইলের প্রভাবেই উত্তর-মিশর ও দক্ষিণ-মিশর ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা হইয়াছে। নাইলই মিশরের জন্মদাতা, মিশরের মৃত্তিকা নাইল নদেরই দান। পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় মিশরই একমাত্র নদী-মাতৃক দেশ।

কিন্তু মিশরের নাইল দেখিয়া নিউবিয়ার নাইল এবং নাইলের আরও দক্ষিণাংশ বুঝা যায় না। মিশরে নাইলের দুইধারে পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কৃষিক্ষেত্র আছে। এই কৃষিক্ষেত্র কোথাও ৫ মাইল, কোথাও ১৫ মাইল বিস্তৃত। এই ভূমিখণ্ডের উপর চাষ আবাদ হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই অংশটুকুই মিশরদেশ। এই অংশেই নাইলের বন্যাজল হইতে মাটি পড়িয়া মিশরীয় কৃষকের শস্যসম্পদ সৃষ্টি করে। কিন্তু আসোয়ানে আসিয়া দেখিতেছি নদীর কূলস্থিত কৃষিভূমি নিতান্তই অল্প—এমন কি একেবারেই নাই। নদী পর্ব্বতদ্বয়ের চরণতল ধৌত করিয়া প্রবাহিত। পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে যতটুকু মাঠ দেখা যায় তাহা মরুভূমি মাত্র। আসোয়ান মিশরের দক্ষিণসীমা। ইহার পরেই নিউবিয়া। এই নিউবিয়ার নাইল আসোয়ানের নাইল অপেক্ষা আরও

সঙ্কীর্ণ, আরও পর্ব্বতবেষ্টিত। নদীর দুই কূলেই পাহাড়। পাহাড় ব্যতীত একইঞ্চি স্থানও নিউবিয়া দেশে নদীর ধারে নাই। অথচ এদেশে বৃষ্টিও হয় না—অন্য কোন নদীও নাই। কাজেই নিউবিয়ায় ও মিশরে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। নিউবিয়া লোকাবাসের যোগ্য নয়—মিশর স্বর্গভূমি।

হিমালয় পর্ব্বত ভারতবর্ষের জন্য সকল মেঘ, সকল নদী, সকল জলধারা সঞ্চিত রাখিয়াছেন। তাহার ফলে তিব্বত জলহীন, নদীহীন, বৃষ্টিহীন। হিমালয়ের দক্ষিণাংশে উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র—উত্তরাংশে শুষ্ক বরফযুক্ত পর্ব্বতপ্রান্তর। নাইলনদের দক্ষিণে ও নিউবিয়াভাগে ভূমির অভাব, কৃষির অভাব, খাদ্যের অভাব, অথচ উত্তর ভাগের ভূমি এত ঐশ্বর্য্যযুক্ত যে এরূপ জনপদ ভূমণ্ডলে বিরল।

আমরা নিউবিয়ার পার্ব্বত্যদেশ এবং নাইল-ধারা দেখিতে গেলাম। আসোয়ান হইতে কিছু দক্ষিণে একটা রেলপথ বিস্তৃত। ২০।২৫ মাইল পরে ষ্টেসন। গ্রানাইটপ্রস্তর ও গ্রানাইট ধূলিরাশির ভিতর দিয়া গাড়ী চলিল। অল্পক্ষণের ভিতর যথাস্থানে পৌঁছলাম। নাইলের কূলে ষ্টেসন।

দেখিলাম প্রকৃতি নাইলকে এখানে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। যেন একটা মেজে-বাঁধান পর্ব্বত—প্রাচীরযুক্ত চৌবাচ্চার ভিতর নাইল প্রবাহিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে বড় বড় শিলাখণ্ড ও উচ্চ গিরিশৃঙ্গ। একটিও ধূলিকণা কোথাও দেখা যায় না।

আমরা নৌকায় চড়িয়া এই কূপ বা হ্রদের উপর চলিতে লাগিলাম। মধ্যস্থলে একটা দ্বীপ দেখা গেল। উহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফাইলি দ্বীপ। গ্রীক ও রোমান আমলে এই স্থানে প্রাচীন মিশরীয় রীতিতে মন্দির, প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। টলেমির যুগের মন্দিরাদি

এখনও দৃষ্ট হয়। দ্বীপ ক্ষুদ্র—এক্ষণে অর্দ্ধভাগ জলমগ্ন—মন্দির ও অট্টালিকাসমূহের উপরিভাগ মাত্র বাহির হইয়া আছে। এই মন্দিরে প্রাচীন আইসিস দেবীর বিগ্রহ আছে শুনিলাম।

দ্বীপ এবং অট্টালিকাগুলি জলমগ্ন হইবার কারণ জানিতে ইচ্ছা হইল প্রদর্শক বলিলেন, "দূরে যে নাইলের উপর "ড্যাম" বা প্রস্তরপ্রাচীর দেখিতে পাইতেছেন উহাই ইহার কারণ। এই ড্যামের সাহায্যে নাইলের জল নিউবিয়াতে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। মিশরে অল্পমাত্র জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত নাইলকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে—তখন ড্যাম খোলা থাকে। সেই সময়ে নিউবিয়ার জল সহজে মিশরে প্রবেশ করে। তখন ফাইলি দ্বীপ এবং আইসিস মন্দির হইতে জল সরিয়া যায়। নাইল নিউবিয়ায় এবং মিশরে এক-সমতল ভূমিতে অবস্থিত। এক্ষণে ড্যাম অবরুদ্ধ। দুই একটি ফটক মাত্র খোলা। এজন্য বেশী জল মিশরে যাইতে পায় না। ফলতঃ নিউবিয়ার দিকে নাইলের জল জমিয়া রহিয়াছে। এখানে নদী খুব গভীর—প্রায় ৫০ ফুট। এই কারণে দ্বীপ ও অট্টালিকাসমূহ জলমগ্ন; কিন্তু মন্দিরাদির কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ সমস্ত দ্বীপ-টাকে অতিশয় শক্তভাবে বাঁধা হইয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত নাইলকে মিশরবাসীরা স্বাধীনভাবে প্রবাহিত হইতে দেন কি জন্য? বৎসরের অন্য সাতমাস ইহাকে আবদ্ধ রাখিয়া লাভ কি?"

প্রদর্শক বলিলেন, "ঐ পাঁচ মাস নাইলের বর্ষাকাল—মিশরে জল-প্লাবনের সময় আমাদের জীবনধারণের উপায়। অবশ্য মিশরে বৃষ্টি বিন্দুমাত্রও হয় না। সুদূর দক্ষিণে নিউবিয়া ও সুডানেরও দক্ষিণে আবিসিনিয়াদেশ অবস্থিত। ভারতমহাসাগরের মেঘ আসিয়া আবি-

নাইলের পার্ব্বত্যখাত — সায়ান
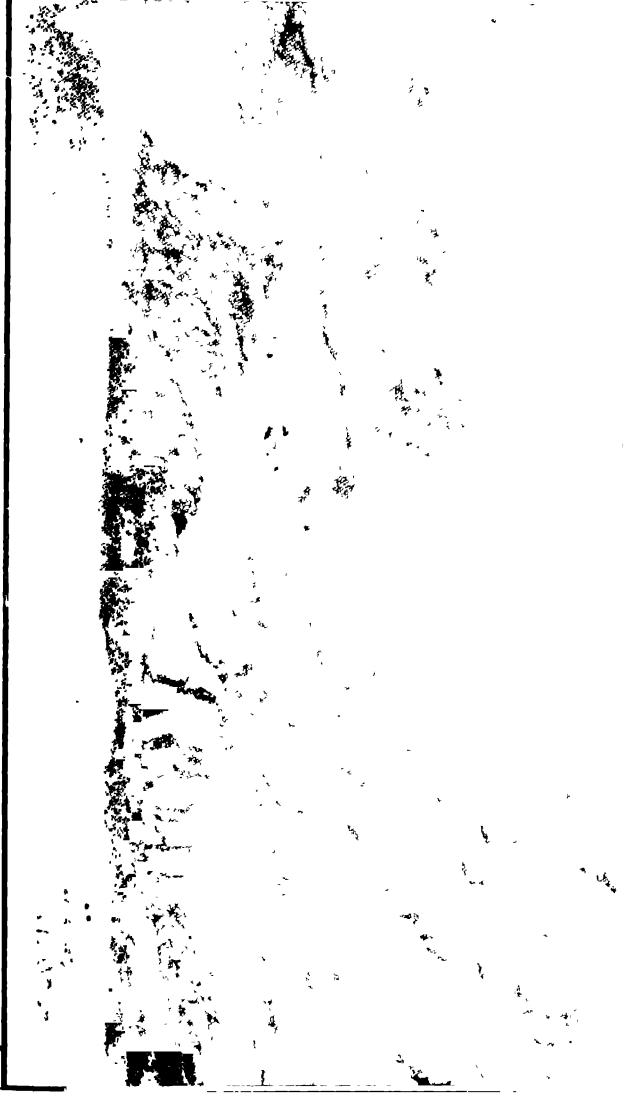
সিনিয়ার পর্ব্বতশৃঙ্গে ঠেকে। তাহার ফলে জুন মাস হইতে আবিসিনিয়ায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেইখানেই আবার আমাদের নাইলনদের নীলশাখার উৎপত্তি। কাজেই আবিসিনিয়ায় যে বর্ষা হয় তাহার সুফল মিশর-বাসীও ভোগ করে। কিন্তু বর্ষার প্রভাব আমাদের অঞ্চলে পৌঁছিতে অনেক দিন লাগে। আগষ্ট মাস হইতে আসোয়ানের "ড্যামে" বর্ষা দেখিতে পাই। এই বর্ষার প্রবল জলধারা বন্দী করিয়া রাখিবার ক্ষমতা মানুষের আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং বর্ষাকালে নাইলকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করা হয়। পরে যথাসময়ে ইহার জল ধরিয়া রাখিবার জন্য ড্যাম বন্ধ করা হইয়া থাকে। আজকাল ড্যাম বন্ধ। এজন্য নিউবিয়া-ভাগে নাইলের জল বেশী।"

নৌকা হইতে আইসিস মন্দির ও ফাইলিদ্বীপ দেখিয়া ড্যামের পূর্ব্ব-প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। ড্যামের উপর হইতে দক্ষিণে নিউবিয়া এবং উত্তরে মিশরের অবস্থা বুঝিয়া লইলাম। দেখা গেল নিউবিয়ার নাইল একটা প্রকাণ্ড স্থির সরোবরের মত শুইয়া আছে—চারিদিকে কৃষ্ণ বা ঈষৎরক্ত গ্রানাইট প্রস্তরের পর্ব্বত। মিশরের নাইল শুষ্কপ্রায়—নদীবক্ষ অসংখ্য শিলাখণ্ডে ও গিরিশৃঙ্গে পরিপূর্ণ। পশ্চিম প্রান্ত হইতে প্রবল-বেগে তুষারধবল জলরাশি বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিয়াছে। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই পাহাড়। ড্যামের পূর্ব্ব-প্রান্তে মিশরের ভাগে একটা সুবিস্তৃত উদ্যান। ইহার সবুজ রঙের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ উপর হইতে মকমলের গালিচার বিভিন্ন অংশের মত দেখাইতেছে। পশ্চিম প্রান্তে 'ড্যাম'-কারখানার কার্য্যালয়।

ভারতবর্ষের নদীজল ধরিয়া রাখিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে অনেক ড্যাম, য়্যানিকাট দেখিয়াছি। কটকের মহানদীর য়্যানিকাট প্রসিদ্ধ। কিন্তু নাইলের এই আসোয়ান-"বারাজে"র (Barrage) তুলনায় উহা

খেলানার সামগ্রী মাত্র। ১৮৯৮-১৯০২ সালের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে নীল নাইলের প্লাবন বন্ধ হইয়া যায়। তখন সমস্ত নাইলই শুষ্কপ্রায় হইয়া পড়ে। অথচ বর্ষাকালে নাইলের জল অপর্য্যাপ্ত। জলের সঙ্গে যে মাটি ধুইয়া আসে তাহাও প্রচুর। এই নূতন পলি মিশরের কূলে কূলে সতেজ মৃত্তিকা ও কৃষিভূমির গঠনে যৎপরোনাস্তি সাহায্য করে। কিন্তু বর্ষাঋতু ত চিরকাল থাকে না। তখন মিশরে জলকষ্ট ও মাটি-কষ্ট, সুতরাং কৃষি-কষ্ট আরম্ভ হয়। এজন্য বর্ষাকালের সমস্ত জল প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে নিউবিয়ার এই 'হ্রদে' জল আটকাইয়া রাখিবার কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে এই জল নিয়মিতরূপে কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজনানুসারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সুতরাং বর্ষা চলিয়া গেলেও বর্ষার উপকারিতা মিশরদেশে সর্ব্বদাই থাকে। বারমাস ধরিয়া কৃষকেরা নদীর জল পায়—সহজেই কৃষিকর্ম্ম সুচারুরূপে চলে।

এই ড্যাম জগতের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ জলরক্ষক। প্রায় ১১/৪ মাইল ইহার দৈর্ঘ্য—উচ্চতা ১৫০ ফুট। ড্যাম নিম্ন দেশে প্রায় ১০০ ফুট বিস্তৃত এবং শিরোদেশে প্রায় ৪০ ফুট বিস্তৃত। আগাগোড়া গ্রানাইট পাথরে তৈয়ারী। অতএব বলা যাইতে পারে একটা প্রকাণ্ড গ্রানাইট পর্ব্বত আনিয়া নাইলের উপর ফেলা হইয়াছে। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধে হনুমানের যে ইঞ্জিনীয়ারী দেখান হইয়াছে মানব-সাহিত্যে সে অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য এবং অসমসাহসিক কার্য্যের আর পরিচয় নাই। বাস্তব-জগতের এই বিরাট নদ-বন্ধনের কৌশল দেখিয়া আদিকবি বাল্মীকির কল্পনাশক্তির ধারণা করা গেল।

এই পর্ব্বতাকার নাইল-বন্ধনীর তলদেশে ১৮০ টি বৃহৎ ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলির কোন কোনটা যথাসময়ে খুলিয়া দেওয়া হয়। বর্ষাকালে
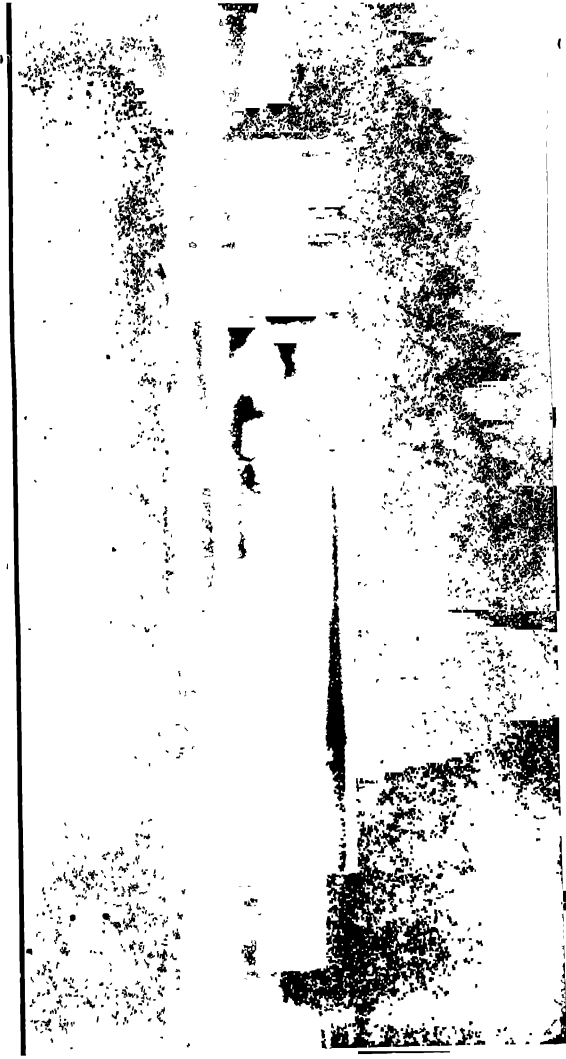
ফাইলি দ্বীপে আইসিস-মন্দির। নাইল নদে বাঁধ দেওয়াতে অনেক স্থলের মরুভূমি বা ডাঙা জমি জলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে তাহাতে অনেক মন্দিরস্থান দ্বীপের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক মন্দির বা গৃহ একেবারে জলের তলে ডুবিয়া গিয়াছে।

সবই খোলা থাকে। এই ছিদ্রের সঙ্গে গড়ান জলপ্রবাহের পথ সংযুক্ত আছে। জলরাশি নিউবিয়ার উচ্চতর হ্রদ হইতে মিশরের নদীখাতে পড়িবার সময় এই জলপথগুলির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। আজ দেখিলাম দুইটি জলপথের ছিদ্রগুলি খোলা। একটি মধ্যবর্ত্তী অপরটি পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী। এই দুই জলপথের উপর দিয়া জলরাশি গর্জ্জন করিতে করিতে মিশরে নামিতেছে। শুভ্র তূলারাশি-সদৃশ শ্বেত ফেনসমূহ বহুদূরে যাইয়া জলরূপে পরিণত হইতেছে। বর্ষাকালে দার্জ্জিলিঙ্গের হিমালয়ে যাঁহারা পাগলা ঝোরার উন্মাদ নৃত্য দেখিয়াছেন এবং শুভ্র ফেনরাশির উত্তাল গতিভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা নাই-লের এই গর্জ্জন ও লম্ফন বুঝিতে পারিবেন।

তাণ্ডবলীলা করিতে করিতে জলরাশি আসিয়া যেখানে পর্ব্বতশিলায় আছড়াইয়া পড়িতেছে সেখানে বাষ্পসদৃশ সূক্ষ্ম জলকণায় শীকর সৃষ্ট হইতেছে। সেই জলবিন্দুর ভিতর প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্যকিরণ রামধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্য উৎপাদন করিতেছে। এইরূপ জল-বিন্দুর ভিতর রামধনু সমুদ্র-তরঙ্গোত্থিত শীকরমালায়ও দেখিয়াছি।

ড্যামের উপর দিয়া পশ্চিমপ্রান্তে পৌঁছিলাম। সেখানে দূর হইতে কারখানা দেখা গেল। পরে নদীর একটা ক্ষুদ্র খালের উপর নৌকায় চড়িয়া উত্তরাভিমুখে চলিলাম। খানিকদূর যাইয়া আর একটা জলবন্ধনী পাওয়া গেল। এই জলবন্ধনীর দুইটা ফটক, ফটকদ্বয়ের ভিতর একটা খাল। সুতরাং নিউবিয়ার হ্রদের পর মিশরেও একটা হ্রদ। আমাদের নৌকা মিশরের এই হ্রদ পার হইয়া নদীতে পড়িল। খালের ভিতর দিয়া হ্রদ পার হইবার সময়ে দেখিলাম—আমরা উচ্চতর জলস্থান হইতে নিম্ন-তর জলভাগে যাইতেছি। দুই সমতলে প্রায় ১৫ ফুট ব্যবধান; উচ্চ হইতে নিম্নে আমাদের নৌকা নামিল। অবশ্য উচ্চস্থান হইতে লাফাইয়া

পড়িল না। যাহাতে নৌকা হ্রদ হইতে সহজেই খালের ভিতর দিয়া নদীতে যাইতে পারে তাহার জন্যই দুইটা ফটক সৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম ফটক খুলিবামাত্র হ্রদের জল প্রথম খালে ঢুকিল—তাহার ফলে দুই জলভাগ এক সমতল হইয়া গেল। আমাদের নৌকা নির্ব্বিঘ্নে খালে ঢুকিল। খালে ঢুকিবামাত্র পশ্চাদ্বর্ত্তী ফটক বন্ধ করা হইল। এক্ষণে আমরা নদী হইতে বহু-উচ্চে রহিয়াছি। কাজেই দ্বিতীয় ফটক খুলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে খালের জল কমান হইল। যখন প্রায় দুই মানুষের সমান গভীর জল বাহির হইয়া গেল তখন নদীর সঙ্গে খাল একসমতল হইল। এক্ষণে ফটক পুরাপুরি খোলা হইল আমরা নদীতে নামিলাম।

এতক্ষণ মানুষের তৈয়ারী বাঁধাবাঁধি, জলবন্ধনী, ব্যারজ, খাল, হ্রদ, ড্যাম ইত্যাদির ভিতর ছিলাম। মিশরের নাইলে পড়িয়াও দেখিতেছি আবার হ্রদ, পর্ব্বত ও বেষ্টনী। এ হ্রদ মানুষের প্রস্তুত নয়। মিশরের প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই এরূপ গঠিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকেই পাহাড় দেখিতে পাই। যে দিকেই তাকাই কেবল পর্ব্বতশৃঙ্গ—আমরা যেন পুষ্করিণীতে ভাসিতেছি। নদী এতই বক্রগতি যে প্রায় ১০০০ গজ পরিধির মধ্যে যতদূর দেখা যায় নদীপ্রবাহ দেখিতে পাই না—কেবল সরোবর মাত্র চক্ষুগোচর হয়।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদসদৃশ, সরোবরসদৃশ নাইল বাহিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে আসোয়ানে পৌঁছিলাম। এই দিকে যে সকল শিলাখণ্ড দেখা গেল সবই কৃষ্ণবর্ণ গ্রানাইট প্রস্তর। পূর্ব্বে রক্ত-পীত গ্রানাইট দেখা গিয়াছে। কিন্তু সেই বৃহৎ জলবন্ধনী হইতে আমাদের আবাস পর্য্যন্ত নদীর ধারে এবং নদীর ভিতর যে-সকল পর্ব্বতগাত্র, পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং উপলখণ্ড দেখিলাম সবই মসৃণ কৃষ্ণ গ্রানাইট।

নিউবিয়ান মাঝিদিগের গীত শুনিতে শুনিতে নাইলবক্ষে প্রায় ১৩।১৪ মাইল ভ্রমণ করা হইল। সন্ধ্যাকালে আফ্রিকার লীবিয় পর্ব্বতের পশ্চাভাগে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। সাহারা মরুভূমিতে সূর্য্যাস্তগমনের উজ্জ্বল রক্তবর্ণ আমাদের পশ্চিমাকাশকে এক অনির্ব্বচনীয় গরিমায় রঞ্জিত করিল। বহুক্ষণ ধরিয়া সূর্য্যাস্তগমনের চিত্র গগনমণ্ডলে লক্ষ্য করিলাম। পরে ধীরে ধীরে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। যখন হোটেলে ফিরিলাম, তখন অমাবস্যার ঘোর নিশায় নদী পর্ব্বত আচ্ছন্ন হইয়াছে।

দশম দিবস—বিচারব্যবস্থা

আসোয়ান হইতে কাইরোতে ফিরিয়া আসিলাম। রেলে প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগিল। দিবাভাগে লুক্সার পর্য্যন্ত গাড়ী আসে। এই পথে কৃষিক্ষেত্র বিরল—চারিদিকে পাহাড় পর্ব্বত ও মরুভূমি। কাজেই ধূলা ও বালুকার রাজ্য। তাহার উপর গ্রীষ্মকালের গরম। বাঙ্গালীর গরম সহ্য করা অভ্যাস। তথাপি এই অঞ্চলের তাপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

লুক্সারে সন্ধ্যা হইল। তখন হইতে শস্যশ্যামল ক্ষেত্রসমূহ আমাদের দুই ধারে দেখা দিল। এ অঞ্চলে বিহার ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশের ন্যায় শক্ত কৃষ্ণমৃত্তিকা আমাদের চারিদিকে চাষের জমিতে রহিয়াছে দেখিলাম। কাজেই বালুকার হাত এড়াইয়াছি। এদিকে পশ্চিম-আকাশকে গোলাপীরঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া মিশর-তপন সীরিয়া পর্ব্বতের অপর পারে অস্ত যাইতেছে। মনে হইল সাহারায় আগুন লাগিয়াছে। পর্ব্বতমালার শিরোদেশ রক্তিমবর্ণে সুরঞ্জিত—পশ্চিমগগনের অর্দ্ধভাগ যেন অগ্নিশিখায় আলোকিত—অথচ পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগ এবং মিশরের উপত্যকা ঘোরতর অন্ধকারে নিমগ্ন। আকাশে দুইএকটি তারা মাত্র বিরাজ করিতেছে—এবং মিশরের পশ্চিম-আকাশে প্রতিপদ বা দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা দেখা যাইতেছে। এই আবেষ্টনের মধ্যে গাড়ী দার্জ্জিলিঙ্গ মেলের বেগে চলিতে লাগিল।

রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রকোপ বাড়িয়া চলিল। বাঙ্গালা-দেশে মাঘমাসেও এত শীত পড়ে না। দিনে যেরূপ গরম, রাত্রে তেমনই

শীত। ইহাই মরুস্থলীর প্রকৃতি। অবশ্য মিশরীয়েরাও বলাবলি করিতে লাগিল—গ্রীষ্মকালে এত শীত মিশরে সাধারণতঃ দেখা যায় না। আমরা সৌভাগ্যক্রমে লোহিতসাগর হইতেই ঠাণ্ডা পাইতে পাইতে আসিয়াছি।

মিশরের দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত যে কয়টা পল্লী ও নগর দেখিলাম সর্ব্বত্রই পাশ্চাত্যের প্রভাব ও আধিপত্য লক্ষ্য করিয়াছি। "নিজবাসভূমে পরবাসী"—এ কথা আধুনিক মিশরে যতটা খাটে দেখিতেছি, যথার্থ পরাধীন দেশেও ততটা খাটে কি না সন্দেহ। গ্রীক, ইতালীয়, জার্ম্মাণ ও ফরাসী দোকানদার, বণিক, হোটেলস্বামী এবং অধ্যাপকগণ মিশরের গলিতে গলিতে প্রবিষ্ট। স্বদেশী বাজারে হাটে যাইয়া দেখি মিশরের খাঁটি স্বদেশীদ্রব্য কোথাও পাওয়া যায় না—সবই বিদেশী মাল। কাফির দোকানে শত শত মিশরীয় যুবক ও প্রবীণব্যক্তি মদ মাংস তামাক চা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত। ইহারা ফরাসী, জার্ম্মাণ, গ্রীক, ইংরাজী ইত্যাদি নানা বিদেশীয় ভাষায় কথা বলিতেছে,—অথচ পেটে বিদ্যা কিছুই নাই—কেবল কথা বলিতেই শিখিয়াছে। নিজ মাতৃভাষার এত অনাদর আর কোনও সমাজ করে কি না জানি না। কিছু-কাল পূর্ব্বে ভারতবাসীও স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যকে অশ্রদ্ধা করিতেন। সুখের কথা, ভারতবাসীর নিদ্রা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু মিশর-বাসীর এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। মিশর দেখিয়া অশ্রু ফেলিলাম। মিশরবাসীর জাতীয় চরিত্রে মেরুদণ্ড দেখিতে পাইলাম না। আধুনিক মিশর বিলাসসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে—ভবিষ্যতের জাতীয় স্বার্থ ইহা-দিগকে কে বুঝাইয়া দিবে?

কাইরোতে ফিরিয়া আসিলাম। নগরের ভিতর টার্কিশ স্নানাগারে যাইয়া স্নান করা গেল। ব্যাপার কি বুঝিবার উদ্দেশ্য ছিল।

দেখিলাম—স্নানের বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নয়। গৃহগুলি বাষ্পপূর্ণ থাকে। তাহার ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র খুব ঘাম হয়। তাহার উপর গরম জলের চৌবাচ্চায় বসিতে হয়। ফলতঃ শরীরের লোমকূপগুলির মুখ খুলিয়া যায়। তাহাতে সাবান লাগাইয়া ধুঁধুলের ছোবড়া দিয়া ঘসিলে ভিতরকার ময়লা উঠিয়া আসে। আমরা সাধারণতঃ অল্পকালমাত্র স্নানে খরচ করি। এখানে প্রায় একঘণ্টা লাগিল। এতক্ষণ স্নানে কাটাইলে সাধারণ রীতির অবগাহনেও গায়ের ময়লা নষ্ট হয়। স্নানের পর গা কাপড়চোপড়ে ঢাকিয়া খানিকক্ষণ শুইয়া থাকা আবশ্যক। স্নানের ফলে শরীর বেশ হাল্কা বোধ হইতে থাকে।

আজ একজন প্রসিদ্ধ মিশরবাসী মুসলমানের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি পূর্ব্বে মিশর-সরকারে বিচারপতির কর্ম্ম করিয়াছেন—এক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত, পেন্সন ভোগ করিতেছেন। ইহাঁর লেখাপড়ার চর্চ্চা মন্দ নাই। স্বয়ং ফরাসী, ইংরাজী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, এবং আরবি ভাষায় কথাবার্ত্তা এবং লেখাপড়া চালাইতে পারেন। ইনি বৎসরের প্রায় অর্দ্ধাংশ জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, সুইজর্ল্যাণ্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশে কাটাইয়া থাকেন। সুতরাং ঐসকল দেশের অনেক তথ্যই ইহাঁর জানা আছে। তাহা ছাড়া ইনি নবপ্রকাশিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধেও সর্ব্বদা অভিজ্ঞ হইতে সচেষ্ট। ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় যে-সকল নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহার সংবাদ ইনি রাখিয়া থাকেন। ইহাঁর টেবিল, শেল্‌ফ, আলমারি ইত্যাদিতে কতকগুলি বেশ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও পত্রিকা দেখিতে পাইলাম। ঐতিহাসিক আলোচনায়ই ইনি বিশেষ অনুরক্ত।

জগতের সর্ব্বপুরাতন জাতিসমূহের সম্বন্ধে প্রথম কথাবার্ত্তা হইল। মিশর, ব্যাবিলন, আরব, ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশের প্রাচীন

সভ্যতাবিষয়ক গ্রন্থ ইহাঁর নিকট দেখিলাম। কোনটা ফরাসীতে লিখিত, কোনটা জার্ম্মাণে, কোনটা ইংরাজীতে। ইনি আমাদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলিলেন। সুতরাং দোভাষীর সাহায্য আবশ্যক হইল না। ইনি একজন সুইস অধ্যাপক-প্রণীত গ্রন্থের প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিলেন। গ্রন্থ জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত—নামের ইংরাজী অনুবাদ The Importance of Arabia to World's History—Mahammed। লেখক সুইজর্ল্যাণ্ডের ফ্রেবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিউবার্ট গ্রাম। এই গ্রন্থে মিশরের সভ্যতা অপেক্ষা আরবের সভ্যতা প্রাচীনতর এই তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে।

আধুনিক মিশরের আইন ও বিচার-প্রণালী সম্বন্ধে ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি বলিলেন—"এখানকার বিচার-প্রণালী বড় বিচিত্র। ইউরোপের প্রায় সকল জাতিই এই দেশে বাস করে। তাহাদের নিজ নিজ আইন অনুসারেই তাহাদের বিচার হয়। সুতরাং গোটা ইউরোপের জটিলতা আমাদের ক্ষুদ্র মিশরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আমাদের স্বদেশবাসীর কোন বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে সুবিচার পাওয়া বড় কঠিন। প্রথমতঃ আইনটাই যে কি তাহা জানা নাই। তাহার উপর সময় এত বেশী লাগে এবং টাকা খরচ এত অধিক হয় যে "মিশরবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি এই দেশের উকীলদিগকে ইউরোপের সকল দেশীয় আইনই শিখিতে হয়?" ইনি বলিলেন, "যে উকীল বিদেশীয় লোক-ঘটিত মামলা মোকদ্দমায় সাহায্য করিতে চাহেন তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিদেশীয় আইন শিক্ষা করিতে হইবে। মনে করুন, আপনি একজন ভারতবাসী। আপনার সঙ্গে মিশরবাসীর ব্যবসা-ঘটিত, টাকা-পয়সা-সম্পর্কিত অথবা বাড়ীঘর জায়গা জমি সম্বন্ধীয় গোলযোগ

উপস্থিত হইল। ইহার বিচারের জন্য ব্রিটিশ-ভারতের আইনে অভিজ্ঞ বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। আপনার মোকদ্দমায় সাহায্য করিবার জন্য ঐরূপ উকীলও আবশ্যক হইবে। অথচ যদি কোন খুনজখম-ঘটিত মামলা উপস্থিত হয় তাহা হইলে আমাদের সাধারণ স্বদেশীয় বিচারালয়েই বিচার হইবে। আমাদের স্বদেশী বিচার ফরাসী "কোড নেপোলিয়নের" আরবি অনুবাদ অনুসারে হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ নিয়ম অন্যান্য বিদেশীয় লোক সম্বন্ধেও খাটিবে। কাজেই আমাদের দুইপ্রকার বিচারালয়, দুইপ্রকার বিচারক, দুইপ্রকার আইন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেবল দুইপ্রকার বলিলে বোধ হয় ঠিক বুঝান হইল না। কারণ প্রথমপ্রকারের মধ্যে অসংখ্য বিভাগ আছে। পৃথিবীর যত জাতি মিশরে বাস করে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বিচার-প্রণালী আবশ্যক।" ইনি বলিলেন "নিশ্চয়ই। এ জন্য আমাদের বিচারপদ্ধতি বড়ই জটিল, গোলমেলে এবং ব্যয়-সাপেক্ষ। এত দেশের আইনে অভিজ্ঞ হওয়া কি কোন উকীলের পক্ষে সম্ভব? জনসাধারণের এজন্য দুর্দ্দশা ও অর্থব্যয়ের সীমা নাই।"

একাদশ দিবস—পীরামিডের সারি

মিশরের নাম করিবামাত্র পীরামিডের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে হয়। পীরামিড একপ্রকার কবর-বিশেষ। প্রাচীন মিশরের সর্ব্বপ্রথম রাজ-বংশীয়গণ পীরামিড নির্ম্মাণ করিয়া স্বকীয় 'মাম্মি' তাহার ভিতর লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি তাঁহাদের ভৌতিক শরীরের সন্ধান না পায় এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিশেষ যত্ন লইতেন। সুতরাং কবর-নির্ম্মাণ প্রাচীন মিশরের ধর্ম্মজীবনে এবং রাষ্ট্রজীবনে একটা বিশেষ কর্ম্ম ছিল। প্রাচীন মিশরীয় শিল্পের অনুষ্ঠানে কবর-নির্ম্মাণই প্রধান স্থান অধিকার করিত। আমরা ইতিপূর্ব্বে লুক্সারের অপর পারে ভূগর্ভস্থিত রাজকবরসমূহ দেখিয়াছি। বস্তুতঃ হয় পীরামিড, না হয় পর্ব্বতগুহায় কবর মিশরের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর মুসলমানী কালেও মিশরে নানা কবর নির্ম্মিত হইয়াছে। মুসলমানেরা অবশ্য কবর লুকাইয়া রাখিতে ব্যগ্র হইতেন না। তাঁহারা কবরের সঙ্গে মসজিদ, বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা, হাঁসপাতাল ইত্যাদি লোক-হিতবিধায়ক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন। ফলতঃ, মুসলমানী কবরসমূহ জনগণের কর্ম্মকেন্দ্র-ও চিন্তাকেন্দ্র-স্বরূপ হইয়া থাকিত।

মিশরের যে দিকেই তাকাই এই দুই জাতীয় কবরসমূহ দেখিতে পাই। এজন্যই মিশরকে "কবরের দেশ" বলিয়াছি।

আজ পীরামিড দেখিতে গেলাম। ইলেক্ট্রিক্ ট্রামে যাত্রা করা গেল। কাইরোর নিকটেই নাইল পার হইতে হয়। নাইলের উপর

কাইরো নগরে সর্ব্বসমেত ৪।৫টি সেতু আছে। এগুলি প্রায়ই ফরাসী এঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদিগের নির্ম্মিত। ট্রামওয়ে কেম্পানী বেল্‌জিয়াম দেশীয়। ট্রামের প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন-ফলকে দেখিলাম ফরাসী ভাষায় লেখা আছে "গাঁটকাটা আছে, সাবধান!" কাইরো নগরের ভিতর অসংখ্য চোর জুয়াচোর ভদ্রবেশে চলাফেরা করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ঋণগ্রস্ত দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত মিশরীয় ধনী-সন্তান।' আবার অনেকেই গ্রীক, ইতালীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসাদার বা হোটেলরক্ষকগণের লোকজন! মিশরে যাতায়াত করা বড় কঠিন। বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হয়। এই জন্যই দেখিয়াছি রেলওয়ে লাইনে দিবারাত্রি টিকেট ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া আরোহীদিগকে জ্বালাতন করে। যেখানে-সেখানে যখন-তখন পরিদর্শকেরা টিকেট দেখিতে চায়। মিশরীয় জনগণের সাধুতা ও চরিত্র এই নিয়ম হইতেই বেশ বুঝা যায়।

যে দেশে দুনিয়ার ইতর ভদ্র লোক আসিয়া জমিয়াছে সেখানে জাতীয় চরিত্র সহজে বুঝা বড় কঠিন। সেখানে আইন জটিল ত হইবেই। মিশরের জাতীয় উন্নতিসাধন এই কারণে বড় কষ্টসাপেক্ষ। মিশর দুনিয়ার একটা বাজার মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দেশ ইউরোপের যৌথসম্পত্তি-স্বরূপ বা বারোয়ারীতলা। মিশর সম্বন্ধে মিশর-বাসীর হাত কোন কাজেই দেখিতে পাই না। মিশরের ভবিষ্যৎ গঠন করিবার উপায় মিশরবাসীরা স্বচেষ্টায় উদ্ভাবন করিতে সুযোগ পান না। মিশরের এই দুর্দ্দশা জগতের অন্য কোন সমাজকে বোধ হয় কখনও আক্রমণ করে নাই। আধুনিক মিশরের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি।

নদীর অপর পারে ট্রামে যাইতে যাইতে কলিকাতার খিদিরপুর ও বেহালার রাস্তা মনে পড়িল। একদিকে প্রকাণ্ড প্রান্তর নানা শস্যপূর্ণ।
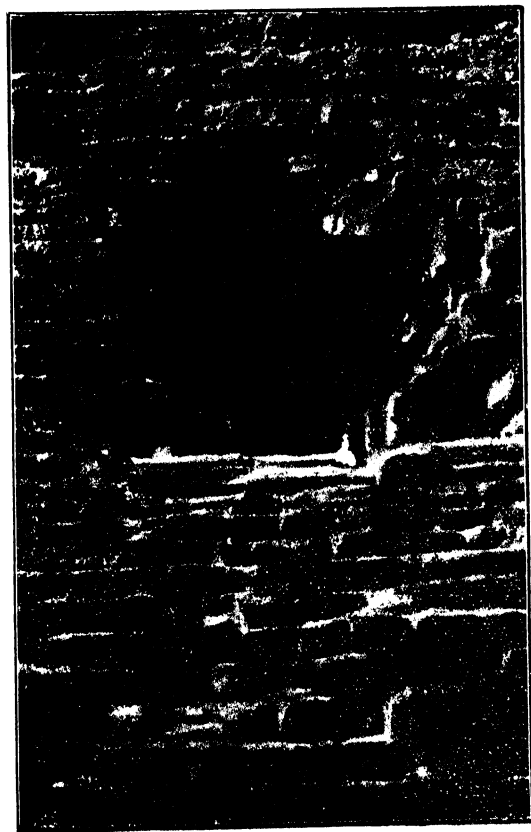
পীরামিডের গাত্রস্থিত প্রবেশদ্বার

কোন স্থানে গোলাপের বাগান, কোথাও আমের ক্ষেত। অপর দিকে নদী ও প্রাসাদসমূহ। বড় বড় কয়েকটা প্রাচীন উদ্যানও দেখিতে পাইলাম। মিশরের জমিদারদিগের কতকগুলি নব্যফ্যাশানের অট্টালিকা পথে পড়িল। এতদ্ব্যতীত আধুনিক নিয়মে "জুলজিক্যালগার্ডেন" বা চিড়িয়াখানাও দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বে ইহা ইস্মাইল পাশার ভবন ও উদ্যান ছিল। কোটী কোটী টাকায় এইসকল হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে।

পরে রেলপথের উপর দিয়া আমাদের ট্রাম চলিল। দূর হইতে দোলপূজার জন্য নির্ম্মিত মৃত্তিকা-স্তূপের ন্যায় বিশাল ত্রিভুজাকার প্রস্তরস্তূপ দেখিতে পাইলাম। এই স্তূপই পীরামিড।

ট্রাম হইতে নামিয়া গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করা গেল। উত্তর দিক হইতে একটা অনুচ্চ পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। খানিকটা উঠিতেই পীরামিডের এক প্রাচীরগাত্র চক্ষুগোচর হইল। পীরামিড এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত। উচ্চতায় প্রায় ৬০০ ফুট—প্রত্যেক প্রাচীর দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০০ ফুট। এইরূপ চারিটা প্রাচীর উর্দ্ধে যাইয়া এক কেন্দ্রে মিলিয়াছে। সমস্ত স্তূপটা সাধারণ বালুকাময় প্রস্তরে নির্ম্মিত।

এই স্তম্ভকে কবর বলিয়া বিবেচনা করা যাইতেই পারে না। পরে দেখিলাম উত্তর প্রাচীরের কিছু উর্দ্ধ অংশ হইতে কতিপয় লোক নামিতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য পীরামিডের উপর প্রায় ৫০ ফুট উঠিলাম। দেখা গেল একটা দরজা দ্বারা গড়ান ভাবে পীরামিডের অভ্যন্তরে যাওয়া যায়। শুনিলাম তাহার অভ্যন্তরেই প্রস্তর-সিন্দুকে রাজশরীরের মাম্মি রক্ষিত হইত। সময়াভাব, সুতরাং সময় ব্যয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার ধৈর্য্য ছিল না। যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা বলিলেন "দিল্লী কা লাড্ডু।"

সত্যই পীরামিড একপ্রকার দিল্লীকা লাড্ডু; বিশাল স্তূপ—প্রকাণ্ড প্রস্তরফলকে নির্ম্মিত অট্টালিকা। ইহাই এখানকার বিশেষত্ব। এখানে আসিলে কেবল এইমাত্র মনে হয় "এত পাথর আনিতে কত লোক লাগিয়াছিল? এই সকল পাথর বহন করিবার জন্য কোন কল আবশ্যক হইয়াছিল কি? কত দিন ধরিয়া কত লোক খাটিলে এইরূপ একটা স্তূপ নির্ম্মিত হইতে পারে?" এখানে শিল্প ও কারুকার্য্য-হিসাবে আর কিছু লক্ষ্য করিবার নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভূমির উপরে পীরামিডের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম কোণ ভূমণ্ডলের দিক্‌নিরূপণ অনুসারে কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়া যায়। ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ৪৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এই পীরামিড দর্শন করিয়া ইহার রচনাকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে লিখিয়া যান। তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ ১০০,০০০ লোক বৎসরে ৩ মাস করিয়া ২০ বৎসর খাটিয়াছিল।

আমরা যে পীরামিড দেখিলাম সেটা চতুর্থরাজবংশের অন্যতম নৃপতি-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রায় ৩০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ ইহার নির্ম্মাণকাল।

এই স্থানে আরও দুইটি পীরামিড্ আছে—এগুলিও প্রায় সেই যুগেই নির্ম্মিত। নির্ম্মাণ-রীতি একরূপ। কোন বৈচিত্র্য নাই। ঠিক উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্বপশ্চিম কোণ মাপিয়া প্রথম পীরামিডের সমান্তরালে পরে পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পীরামিড গঠিত। তবে দ্বিতীয় পীরামিডের প্রাচীর-চতুষ্টয়ের উপর আবরণ আছে, এই কারণে ইহা মসৃণ। অন্য দুইটির উপর কোন আবরণ নাই। এজন্য দ্বিতীয় পীরামিডের উপর উঠা যায় না। কিন্তু অন্য দুইটির প্রাচীরগুলি প্রায় সিঁড়ির মত ধাপধাপ। সকল পীরামিডেরই প্রবেশদ্বার উত্তরপ্রাচীরে।

দ্বিতীয় পীরামিডের সমীপস্থ স্ফিংক্স্।

INDIA PRESS. CALCUTTA.

পীরামিড কবরের পার্শ্বেই দেবালয় ও মন্দির ছিল। এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষমাত্র বর্ত্তমান।

পীরামিড পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সমস্ত নাইল-উপত্যকার উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্র এবং মিশরের শস্যসম্পদ ও কাইরো-নগর দেখিতে পাওয়া যায়।

একটিমাত্র পীরামিড দেখিয়া পাহাড়ের দক্ষিণদিকে গেলাম। পাহাড়ের পাদদেশে প্রসিদ্ধ স্ফিঙ্কস (Sphinx) পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া অবস্থিত। এই স্ফিঙ্ক্‌সের মুখ অন্যান্যগুলির ন্যায় মেষের মুখ নয়। ইহার শরীর সিংহের, মুখ নরপতির। আমাদের নরসিংহ অবতারের কথা স্মরণ করিলাম। ইহার লম্বা লম্বা কানদুটি হাতীর কানের মত সুবিস্তৃত। স্ফিঙ্কসের দক্ষিণে একটা মন্দির—সম্প্রতি বালুকাপ্রোথিত।

এই স্ফিঙ্ক্‌সের যথার্থ তত্ত্ব এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। বোধ হয় পীরামিডের কারিগরেরা সম্মুখে একটা সিংহসদৃশ পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিয়া ইহার শিরোদেশে রাজমুখ তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে, অবশ্য পরবর্ত্তী কালে জনগণ ইহার মধ্যে নানা তত্ত্ব বাহির করিয়াছে। সূর্য্যদেবরূপে এই মূর্ত্তি পূজাও পাইয়াছে।

প্রাচীন মিশরীয়েরা স্বকীয় ভৌতিক শরীর নানা কৌশলে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া আবৃত রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন। প্রস্তর-সিন্দুকের ভিতরে মাম্মি রাখিয়া তাহার ভিতর মণিমাণিক্য ইত্যাদি সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি তাঁহারা পুঁতিয়া রাখিতেন। এই প্রস্তরসিন্দুকগুলিকে দস্যুতস্কর এবং শত্রু নরপতিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বিচিত্র কবর-নির্ম্মাণ-রীতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন কালেই কবরগুলির উপর দস্যুবৃত্তি অনেকবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, প্রায় কোন কবরই রক্ষা পায় নাই। নানা সময়ে নানা লোকেরা পীরামিডের গাত্র ভেদ

করিয়া, কবরের দ্বার বাহির করিয়া, পর্ব্বত প্রাচীর খুদিয়া ফ্যারাও-দিগের লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছে। দৈবক্রমে যেগুলি আজকাল আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে দস্যুবৃত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়; কোন কোন কবর ঠিক প্রাচীন অবস্থায়ই রহিয়াছে।

প্রাচীন মিশরের জনপদ, নরপতি, অট্টালিকা, দেবদেবী, মন্দির, মস্তাবা ও কবর ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রত্যেক জিনিষেরই প্রায় তিনটা করিয়া নাম। একটা মিশরীয়, একটা গ্রীক এবং একটা আরবী। আমরা আজকাল গ্রীক নামেই এইগুলির পরিচয় পাইয়া আসিতেছি। গ্রীকেরা মিশরে রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রায় সকল বিষয়েই মিশরীয় আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন মিশরের ধর্ম্ম, কলা, শিল্প, সমাজ ও বিদ্যা, কোন বস্তুই গ্রীকেরা বর্জ্জন করেন নাই। সকলই তাঁহারা গ্রীকসভ্যতার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। এই কারণে আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তী গ্রীকেরা মিশরীয় সভ্যতার সকল-প্রকার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের নিকট বিশেষরূপেই ঋণী। কেবল তাহাই নহে—প্রাচীনতর গ্রীকেরাও মিশরের প্রভাব অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। মিশরে ভ্রমণ করিবার জন্য প্রাচীন গ্রীসের কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সকল শ্রেণীর লোকই আসিতেন। হেরোডোটাস হইতে প্লেটো পর্য্যন্ত সকলেই মিশরীয় বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন ও অন্যান্য গুহ্যতত্ত্ব শিখিয়া গিয়াছিলেন। ফলতঃ অনেকদিক হইতে প্রাচীন গ্রীসকে প্রাচীন মিশরের সন্তানরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

এইজন্য দেখিতে পাই—আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মিশরের প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় এত উৎসাহী। প্রাচীন মিশরকে ইঁহারা "প্রাচ্য" বা 'এসিয়াটিক' বলেন না। বরং প্রাচীন ইউরোপীয়সভ্যতার পথপ্রদ-

মিশরদেশের ২০০০ খৃঃ পূঃ সময়ের সৈন্যের নমুনা।

India Press, Calcutta.

শকরূপে ইহারা মিশরকে সম্মান করিতেছেন। তাহা ছাড়া মেরী ও যীশুর লীলাভূমিরূপেও মিশর আধুনিক খৃষ্টানদিগের তীর্থক্ষেত্র।

স্ফিংক্স্ হইতে বরাবর দক্ষিণদিকে গর্দ্দভপৃষ্ঠে অগ্রসর হইলাম। লীবিয় পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। খাঁটি মরুভূমি। ঈষৎ স্থবর্ণ-রঞ্জিত বালুকার উপর দিয়া গর্দ্দভ চলিতে লাগিল। বালুর মধ্যে ইহাদের খুর বসিয়া যায়। অথচ গর্দ্দভ-চালকেরা আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রিক্তপদে দৌড়াইয়া যাইতেছিল। এই পথ পূর্ব্বে নাইল-নদের খাত ছিল। পরে নাইল পশ্চিমপাহাড়ের চরণতল হইতে পূর্ব্ব-দিকে সরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় দেখিলাম পারস্যসম্রাটেরা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে একটা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া নদীর গতি পূর্ব্বদিকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই বাঁধের ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু বর্ত্তমান।

দুইঘণ্টা গর্দ্দভপৃষ্ঠে চলিয়া সাক্কারা জনপদে উপস্থিত হইলাম। পথে বালুকাময় পর্ব্বতশৃঙ্গে আবুসিরের পীরামিড্সমূহ দেখা গেল। পুরাতন ভগ্ন পীরামিড্গুলি ভারতীয় বৌদ্ধস্তূপের মত দেখায়। এইগুলি পঞ্চম রাজবংশীয়গণের আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল (২৭০০ খ্রীঃ পূঃ)।

সাক্কারা দেখিতে পারিব আশা ছিল না। অল্পকাল মাত্র মিশরে কাটাইব স্থির করিয়া পূর্ব্বে সাক্কারা বাদ দিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম নিউবিয়া হইয়া সুডান পর্য্যন্ত যাওয়া যাইবে। কিন্তু আসোয়ানে পৌঁছিয়া বুঝা গেল তাহার জন্য আর এক সপ্তাহ বেশী আবশ্যক। কাজেই শীঘ্র কাইরোতে ফিরিয়া আসিয়া মিশরের প্রাচীনতম নগর মেম্ফিসে পদার্পণ করিতে পারিলাম। বর্ত্তমানে পল্লীর নাম সাক্কারা।

প্রথমে পবিত্র বৃষগণের সমাধিক্ষেত্র দেখা গেল। এই পশুদিগের কবরের নাম "সিরাপিয়াম্।" মানুষের কবরের জন্য যে ব্যবস্থা, বৃষের কবরের জন্যও সেই ব্যবস্থা। পাহাড়ের ভিতর ঘর তৈয়ারী করা,

ঘণ্টা চলিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। পথে দুইতিনটা পল্লী দেখিতে পাওয়া গেল। শান্তিপূর্ণ লোকাবাস, মুদীখানা, দোকান ইত্যাদি সবতাতেই ভারতীয় পল্লীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। ফেল্লা ও ফেল্লা-পত্নীরা মাঠে চাষ করিতেছে। শসা, কুমড়া, কড়াইশুটি, গম, তুলা, ইক্ষু ইত্যাদি নানাবিধ শস্যের আবাদ দেখিতে পাইলাম। পারস্যচক্রের সাহায্যে ক্ষেতে জলসেচন করা হইতেছে। ছোট ছোট কোদাল ও উষ্ট্র-বাহিত লাঙ্গলের সাহায্যে মাটি কাটা হইতেছে। প্রায় সকল পথেই নাইলখালের নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত। জলের অভাব কোথাও লক্ষ্য করিলাম না। সর্ব্বত্রই কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখিতে পাইলাম।

এইপথে আসিতে প্রাচীন মেম্‌ফিসনগরের পুরাতন স্থান অতিক্রম করিলাম। এক জায়গায় রাম্‌সেস সম্রাটের বিশাল প্রতিমূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। এই প্রতিমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে তাঁহার পত্নীর চিত্র খোদিত। এইরূপ যুগলমূর্ত্তি লুক্সারের য়্যামন-মন্দিরে পূর্ব্বে কয়েকটা দেখিয়াছি।

রামসেসের মূর্ত্তি মেম্‌ফিসের দেবতা বৃষবাহন "তা"-দেবের মন্দির-সম্মুখে অবস্থিত ছিল। সেই মন্দিরের কোন অংশই বর্ত্তমান নাই। মাটি খুঁড়িয়া পাথর বাহির করা হইতেছে দেখিলাম।

মিশরের স্থাপত্য, অট্টালিকা এবং চিত্রাঙ্কণ দেখিয়া ভারতবর্ষের বিবিধ শিল্পকলার সঙ্গে তুলনা করিতে এখনও কোন সুধী প্রবৃত্ত হন নাই। ইংরাজ অধ্যাপক পেট্রি এবং ফরাসী অধ্যাপক ম্যাস্পেরো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের সঙ্গে মিশরের শিল্পকলার তুলনা করিতে যত্নবান্ হন নাই। প্রধানতঃ গ্রীক এবং গৌণতঃ ব্যাবিলনীয় শিল্পকলার সঙ্গে মিশরীয় শিল্পকলার তারতম্য নির্ণীত হইতেছে মাত্র। ভারতবাসীর এদিকে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ মিশরের সঙ্গে ভারতের সংযোগ ছিল কি না তাহার

ক ইরোর মিশরীয় সংগ্রহালয়ের কটী দৃশ্ র গের সন

বিচার করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ মিশরের শিল্পকলাই জগতের আদি শিল্পকলা কি না ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখন আর তাহা সন্দেহ করিতেছেন না। ভারতীয় শিল্পকলা যে মিশরীয় শিল্পকলারই পৌত্র বা প্রপৌত্র মাত্র পাশ্চাত্য সুধীবর্গ তাহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতেছেন। এই সিদ্ধান্তেরও পুনরায় আলোচনা হওয়া আবশ্যক, সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে মিশরীয় ও ভারতীয় শিল্পের তুলনা-সাধন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। ভারতের স্বদেশী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ দিকে দৃষ্টি না দিলে বিষয়টা যথোচিত আলোচিত হইবে না।

এতদ্ব্যতীত, শিল্প এবং কারুকার্য্য হিসাবেও মিশরীয় ও ভারতীয় গৃহনির্ম্মাণ, মূর্ত্তিগঠন এবং চিত্রাঙ্কণের তুলনা সাধিত হওয়া আবশ্যক। উভয়শিল্পের অন্তর্নিহিত "প্রেরণা" নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। সৌন্দর্য্য ও সুকুমার কলার দিক্ হইতে উভয় জাতির উৎকর্ষ নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

যতটা লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে মনে হয়, বিশালতা, বিপুলতা, উচ্চতা ইত্যাদি পরিমাপের গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব মিশরীয় বাস্তু, মূর্ত্তি ও চিত্রের প্রধান লক্ষণ। ভারতীয় শিল্পেও দৃঢ়তা, বিপুলতা এবং গাম্ভীর্য্য যথেষ্ট আছে। তবে মিশরীয় শিল্পে এগুলি যে-পরিমাণে দেখিতে পাই, ভারতীয় শিল্পে বোধ হয় সে পরিমাণে পাই না।

দ্বিতীয়তঃ, মন্দিরের গৃহসন্নিবেশ এবং বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ অনেকটা হিন্দুদেবালয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। "পাইলেন" আমাদের তোরণদ্বার বা গোপুরমের অনুরূপ। তারপর স্তম্ভবিশিষ্ট জগমোহন, ভোগমন্দির, দেবতার স্থান, পুরোহিত-গৃহ ইত্যাদির অনুরূপ সকল অঙ্গই মিশরীয় মন্দিরে লক্ষ্য করিয়াছি অবশ্য গঠনকৌশল এবং গঠনের উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে একরূপ নয়।

তৃতীয়তঃ, পর্ব্বতকন্দরে মন্দির বা কবর নির্ম্মাণ করিবার রীতি মিশরের ন্যায় ভারতবর্ষেও যথেষ্ট দেখিতে পাই। মিশরের এই-সমুদয় দেখিয়া যতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া যায়, ভারতের কার্লী, অজন্তা, গোয়ালিয়র দেখিয়া তাহা অপেক্ষা কম বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য, গৃহ-সজ্জার শৃঙ্খলা, প্রকোষ্ঠের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃত ইত্যাদি কোন বিষয়েই মিশরীয় পর্ব্বতকন্দরস্থ বাস্তুশিল্প ভারতীয় পর্ব্বতগহ্বরস্থ বাস্তুশিল্প হইতে স্বতন্ত্র নয়।

চতুর্থতঃ, পীরামিড ও স্তূপ দুইই একশ্রেণীর অন্তর্গত। দুইই সমাধির উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত—দুইএরই নির্ম্মাণপ্রণালী অনেকটা একপ্রকার।

পঞ্চমতঃ, চিত্রাঙ্কণে মিশরীয় শিল্পীদিগের ক্ষমতা বেশী কি হিন্দুস্থানের শিল্পীদিগের ক্ষমতা বেশী তাহা মাপিয়া উঠা কঠিন। মনোভাব ফলাইবার ক্ষমতা উভয়েই বিদ্যমান। ধর্ম্মের কাহিনী, ইতিহাসের কথা, সমাজের অবস্থা, জনগণের চরিত্র ইত্যাদি সবই ভারতবর্ষের ও মিশরের স্তূপগাত্রে, সমানভাবেই বিবৃত হইয়াছে। মিশরীয় ও ভারতীয় শিল্পের তারতম্য করা কঠিন। অবশ্য এখানকার ধর্ম্মতত্ত্ব ও ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব স্বতন্ত্র। এই যা প্রভেদের জন্য মূর্ত্তিনির্ম্মাণে ও কাহিনী-প্রচারে শিল্পীদিগের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইবে।

ষষ্ঠতঃ, মূর্ত্তিগঠন সম্বন্ধে ও কারিগরি হিসাবেও এই কথাই বলা যাইতে পারে।

আর একটা কথা মিশরসম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। এখানকার জলবায়ুর গুণে বাড়ীঘর সবই পাহাড়ের মত বহুকাল দৃঢ় ও সবল থাকে। ভারতবর্ষের বর্ষা ও ঝড় মিশরে থাকিলে এতদিন পর্য্যন্ত মিশরীয় কারুকার্য্য বাঁচিয়া থাকিত কি না সন্দেহ। ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে মিশরীয় শিল্পের তুলনার কালে একথা ভুলিলে চলিবে না।

কাইরোর মিশরীয় মিউজিয়মে রক্ষিত 'মাম্মি'।

I... P... CALCUTTA.

দ্বাদশ দিবস—মিশর-তত্ত্ব

প্রাচীন মিশরের নানা কেন্দ্র দেখা হইয়া গেল। এইবার পুরাতন বস্তুসমূহের সংগ্রহালয় বা মিউজিয়াম দেখিতে গেলাম। মিউজিয়াম দেখিবার পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থান স্বচক্ষে দেখা থাকিলে প্রাচীন সমাজ বুঝিতে যথেষ্ট সাহায্য হয়। মিউজিয়াম-গৃহে বসিয়া, প্রত্যেক বস্তুর স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনা করা চলিতে পারে। কিন্তু যথাস্থানে ধ্বংসরাশির মধ্যে ভগ্নস্তূপ বা ভগ্নমন্দির এবং মূর্ত্তির বিচ্ছিন্ন অংশ অথবা প্রাচীরগাত্র এবং নষ্টপ্রায় চিত্র না দেখিলে পুরাতন জীবনযাপনপ্রণালী, পুরাতন ধর্ম্মপ্রথা, পুরাতন সমাজের মূর্ত্তি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। প্রথমেই এইগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়া রাখিলে প্রাচীন জনগণের আদর্শ ও চিন্তাপদ্ধতি খানিকটা আয়ত্ত করিয়া ফেলা যায়। তাহার পর মিউজিয়ামে আসিলে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য, পরে কার্য্য এবং যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য হয়।

কাইরোনগরে দুইটি মিউজিয়াম। একটি প্রাচীন-মিশরতত্ত্ব-বিষয়ক। অপরটি মধ্যযুগের মিশরতত্ত্ব-বিষয়ক। প্রথমটিতে মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিশরের সকল বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মুসলমানী শিল্প ও কলার নানা নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। দুইটি মিউজিয়ামই ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রাচীনমিশরতত্ত্ব-বিষয়ক মিউজিয়ামে একজন মুসলমান প্রত্নতত্ত্ববিদের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি এখানকার অন্যতম কিউরেটর বা পরিচালক।

ইনি ১৬ বৎসর বয়স হইতে প্রাচীন মিশরীয় লিপি শিক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার বয়স প্রায় ৬০ হইবে। প্রাচীনমিশরতত্ত্ব-সম্বন্ধে ইনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইনি আরবী ও ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি এই মিউজিয়মের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-বিষয়ক নানা রিপোর্ট ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ফরাসীভাষায় গ্রন্থগুলি লিখিত। সম্প্রতি ইনি এক বিরাটগ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আরবী ও মিশরীয় নৃতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া প্রাচীনমিশরীয় জাতিতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ইনি দেখাইতে চাহেন যে হায়েরোগ্লিফিকের চিত্রসমূহের নাম আরবী অক্ষরমালারই নামান্তরমাত্র। আরবী জানি না। সুতরাং ইহার সকল কথা ভাল বুঝিলাম না।

অন্যান্য বিষয়েও কথাবার্ত্তা হইল। তাহাতে বুঝা গেল যে, প্রাচীন-ভারতের বেশী কথা মিশরের ভাষায়, সাহিত্যে বা শিল্পে জানা যায় না। মিশরের বাণিজ্যপথ বোধ হয় ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। ভূমধ্য-সাগর এবং লোহিতসাগর—এই দুইটি সাগরের সমীপবর্ত্তী জনপদসমূহই প্রাচীন মিশরবাসীর কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, ধর্ম্ম, সংগ্রাম, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি কোন বিষয়েই মিশরীয়েরা বেশী দূর অগ্রসর হন নাই।

মিশরের পর্ব্বতমধ্যেই যে-সমুদয় ধাতু জন্মিত সেইগুলি হইতেই নানাপ্রকার রং প্রস্তুত হইত। নীল রং অথবা গোধূম ভারতবর্ষ হইতে মিশরে আসিত কি না তাহার কোন সাক্ষ্য নাই। নীল রং উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত করা হইত না। ধাতু ও প্রস্তর হইতে তৈয়ারী করা হইত। কিউরেটর মহাশয় এসিয়ুতের নিকটবর্ত্তী একস্থানে কোন কবর খনন করিতে করিতে কতকগুলি শস্যশালা পাইয়াছেন। সেগুলি ষষ্ঠ-রাজবংশীয় যুগের (২৬০০ খৃঃ পূঃ)। সেই শস্যশালার মধ্যে গোধূম পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং গোধূমের চাষ মিশরে অতি প্রাচীন।

ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম "পান্তদেশ কোথায়?" ইনি বলিলেন "পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগের মত ছিল যে, আরবের উত্তর দিকে পান্তদেশ। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে সোমালিদেশই প্রাচীন পান্ত-জনপদ। এই স্থানে নানা সুগন্ধিদ্রব্য উৎপন্ন হইত। ধূপ, ধাতু, প্রস্তর ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থ আনিবার জন্য রাণী হাৎসেপসুট বাণিজ্যতরী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার লোকজন আসোয়ানের নিকট হইতে পূর্ব্বদিকে মরুপথে অগ্রসর হইয়াছিল। পরে লোহিতসাগরের কোন বন্দরে নৌকা করিয়া দক্ষিণে যাত্রা করে অবশেষে এডেনের অপর পারে আফ্রিকার কূলে পান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

কিউরেটর মহাশয় এক্ষণে মিশরের দুই তিন স্থানে মৃত্তিকা খনন করিয়া লুপ্তবস্তুর উদ্ধারসাধনে নিযুক্ত আছেন। এই-সকল স্থানে নূতন নূতন মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হইবে। একজন ফরাসী পণ্ডিত মিউ-জিয়ামের এক কোণে বসিয়া পুরাতন লিপি পাঠ করিতেছেন। অন্যত্র এক গৃহে একজন জার্ম্মাণ দর্শক কয়েকটি মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ লইতেছেন। দুএকস্থানে দেখা গেল একজন জার্ম্মাণ প্রদর্শক ৫০।৬০ জন নরনারীকে লম্বাগলায় বক্তৃতা করিয়া মিউজিয়মের দর্শনীয় জিনিষগুলি বুঝাইয়া দিতেছেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বেচারারা এই মাষ্টারমহাশয়ের বক্তৃতা গম্ভীর-ভাবে শুনিতেছে!

কিউরেটর মহাশয়ের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক আলাপ করা গেল। আসিবার সময়ে তাঁহাকে হোটেলে চা পানের নিমন্ত্রণ করিলাম। যথা-সময়ে তিনি আসিলেন। পীরামিড্-রচনার মাপ ও কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তিনি একজন শিক্ষকও বটে। প্রায় ৬।৭ জন মুসলমান ছাত্র তাঁহার নিকট মিশর-তত্ত্ব নিয়মিতরূপ শিক্ষা করিয়া থাকে। ইনি তাহাদিগকে আরবীভাষায় শিখাইয়া থাকেন। ইহাঁর দুইপুত্র

ফরাসী শিক্ষা পাইয়া সীরিয়াদেশে হাকিমী শিক্ষা করিতেছে। আর এক পুত্র ইংরাজী শিখিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশর-তত্ত্ব শিখিতেছে।

প্রাচীন মিশরতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়াম হইতে মুসলমানী মিশরতত্ত্ব-বিষয়ক মিউজিয়ামে গেলাম। খাঁটি মুসলমানী দ্রব্যের সংগ্রহালয় কাইরোর এই মিউজিয়াম ব্যতীত আর কোথাও আছে কি না জানি না। বাস্তুশিল্পের বিভিন্ন অঙ্গই এই মিউজিয়মে প্রধানতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর, মিউজিয়াম-গৃহ এখনও ক্ষুদ্র—অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ। এই মিউজিয়ামের দর্শনীয় বস্তুর তালিকা ম্যাক্স হার্জ বে কর্ত্তৃক জার্ম্মাণ ভাষায় প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহার এক ইংরাজী অনুবাদও আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মুসলমানী শিল্পের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থ বেশ সুলিখিত। যাঁহারা ভারতের মুসলমান মসজিদ ও কবর ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজে অনেক কথা শিখিতে পারিবেন।

এই আরবী মিউজিয়ামের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার আছে। তাহার মধ্যে প্রায় একলক্ষ গ্রন্থ রক্ষিত হইতেছে। প্রধানতঃ মুসলমানী সাহিত্যই এই গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

এই মিউজিয়ামে বেড়াইতে বেড়াইতে মনে হইতে লাগিল—মধ্যযুগে মুসলমানেরা এসিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা—সর্ব্বত্রই প্রতাপশালী ছিলেন। হয় সাম্রাজ্য, না হয় খণ্ডরাজ্য, প্রদেশ-রাজ্য বা অধীনরাজ্য ইত্যাদি প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক মুসলমানসমাজ চীন হইতে স্পেন পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। স্পেনের সঙ্গে মিশরের, মিশরের সঙ্গে ভারতের, পারস্তের সঙ্গে তুরস্কের, এবং পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কিরূপ ধর্ম্মসংযোগ ও ব্যবসায়-সম্পর্ক ছিল তাহা জানা

পাথর নির্ম্মিত।

আবশ্যক। এদিকে অনুসন্ধান চালিত করিলে ভারতবর্ষের চিন্তা কোন-পথে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল জানিতে পারা যাইবে। আবার অন্য কোন্ কোন্ দেশের প্রভাবে ভারতের মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের শিল্প, সমাজ, ধর্ম্ম ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহাও জানিতে পাইব। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের পক্ষে এই একটা নূতন আলোচ্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিশরের ব্যবসায়সম্বন্ধ বেশ ঘনিষ্ঠই ছিল। মিশরে যাঁহাকে প্রদর্শকস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ষোড়শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদপ্রদেশ হইতে এইখানে আসেন। তাঁহাদের নীলের ব্যবসায় ছিল। মিশরের লোক-সাহিত্যেও ভারতবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাই। মিশরীরা ভারতবর্ষকে 'হিন্দি' বলে। ভারতের হিন্দুই হউক, মুসলমানই হউক, তাহারা 'হিন্দি' নামে পরিচিত। 'হিন্দির শাল আলোয়ান', 'কাশ্মীরের শাল' ইত্যাদি শব্দ কৃষকগণের সরলগীতের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের হিন্দু মুসলমান নিউবিয়া সুডান ও মিশরের নানাস্থানে প্রতাপশালী ব্যবসায়ী জাতিরূপে বিবেচিত হইতেন। ইঁহাদের ব্যবসায় এক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় বণিকগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। আজকালও মিশরে বোম্বাই, গুজরাত, সিন্ধু প্রভৃতি দেশের হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীরা বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। আমাদের এখানকার গুজরাতী বন্ধুগণের কারবার মিশরের নানা কেন্দ্রে বেশ চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত ইঁহারা জিব্রল্টর, মল্টা, জাপান, যবদ্বীপ প্রভৃতি জগতের নানাস্থানে একসঙ্গে ব্যবসায় চালাইতেছেন।

ফরাসীভাষা জানা থাকিলে মিশরে চলাফেরায় বিশেষ সুবিধা হয়। মিশরবাসীর মাতৃভাষা আরবী। জনসাধারণ আরবীতে কথা বলে,

কিন্তু শিক্ষিত ও ভদ্রব্যক্তিরা সকলেই ফরাসী জানেন। প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী জানেন না দেখিতেছি। ইহাঁদের সঙ্গে আলাপ করিতে যাইয়া সর্ব্বদা দোভাষীর সাহায্য লইতে হইয়াছে।

ইহাঁরা উচ্চশিক্ষা ও নব্যসভ্যতার দ্বারস্বরূপ ফরাসীভাষা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহাঁরা ইউরোপকে ফরাসী জাতির ভিতর দিয়া চিনিয়াছেন। আমরা যেমন ইংলণ্ডের সাহায্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার পরিচয় পাইয়াছি; ইহাঁরা সেইরূপ ফরাসীজাতির সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিয়া আধুনিক জগতের হাবভাব, আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী আয়ত্ত করিয়াছেন। আমরা "বিলাতফেরতা" বলিলে যাহা বুঝিয়া থাকি মিশরবাসীরা "আলা ফ্রাঙ্কা" শব্দ ব্যবহার করিয়া সেইরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। যে সকল মিশরী পাশ্চাত্যভাষায় কথা বেশী বলে, বিদেশীয় কায়দায় জীবনযাপন করে এবং ইউরোপীয় চালে বেশভূষা করিতে ভালবাসে, সেই সকল অনুকরণপ্রিয়, চরিত্রহীন, ব্যক্তিত্বহীন লোককে এখানে "আলা ফ্রাঙ্কা" বলা হয়।

অবশ্য আলা-ফ্রাঙ্কা অল্পদিন মাত্র এইরূপ তিরস্কারে পরিণত হইয়াছে। পরানুকরণ ও পরানুবাদ মিশরবাসীর মধ্যে সম্প্রতিমাত্র দুর্ব্বলতার আকার ধারণ করিয়াছে। একশত বৎসর পূর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মিশরের খেদিভ ছিলেন কর্ম্মবীর মহম্মদ আলি। তিনি স্বচেষ্টায় ইউরোপের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান মিশরে প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টিত হন। তখনও ফ্রান্সই ইউরোপের অনেকটা হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। দিগ্বিজয়ী শক্তি-শিষ্য নেপোলিয়ান তখন জগৎকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন মূর্ত্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত। মহম্মদ আলি নেপোলিয়ানের আদর্শে জীবন গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। তুরস্কের সুলতানকে মিশর হইতে বহিষ্কৃত করা তাঁহার সাধ ছিল। এমন কি স্বয়ং তুরস্কের সুলতানপদে অধিষ্ঠিত হওয়াও তাঁহার

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তুরস্ক তখনও সুবিস্তৃত রাজ্য। এই রাজ্যকে ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্রধান খণ্ডে বিভক্ত করা ইউরোপীয়েরা পছন্দই করিতেন। বিশেষতঃ নেপোলিয়ান ও ফরাসীরা মিশরকে প্রবল করিয়া তুরস্কের খর্ব্বতাসাধনে উৎসাহী ছিলেন। এইজন্য মহম্মদ আলির সম্বন্ধে ফরাসীরা সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

মহম্মদ আলি ফরাসী পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, শিল্পী, কারিগর ইত্যাদি সকলপ্রকার লোক স্বদেশে আমদানী করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই "আলা-ফ্রাঙ্কা" আন্দোলনে বিন্দুমাত্র পরাধীনতা, দুর্ব্বলতা এবং দাস্যের চিহ্ন ছিল না। জাতীয় স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্যই তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে ফরাসীজাতির পাণ্ডিত্য স্ব-সমাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের গৌরববিস্তার, আরবীভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এবং মিশরবাসীর রাষ্ট্রীয় ও সর্ব্ববিধ দক্ষতা বর্দ্ধনই তাঁহার সকল কর্ম্মের চরম লক্ষ্য ছিল। এই স্বদেশী আন্দোলনের সহায়স্বরূপই মহম্মদ আলি আলাফ্রাঙ্কা আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। রুশিয়ার গৌরবপ্রতিষ্ঠাতা পিটারও রুশ জাতীয়-জীবনের উৎকর্ষবিধানের জন্য এইরূপ বিদেশীয় জ্ঞানীদিগের সাহায্য লইয়াছিলেন। প্রুশিয়ার ফ্রেড্‌রিকও এই পথ ধরিয়াছিলেন। স্বীয় সমাজকে অবনত ও ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে উন্নত ও গৌরবশালী করিয়া তুলিবার জন্য সকল কর্ম্মবীরই জগতের শক্তিপুঞ্জ এইরূপে নিজস্বার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহারা নানা গুণীব্যক্তিকে অর্থসাহায্য সম্পত্তিদান ইত্যাদি দ্বারা স্বদেশে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টিত হন। মহম্মদ আলি জগতের এইরূপ সংরক্ষণশীল সভ্যতাপ্রবর্ত্তক বীরপুরুষগণের অন্যতম।

সুতরাং মহম্মদ আলির আমলে আলাফ্রাঙ্কা আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনেরই উপায় ও সহায়মাত্র ছিল। পরবর্ত্তী কালে নানা কারণে মিশরের

দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে। মিশরবাসীরা স্বচেষ্টায় স্বাধীনভাবে এবং নিজ ভবিষ্যৎ স্বার্থ অনুসারে বিদেশীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। পরানুকরণ ও পরানুবাদের দোষ এই সময়ে মিশরসমাজকে আক্রমণ করিয়াছে। আজকাল দেখিতেছি ইউরোপের চরিত্রহীনতা, বিলাসপ্রিয়তা, এবং বাহ্যনিষ্ঠাই মিশরীয় আলাক্রাকার প্রধান লক্ষণ।

যাহা হউক, শক্তিমানের ন্যায়ই হউক বা দুর্ব্বলের ন্যায়ই হউক, মিশরবাসীরা ফরাসী ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প একশতাব্দীকাল আদর করিয়া আসিতেছে। এজন্য এখনও ফরাসীবিদ্যায় পণ্ডিত লোক মিশরে অনেক দেখিতে পাইতেছি। বিদ্বান্‌লোক বলিলেই মিশর-বাসীরা ফরাসীশিক্ষিত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া থাকে।

আজকাল মিশররাষ্ট্রের রাজকর্ম্ম দুই ভাষায় চলিয়া থাকে—আরবী ও ফরাসী। বিদ্যালয়েও ফরাসী শিক্ষারই প্রাধান্য। সংবাদপত্র ফরাসী-ভাষায় বেশী। মিশরবাসীদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষালাভের পর গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা ফরাসীভাষাতেই লেখক। বিচারালয়ে উকীলেরা ফরাসীভাষায় অথবা আরবীভাষায় বক্তৃতা করেন। ব্যবসায়-মহলেও ফরাসীভাষার প্রভাব দেখিতে পাইতেছি। হাটে বাজারে, দোকানে,হোটেলে, থিয়েটারে, কাফি-গৃহে, ট্রামে, রাস্তার নামে, বিজ্ঞাপনে সর্ব্বত্রই ফরাসী ভাষা দেখিতে পাই। আমাদের দেশের কুলীমজুর গাড়োয়ানেরা যেমন দুইচারিটা ইংরাজী কথা বলিতে পারে, এখানকার সেই শ্রেণীর লোকেরা সেইরূপ ফরাসিতে বুকনি দেয়। এইজন্যই ফরাসী জানা থাকিলে মিশরের সকল মহলে সহজে প্রবেশ করা যায়। দুর্ভাগ্য-ক্রমে এ ভাষা জানা ছিল না। এজন্য যথার্থভাবে মিশরের হৃদয় অধিকার করিতে পারিলাম না বলিতে বাধ্য।

অবশ্য ইতালীয় ও গ্রীক এই দুইটা ভাষাও এখানকার অনেক লোকই

ত্রয়োদশ দিবস—নব্য মিশর

১৯১১ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানবপরিষদের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, লোহিতাঙ্গ, পীতাঙ্গ ইত্যাদি জগতের সকলপ্রকার জাতি হইতে পণ্ডিতগণ সেই সভায় নিজ নিজ সমাজ, ধর্ম্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মানব-জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরস্পর সখ্য ও সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধনই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুসাহিত্যপ্রচারক দার্শনিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই সভায় নেতৃত্বের পদে আহূত হন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে মহোদয় প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। আধুনিক মিশর সম্বন্ধেও একজন প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মহম্মদ সুরুর বে। তিনি কাইরো নগরের একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। অন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়সমূহে ইনি ওকালতী করেন। ফরাসী ভাষার সাহায্যে ইনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ফরাসী ভাষাতেই ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। মিশরের বর্ত্তমান সমাজে ইঁহার মর্য্যাদা বেশ উচ্চ।

কাইরোর আর-একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাহগাত বে। ইনি চিকিৎ-সক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুসারে চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করেন। ইনি ইংরাজীতে বেশ লিখিতে পারেন। "প্যান্‌-ইস্‌লাম"-আন্দোলনের ইনি একজন নায়ক। জগতের মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী জনগণের ভবিষ্যৎ আদর্শ ইনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ভারতীয়

মুসলমানেরা "প্যান্ ইস্লাম"-আন্দোলনকে অনেকটা হিন্দু-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু ডাক্তার বাহগাত বে মহাশয়ের আদর্শ অতি উচ্চ। জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে আধুনিক মুসলমান জাতিরাও নিজেদের যাহা দিবার তাহা দিয়া ইহাকে নব উপায়ে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিবে—ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। ভারতবাসী হিন্দুগণও তাহাই চাহে। বিশ্বের আধুনিক ইতিহাসে হিন্দুসভ্যতা তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া জগতের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবে—ইহাই বর্ত্তমান হিন্দুজাতির মর্ম্মকথা।

ডাক্তার বে মহাশয়ের বৈঠকখানায় আগাগোড়া স্বদেশী শিল্প, কারুকার্য্য ও চিত্র দেখিলাম। তাঁহার গৃহের ছাদ, প্রাচীর, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সকল জিনিষেই মুসলমানী কায়দার অলঙ্কার ও সাজসজ্জা রহিয়াছে। কোন স্থানেই নব্য-আলোক বা "আলাফ্রাঙ্কা"র চিহ্ন দেখিলাম না। গৃহে যতগুলি ছবি রহিয়াছে সকলগুলিই মুসলমান-সমাজ-বিষয়ক। তুরস্কের ও মিশরের নানা দৃশ্য ও ঘটনা এই চিত্রাবলীর আলোচিত বিষয়।

আমাদের প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ কাইরোর "এল্-আজার" বা মসজিদ-বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্বে দেখিয়াছি। ইহার প্রভাবের কথাও পূর্ব্বে শুনিয়াছি। আজ কথায় কথায় আমাদের প্রদর্শক বলিলেন, —"এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই আধুনিক ইংরাজ ও ফরাসী পণ্ডিতগণ আরবী ও মুসলমানী সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছেন। মুসলমান ব্যতীত অন্যধর্ম্মাবলম্বী লোকও এই স্থানে শিক্ষা পায় অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্লামবিষয়ক বিদ্যার প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ব্রকার্ড (Brochardt) এই মসজিদ-বিদ্যালয়েই প্রথম আরবী শিক্ষা করেন। ভারতীয় সেনাবিভাগের কাপ্তেন শ্রীযুক্ত স্যার উইলিয়ম বার্টনও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। পরে ইনি মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আবদাল্লা নাম

গ্রহণ করেন। ভারতীয় মধ্যযুগ বা মুসলমান প্রভাবের কাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লেন পুল গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইনিও এই মসজিদ-বিদ্যালয়েরই ছাত্র।

আজ মিশরীয় মুসলমান-সমাজের এক নূতন উদ্যম ও কৃতিত্বের পরিচয় পাইলাম। এতদিন মিশরে সুকুমার শিল্প ও চিত্রকলা শিখাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মুসলমানদিগের প্রতিভা এই বিভাগে আদৌ আছে কি না তাহাই অনেকে সন্দেহ করিতেন। প্রায় সাত বৎসর হইল মিশরের একজন বদান্য ধনী—কুমার ইউসুফ কামাল পাশা ফরাসী বন্ধুগণের পরামর্শে কাইরো নগরে এক সুকুমার কলা-বিদ্যালয় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় কুমার স্বয়ং বহন করিয়া আসিতেছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা এক্ষণে প্রায় ১৫০। ইহাদের অনেকেই দরিদ্র ও নিরক্ষর। কতিপয় ছাত্র বিনাবেতনে শিক্ষা পাইতেছে।

এই বিদ্যালয় দেখিতে গেলাম। সহরের সাধারণ মহাল্লায় এক মামুলি গৃহে বিদ্যালয় অবস্থিত। সকল ঘরে সমান ভাবে আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। জাঁকজমকপূর্ণ কাইরো নগরে এই বিদ্যালয় অতি দীনহীন মলিন ভাবে জীবন যাপন করিতেছে।

কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এই নগণ্য বহিরাকৃতির অভ্যন্তরে যথার্থ প্রাণ বিরাজ করিতেছে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ একজন ফরাসী চিত্রকর। ইনি পূর্ব্বে সিংহল, শ্যাম, চীন প্রভৃতি দেশে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রগণের হাতের কাজ খুব ভাল করিয়া দেখাইলেন। প্রথম ছয় মাসের ভিতরই ছাত্রেরা কত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী-গৃহে যাইয়া তাহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইলাম। ইনি প্রত্যেক চিত্র, মৃত্তিকামূর্ত্তি,

'ডিজাইন' ইত্যাদির সম্মুখে লইয়া যাইয়া এই সমুদয়ের বিশেষত্ব বুঝাইতে লাগিলেন।

ইহাঁর শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। ইনি বলিলেন, "আমি যখন প্রথম এই কার্য্য গ্রহণ করি, আমাকে নানা লোকে নানা উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন। কেহ বলিতেন, 'গ্রীক-রীতি অবলম্বন কর।' কেহ বলিতেন, মুসলমানী কায়দার নকল শিখাও।' কেহ বলিতেন, 'প্রাচীন মিশর হইতে শিক্ষার উপকরণ গ্রহণ কর।' আমি কাহারও পরামর্শে টলি নাই। আমি সকলকে বলিতাম, "না, আমি কোন রীতিরই নকল করিব না। আমার ছাত্রেরা কোন আদর্শ, কায়দা, ছাঁচ বা রীতিই দাসের মত অনুসরণ করিবে না। তাহাদের নিজ মাথায় যাহা আসে আমি তাহাদিগকে তাহাই শিখাইব। স্বকীয় কল্পনাশক্তি, স্বকীয় উদ্ভাবনীশক্তি, স্বকীয় চিন্তাশক্তির পুষ্টিসাধনই আমি পছন্দ করি।

ফুল, ফল, লতা, পাতা, অলঙ্কার, মূর্ত্তি, বর্ণ-সমাবেশ, সবই তিনি এই উপায়ে ছাত্রদিগকে শিখাইয়াছেন।* কোন ফর্ম্মুলা বা বাঁধাগৎ তাঁহার ছাত্রেরা শিখে নাই। স্বয়ং প্রকৃতি এবং নিজ নিজ সৌন্দর্য্যজ্ঞান তাহাদের শিক্ষকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং মিশরের লোকজন, কৃষি, শিল্প, উদ্ভিদ্, ব্যবসায় ইত্যাদি তাহাদের আলোচ্য বিষয় দেখিতে পাইলাম।

প্যারিস-মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কতকগুলি মূর্ত্তি দেখা গেল। এই সমুদয়ের মুখমণ্ডলে হৃদয়ের ভাব বেশ প্রকাশিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগঠনে মুসলমান যুবকেরা সত্যই কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে, বুঝিতে পারিলাম।

ফরাসী অধ্যক্ষ মহাশয়কে অত্যন্ত উৎসাহশীল এবং কর্ম্মঠ বোধ হইল। তিনি শিল্পজগতে মিশরীয় মুসলমান-যুবকগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

বড়ই আশান্বিত। আক্ষেপের সহিত বলিলেন, "আমি যদি ভারতবর্ষের এইরূপ কোন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইতাম, তাহা হইলে এই কয়দিনে কত বেশী ফল দেখাইতে পারিতাম। এখানে গাধা পিটাইয়া মানুষ করিতে হইতেছে। ছাত্রেরা অনেকেই সাধারণ নিম্নশিক্ষাও পায় নাই। সামান্য গণিতও কেহ কেহ জানে না। তাহার উপর, তিন চারি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইহারা অন্নসংস্থানের উপায় বাহির করিতে বাধ্য হয়। এই-সকল উপকরণ লইয়া আমাকে কাজ করিতে হইতেছে। এ দিকে, মিশরবাসীর উৎসাহ বা সাহায্য ত বিন্দুমাত্র পাই না। কেহই বিদ্যালয়ে অর্থদান করিতে চাহেন না। নিজ নিজ বিলাসভোগে প্রায় সকল ধনীই ডুবিয়া আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই বিদ্যালয় থাকিলে আমার কাজের আদর হইত। বিদ্যালয় অল্পকালেই জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিত।"

আমি শুনিয়া হাসিলাম। পরে তিনি আবার বলিলেন, "এইমাত্র সম্বল লইয়াও আমরা অসাধ্যসাধন করিয়াছি। আমাদের একটি ২২ বৎসর বয়স্ক ছাত্রকে প্যারিসের সর্ব্বোচ্চ শিল্পবিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছি। গত বৎসর সেখানকার পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রটি সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই পরীক্ষায় প্রায় ৮০০ ছাত্র উপস্থিত ছিল। ইউরোপের সকল দেশ হইতেই ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতা পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করে। আশ্চর্য্যের কথা, একজন মিশরীয় মুসলমান যুবক সকলকে হারাইয়া সর্ব্বোচ্চ আসন পাইয়াছে এই সুফলে খুসী হইয়া বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কুমার বাহাদুর তাহাকে বৃত্তি দিয়া Ecole des Beaux Art a Paris নামক প্যারিসের জাতীয় কলা-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন।"

কাইরোর প্রচীন মিশরতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়ামের কর্ত্তা প্রসিদ্ধ

ফরাসী পণ্ডিত ম্যাস্পেরো। এই চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষও একজন ফরাসী। আরবী মিউজিয়ামের সংলগ্ন গ্রন্থশালার কর্ত্তা একজন জার্ম্মান পণ্ডিত। কাইরোর পণ্ডিতমহল বাস্তবিকই ইউরোপীয় চিন্তাজগতের অন্যতম অংশ।

খেদিভের এই গ্রন্থশালাকে কলিকাতার লাইব্রেরীর সঙ্গে তুলনা করা এবং বোম্বাইয়ের এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। মুসলমানী সাহিত্য ব্যতীত আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ এবং সংবাদপত্র, মানচিত্র ইত্যাদি সবই এখানে আছে। বসিয়া পড়িবার অতি সুবন্দোবস্ত দেখিলাম। বাড়ীঘর আসবাবপত্র কাইরো নগরের ঐশ্বর্য্যের অনুরূপই হইয়াছে। অট্টালিকা মুসলমানী আরাবেস্ক বা সারাসেন কায়দায় নির্ম্মিত।

এক বিভাগে কতকগুলি কোরান আলমারির ভিতর সাজান রহিয়াছে। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে বহু কোরান সংগৃহীত হইয়া এখানে রক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে এই সমুদয় গ্রন্থ খেদিভ বা পাশাদিগের গৃহে অথবা ভিন্ন ভিন্ন মসজিদে পড়িয়া ছিল; এক্ষণে এই গ্রন্থশালায় সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই গৃহ দেখিলে ভারতবর্ষ হইতে স্পেন পর্য্যন্ত মুসলমান-জগতের বিভিন্ন প্রদেশে যুগে যুগে যে-সকল কোরান-গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কোরানগুলি প্রায়ই বৃহদাকার—প্রত্যেকখানিই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, নানাচিত্রে সুশোভিত। সপ্তম শতাব্দী হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক যুগের লিখনপ্রণালীও এই গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এই কোরান-সংগ্রহালয়ে প্রবেশ করিলে আরবী অক্ষর-মালার বৈচিত্র্য ও ক্রমবিকাশ বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন মুসলমানী শিল্পেরও কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুসমাজে গ্রন্থ শেলাই করিবার ব্যবস্থা ছিল না।

এইখানে বুঝিলাম মুসলমানেরা প্রথম হইতেই আধুনিক নিয়মে পুস্তক শেলাই করিতেন।

কোরান-বাঁধাই দেখিতে দেখিতে প্রাচীন মুসলমানদিগের মানচিত্র আঁকিবার প্রণালীও মনে পড়িল। আরবী মিউজিয়ামে দেখিয়াছি মক্কা ও মেদিনার পুরাতন মানচিত্র প্রাচীরে ঝুলিতেছে। এই মানচিত্রগুলি মুসলমানশিল্পীদিগের বিশেষত্ব বলিয়া বোধ হইল না। কারণ জয়পুরের অম্বরপ্রাসাদের এক গৃহের প্রাচীরে ঠিক্ এই রীতিতেই কতিপয় নগরের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। হিন্দু-শিল্পীরা প্রাচীরগাত্রে উজ্জয়িনী, পাটলি-পুত্র অযোধ্যা এবং অন্যান্য নগরের সম্পূর্ণ দৃশ্য আঁকিয়া গিয়াছেন। মক্কা ও মেদিনার মানচিত্র, অযোধ্যা, পাটলিপুত্র ইত্যাদির চিত্রের অনুরূপ। মুসলমান ও হিন্দুকারিগরগণ এক নিয়মেই জনপদসমূহের চিত্রাঙ্কন করিতেন। মধ্যযুগে ইয়োরোপের চিত্রকরগণও নগরসমূহ এই প্রণালীতেই আঁকিতেন।

চতুর্দ্দশ দিবস—যুবক মিশরের স্বাদেশিকতা

আধুনিক মিশরবাসীর নবীন উৎসাহ ও উদ্যম শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকাশিত হইতেছে। ইঁহারা নব নব অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন। এই-সমুদয় দেখিলে নব্যমিশরের জীবনস্পন্দন বুঝিতে পারা যায়। ভবিষ্যতের আশা সম্বন্ধেও ধারণা জন্মে।

কুমার ইউসুফের প্রবর্ত্তিত সুকুমার-বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিয়াছি মিশরীয় মুসলমানেরা অভাবনীয়রূপে নব নব পথে উন্নতি লাভ করিতেছে। মিশরবাসীর জাতীয় জীবনের সর্ব্বপ্রধান পরিচয় মিশর-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

এতদিন এখানে ফরাসী, জার্ম্মান, আমেরিকান্ ইত্যাদি জাতীয় পাদ্রীদের নানা বিদ্যালয়ে মিশরীয় মুসলমানেরা শিক্ষালাভ করিত। পরে সঙ্গতিপন্ন ছাত্রেরা ফরাসী, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাইত। মিশরে উচ্চতম শিক্ষালাভের কোন ব্যবস্থা ছিল না। মিশর-সরকার হইতে নিম্ন ও মধ্য বিদ্যালয় মাত্র পরিচালিত হইত।

১৯০৮ সালে মিশরের জনসাধারণ স্বকীয় চেষ্টায় উচ্চশিক্ষার অভাব দূর করিবার জন্য নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় সকল দিক হইতেই যুবক মিশরের প্রতিকৃতিস্বরূপ। প্রথমতঃ, মিশর-সরকারের ধনভাণ্ডার হইতে ইহার জন্য অল্পমাত্র সাহায্য লওয়া

হয়। কারণ মিশরের ধনী, নির্ধন, ব্যবসায়ী, জমিদার, আমীর ওমরাও সকলে সমবেত হইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিষয়ই মাতৃভাষায় শিখান হইয়া থাকে। আরবী ভাষায় উচ্চ বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থশ্রেণী যে নাই তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা আরবী ভাষার সাহায্যে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধ্যাপকেরা ফরাসী, জার্ম্মাণ বা ইংরাজী গ্রন্থ ব্যবহার করেন সত্য। কিন্তু আলোচনা, কথোপকথন, পঠনপাঠন, পরীক্ষা, সবই আরবী ভাষায় হইয়া থাকে। ফরাসী, ইংরাজী ইত্যাদি বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য ছাত্রেরা দ্বিতীয়-ভাষা ও সাহিত্য-স্বরূপ বিবেচনা করে। তৃতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ নিজ নিজ বক্তৃতা আরবী ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে বাধ্য। এই উপায়ে গত ৬।৭ বৎসরের ভিতর বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিতও হইয়াছে। চতুর্থতঃ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তকগণ প্রথম হইতেই নিজ আদর্শ অনুসারে অধ্যাপক তৈয়ারী করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১৩ সালের মধ্যে ইঁহারা ২৫ জন ছাত্র বিদেশে পাঠাইয়াছেন। পারী, বার্লিন, লণ্ডন, সুইজর্ল্যাণ্ড, ভিয়েনা, ও প্যাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঁহারা নানা বিষয় শিখিতেছেন। এই উপায়ে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মহলের সকল কেন্দ্রের সঙ্গে মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ সাধিত হইতেছে। এই ছাত্রেরা ফিরিয়া আসিলে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইবেন। ১৯২০ সালের পূর্ব্বেই এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বদেশী অধ্যাপকগণ উচ্চশিক্ষা বিতরণ করিতে থাকিবেন, আশা করা যায়। এক্ষণে ইঁহাদের সমস্ত ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনভাণ্ডার হইতে বহন করা হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা আরবী ভাষাকেই ত মুখ্য জ্ঞান করিতেছেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ফরাসী ভাষায় কেন দেখিতেছি? আপনাদের বিজ্ঞাপন-পত্র, ক্যালেণ্ডার, রিপোর্ট ইত্যাদি সকল কাগজ পত্রই ফরাসী ভাষায় লিখিয়াছেন কেন?" সম্পাদক মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আমরা এই সকল কাগজ পত্রই দুই ভাষায় প্রচার করিয়া থাকি—আরবী ও ফরাসী। আমাদের কার্য্যালয়ের হিসাবপত্র সবই আরবী ভাষায় রক্ষিত হয়। আরবী ভাষাতেই ক্যালেণ্ডারাদিও লেখা হয়। কিন্তু জগতের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিবার জন্য আমরা আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যতালিকা, শিক্ষাপ্রণালী, নিয়ম-কানুন, বিজ্ঞাপনপত্র, ক্যালেন্দার ইত্যাদি ফরাসী ভাষায়ও প্রকাশ করি।" তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা ২৫ জন ছাত্র বিদেশে পাঠাইয়াছেন, শুনিলাম। ইহারা পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন, ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, প্রাণ-বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল বিদ্যাই শিখিতেছে। কেহ জার্ম্মাণ, কেহ ইতালীয়, কেহ ফরাসী, কেহ ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিতেছে। অথচ তাঁহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আরবী ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইবে। ছাত্রদিগের সঙ্গে উচ্চতম ও দুরূহতম বিষয়েও মাতৃভাষায় আলোচনা চালাইতে হইবে। ইহারা কি এখান হইতে আরবী সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়া গিয়াছে? তাহা ত বোধ হয় না। কারণ ইহাদের বয়স দেখিতেছি ১৩ হইতে ২৫।২৬এর মধ্যে। দুই একজন মাত্র ৩০ বৎসর বয়স্ক।" সম্পাদক বলিলেন—"ইহার মধ্যে একটা রহস্য আছে। আপনি বোধ হয় কাইরো-নগরের "এল-আজার" বা মসজিদ-বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়াছেন। তাহাতে সকল জ্ঞান বিজ্ঞানই আরবী ভাষায় শিখান হয়। অবশ্য আধুনিক বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা সেখানে নাই। কিন্তু ওখানকার সেখ ও মৌলবীরা মাতৃভাষা-

নিহিত বিদ্যাসমূহে সুপণ্ডিত। আমাদের এই নব্যবিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সেই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ আছে। আমাদের ছাত্রেরা উচ্চশিক্ষিত হইয়া যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা এই মৌলবী ও সেখদিগের সঙ্গে একত্র মিলিয়া কার্য্য করিবে। নব্যশিক্ষিত যাহা লিখিবে বা বলিবে তাহা প্রাচীন সেখের ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞানের সাহায্যে প্রকাশ করা হইবে। এইরূপে প্রাচীন ও নবীনের সমবায়ের দ্বারা আরবী সাহিত্যের পারিভাষিক শব্দ, এবং বিশিষ্ট উৎকর্ষ, আধুনিক জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজী ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ আবিষ্কারসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে। ক্রমশঃ নব্যশিক্ষিতেরা আরবী সাহিত্যে পারদর্শী হইয়া উঠিবে, এবং প্রাচীন সেখেরাও আধুনিক বিদ্যায় শিক্ষিত হইতে থাকিবেন।”

তিনি এই সময়ে একজন অন্ধ ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। “এই যুবক এল-আজার বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাটাইয়াছে। এক্ষণে আমাদের নব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এতদিন সে আরব্য দর্শন-সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছে। সম্প্রতি ফরাসী শিক্ষা করিয়া ফরাসী ভাষায়ও মন্দ জ্ঞান লাভ করে নাই। এই ছাত্র যাঁহার নিকট শিখিতেছে তাঁহার সঙ্গে একত্রে একখানা আরবীগ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছে। ইহাকে এক্ষণে ফ্রান্সে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এইরূপে প্রাচীনের ও নবীনের সংযোগে আমরা নবীন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিব স্থির করিয়াছি।”

বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ-প্রতিষ্ঠা এখনও হয় নাই। একটা সুন্দর ভাড়াটিয়া গৃহে এক্ষণে কার্য্য চলিতেছে। বার জন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৫০। মুসলমান, খ্রীষ্টান, তুরকী, মিশরীয়, সুদানী, আলজিয়ার, আফগানী, হিন্দুস্থানী, পারস্যদেশবাসী, সীরিয় ইত্যাদি নানা

জাতীয় ছাত্র ইতিমধ্যেই এই শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিয়াছে। সম্প্রতি চারি বৎসর কালব্যাপী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম বৎসর ছাত্রেরা যাহা শিখে তাহার পরীক্ষা প্রথম বৎসরেই গ্রহণ করা হয়। এইরূপে ছাত্রেরা চতুর্থ বৎসরে অবশিষ্ট বিষয় মাত্রের পরীক্ষা দিয়া থাকে।

কাল নব্যমিশরের একটি উৎসাহশীল কর্ম্মকেন্দ্রে গিয়াছিলাম। উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্র, বিচারালয়ের উকীল, নগরের চিকিৎসক, এঞ্জিনীয়ার, বিচারপতি, অধ্যাপক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোক মিলিত হইয়া একটি ক্লাব স্থাপন করিয়াছেন। প্রায় ১০০০ লোক এই ক্লাবের সভ্য। বার্ষিক ১৫৲ করিয়া প্রত্যেককে চাঁদা দিতে হয়। সন্ধ্যার সময়ে ক্লাবে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একজন প্রসিদ্ধ উকীল আরবী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন। প্রায় ২০০ নবীন ও প্রবীণ লোক উপস্থিত। বক্তৃতার বিষয়—"মুসলমান আইনে উত্তরাধিকারীর স্বত্ব"। বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে ক্লাবের সম্পাদক ও কতিপয় সভ্যের সঙ্গে আলাপ হইল। সকলেই ফরাসী জানেন। ইংরাজীজানা লোকের সংখ্যাও মন্দ নয়; এই ক্লাবে মাসে তিনচারি বার করিয়া বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যাঙ্কিং, আইন ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-গণের উপদেশ প্রচারিত হয়। সাধারণতঃ আরবীতেই বক্তারা বলিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ফরাসী ভাষাতেও বক্তৃতা হয়। ক্লাবে গ্রন্থশালা এবং পাঠাগারও আছে।

ক্লাবের সঙ্গে, বলা বাহুল্য, খানা-ঘর আছে। মিশরীয়েরা খাওয়া পরা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী। মিশরের রাস্তায় ঘাটে কখনও কাহাকে অপরিষ্কার বা দীনহীন বেশে বাহির হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের বাড়ীঘরও বড় পরিপাটি। এই ক্লাবগৃহ কুমার ইউসুফের

ভূমিতে তাঁহারই অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য-হিসাবে কাইরো-নগরের অন্যান্য সৌধের সঙ্গে ইহা সমকক্ষ।

সভ্যগণের সঙ্গে মুসলমান সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের বিষয়ে ইঁহারা কিছুই জানেন না দেখিলাম। ইঁহারা বলিলেন, "আমরা সাধারণতঃ ফরাসী সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকি। ইংরাজীর তত বেশী ধার ধারি না। কিন্তু ভারতের হিন্দু-মুসলমানেরা ফরাসী জানেন না। তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত। তাহার পর আমাদের মাতৃভাষা আরবী। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা কি তাহা আমরা জানি না। কাজেই ধর্ম্মে ঐক্য থাকিলেও ভাষার পার্থক্য থাকায় আমরা পরস্পর ভাব বিনিময় করিতে পারি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম. "তাহা হইলে আপনারা জগতের মুসলমান-সমাজকে এক আদর্শে গড়িয়া তুলিতে আশা করেন কি করিয়া? প্যান-ইসলামের দীক্ষামন্ত্র আপনারা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারিতেছেন কি?"

ইঁহারা বলিলেন, "সত্য কথা, প্যান-ইস্লাম-আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মিশরে এই প্রচেষ্টার কার্য্য অতি অল্পই হইয়াছে। ইহার প্রভাব আমরা কিছুই অনুভব করি না। এমন কি তুরস্কের মুসলমানের সঙ্গেই আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। উহাদের সঙ্গে মিশরীয় চিন্তা ও কর্ম্মের আদান প্রদান অতি অল্পই হয়। পারস্য, আফ্গানিস্থান ও হিন্দুস্থানের মুসলমানদিগকে আমরা চিনি না বলিলে দোষ হয় না। ইতিহাস-গ্রন্থে পড়িয়া থাকি মাত্র যে, ঐ সকল দেশে আমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী নরনারীগণ বাস করে, এই পর্য্যন্ত। অধিকন্তু আমাদের সংবাদপত্রেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রকাশিত হয় না। মিশরে ও ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন উপায় এখন পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই।"

বড়ই বিস্ময়ের কথা, মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ আলিগড়

কলেজের সংবাদ কিছুই রাখেন না। এমন কি, ভারতীয় মুসলমানেরা যে একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছেন সে খবরও এখানে পৌঁছে নাই। এই ক্লাবের উকীল, জজ, অধ্যাপক এবং ডাক্তার-গণও আলিগড় সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ।

আধুনিক ভারতের বেশী লোক মিশরে আসিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। এখানকার শিক্ষিতমহলের নানা স্থানে ঘুরিয়া দেখিলাম নব্য-ভারতের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরগণের মধ্যে দুএকজন মাত্রের নাম ইহাঁরা শুনিয়াছেন।

বিবেকানন্দের বন্ধু স্বামী রামতীর্থ মিশরে আসিয়াছিলেন বুঝিতে পারিলাম। কাইরোর কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবান। একজনকে দেখিলাম তিনি কথায় বার্ত্তায় চালচলনে পূরাপূরি হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত। বেদান্তের উপদেশ ইহাঁর উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। দেখিলাম ইহাঁর জ্ঞান নিতান্ত অল্প নয়। আত্মতত্ত্ব বিষয়টা গভীরভাবে তলাইয়া বুঝিবার জন্য ইনি যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছেন। দুই চারিটা হিন্দুদর্শনের বুকনি মাত্র আওড়াইতে শিখিয়াছেন তাহা নহে।

মিশর-রাষ্ট্রের শিল্পবিভাগের দুইজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে পরিচিত হইলাম। ইহারা ষ্টীম-এঞ্জিন, রেলওয়ে, জলসরবরাহের কারখানা, রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করিতেছেন। মিশর-রাষ্ট্রের অনুবাদ-বিভাগে বৎসরে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হয়। অনূদিত গ্রন্থপ্রকাশের জন্যই প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা বার্ষিক খরচ হইয়া থাকে। অনুবাদ-কার্য্যের জন্য ছয়জন লোক সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন।

আজ কাইরো ত্যাগ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় চলিলাম। এই কয়দিনের মধ্যে মিশরের সঙ্গে মায়ার বন্ধন জন্মিয়া গিয়াছে, ষ্টেসনে

মিশরীয় নবীন ও প্রবীণ বন্ধুগণ দেখা করিতে আসিলেন। মিশরীয়েরা হিন্দুস্থানের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া পুলকিত হইলাম। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করা গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মনে মনে মিশরের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান চিন্তা করিতে করিতে ব-দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তস্থিত শস্যক্ষেত্র ও পল্লীগৃহ দেখিতে লাগিলাম।

কাইরো হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে খোলা হয়। সৈয়দপাশা তখন মিশরের খেদিভ ছিলেন। ইহা সময়-হিসাবে জগতের দ্বিতীয় রেলপথ। সর্ব্বপ্রথম রেলপথ বিলাতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কাইরো ছাড়িয়া মোকাওম ও লীবিয়া পর্ব্বতমালাদ্বয় আর দেখিতে পাইলাম না। পোর্টসৈয়দ হইতে কাইরো পর্য্যন্ত পথে যে সকল দৃশ্য চোখে পড়িয়াছিল ব-দ্বীপের এই পশ্চিম বাহুতে ঠিক সেইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম না। কারণ এ অঞ্চলে মরুভূমি নাই—কিন্তু পোর্টসৈয়দের পথে কিয়দংশে ধুলাবালুর প্রভাব অত্যধিক।

আলেকজান্দ্রিয়ার পথে মিশরের সাধারণ উর্ব্বর ভূমিই দৃষ্টিগোচর হইল। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ পল্লী এবং সাগর দেখা গেল। নাইলের খাল এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকাময় শস্যক্ষেত্রও এই অঞ্চলের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

ক্রমশঃ বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। দূর হইতে সমুদ্রের উপরিস্থিত নীল উন্মুক্ত আকাশ দেখিতে পাইলাম। তখনও সমুদ্র দেখা গেল না। চারিদিকে বড় বড় খেজুরগাছ এবং আখের খেত। ভূমিও যেন কিছু বেশী উর্ব্বর।

ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। বন্দর কাইরো নগরেরই অনুরূপ। পোর্টসৈয়দ অপেক্ষা বৃহত্তর সহর। ভূমধ্যসাগরের কূলে একটা ফরাসী হোটেলে আড্ডা লইলাম। গৃহ হইতে দেখা যায় যেন নীল সমুদ্র গর্জ্জন করিতে করিতে কূলবাসীকে কামড়াইতে আসিতেছে।

সন্ধ্যাকালে নগর দেখিতে বাহির হইলাম। সমস্ত সহরটাই নূতন, মহম্মদ আলির আমলে নির্ম্মিত। মুসলমান পাড়া ও বিদেশীয় টোলা দুইই নূতন। উভয়ই ১০০ বৎসরের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে।

কাইরো-নগরে প্রাচীনের স্মৃতি বিশেষরূপেই জড়িত। ওখানে প্রাচীনের পার্শ্বে নবীন মহাল্লা অবস্থিত এবং পুরাতন স্তরের উপর নূতন স্তরের বিন্যাস দেখিয়াছি। এক সঙ্গে মধ্যযুগের কথা এবং আধুনিক কালের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সমস্তই আধুনিক—সমস্তই পাশ্চাত্য ধরণের। মুসলমানী বাড়ীঘর খুব অল্প। মসজিদ্, কবর, গম্বুজ, মিনারেট ইত্যাদির সংখ্যা বেশী নয়। দেখিয়া মুসলমান রাষ্ট্রের বন্দর বা রাজধানী বলিয়া মনে হয় না।

কাইরোতে যতখানি ইউরোপ দেখিয়াছি এখানে তাহা অপেক্ষা বেশী ইউরোপ দেখিতে পাইতেছি। ইউরোপেই পদার্পণ করিয়াছি বলিতে পারি। বিলাস, ভোগ, কাফি-গৃহ, হোটেল, রাস্তাঘাট, দোকান ইত্যাদি সবই কাইরোর পাশ্চাত্য মহাল্লার সমকক্ষ, কোন অংশে হীন নয়—বরং বেশী। ইউরোপীয় জনগণের সংখ্যা অত্যধিক। কোন কোন গাড়োয়ান পর্য্যন্ত ইউরোপীয় লোক। মিশরে আছি কি নূতন কোন দেশে পদার্পণ করিয়াছি বুঝিতে সময় লাগে। কলিকাতা ও বোম্বাই দেখিয়া কাইরো এবং আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধারণা করা কঠিন।

রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও বাঁধান—তক্‌তক্ ছক্ ঝক্ করিতেছে। প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকাসমূহ পথের দুই ধারে আধুনিক রীতিতে সাজান। গৃহ-নির্ম্মাণের কৌশল আগাগোড়া পাশ্চাত্য ধরণের। সহরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড লম্বা চৌরাস্তা। কেন্দ্রস্থলে মহম্মদ আলির একটি প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। ইহা ধাতুনির্ম্মিত। অত্যুচ্চ প্রস্তরমঞ্চের উপর অবস্থিত। ফরাসী শিল্পী এই কারুকার্য্যের কর্ত্তা।

কাইরোর ন্যায় এখানেও খুব শীত পড়িয়াছে। ভূমধ্যসাগরের প্রবল বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা অনুভব করিতেছি। সকলের মুখেই শীতের কথা শুনিতে পাই। গ্রীষ্মকালে এত শীত ৩০।৪০ বৎসরের ভিতর কখনও মিশরে পড়ে নাই।

মিশরে দুই সপ্তাহ কাটাইলাম। মোটের উপর ৫০০৲ টাকা খরচ হইল। তাহা ছাড়া বোম্বাই হইতে পোর্টসৈয়দ পর্য্যন্ত ভাড়াও লাগিয়াছে। অবশ্য যদি মিশরে ৪।৫ মাস বাস করিয়া লেখাপড়া করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে এত খরচ পড়িবে না। কারণ তাহা হইলে ধীরে ধীরে সকল জিনিষ দেখা যাইতে পারিবে, সময়াভাবে তাড়াহুড়া করিতে হইবে না; তাহাতে ঘোড়ার গাড়ীর জন্য কম খরচ লাগিবে; প্রদর্শক-নিয়োগের প্রয়োজন হইবে না। অধিকন্তু বড় বড় হোটেলে না থাকিলেও চলিবে। সস্তায় বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করা অসম্ভব। কাইরোতে বাড়ী-ভাড়ার দর কলিকাতার সমান। মাসিক ৭০।৭৫৲ টাকায় মধ্যম শ্রেণীর গৃহ পাওয়া যায়। খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাইরো হইতে মফঃস্বলে যাইতে হইলে কাইরো-বাসী বন্ধুগণের সাহায্যে সেই সকল স্থানে হোটেল খুঁজিয়া লওয়া যাইবে। অধিকন্তু, মিশরীয়, ইউরোপীয় ও আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও সহজসাধ্য হইবে। কাইরোর বিদ্যালয়সমূহে, জন-নায়কগণের ভবনে এবং মিউজিয়ামদ্বয়ে দুই এক সপ্তাহ যাতায়াত করিলেই যথেষ্ট সহানুভূতি পাওয়া যাইবে। মিশরীয়েরা ভারতীয়দিগকে আনন্দের সহিতই সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

কম সময়ে বেশী দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য বড় বড় হোটেলে বাস করা আবশ্যক হইয়াছে। কারণ তাহা না হইলে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-গণের সঙ্গে আলাপ হয় না; তাঁহাদের গবেষণাপ্রণালীর পরিচয় পাওয়া

অসম্ভব হয়। এইজন্য ব্যয়ের পরিমাণ কিছু বেশী পড়িয়াছে। অবশ্য যথাসম্ভব সংযত ভাবেই খরচ করিতে চেষ্টিত ছিলাম। যদি এক্ষণে আর দুই সপ্তাহ থাকিতে চাহি, তাহা হইলে সকল দিকেই খরচ কমাইয়া লইতে পারি। রাস্তা ঘাট সব চেনা হইয়া গিয়াছে, ট্রামে যাতায়াত করিতে পারি। বন্ধুগণের গৃহ সহরের সকল ভাগেই দুই একটা পাইব। হোটেলের ম্যাথর হইতে ম্যানেজার পর্য্যন্ত ১০।১২ জনকে বক্‌শিষ দিবার যন্ত্রণা হইতেও কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইব।

মাসিক ৩০০৲ টাকা হিসাবে খরচ করিলে মিশরে একজনের চলিয়া যাইবে। এইরূপ খরচ করিয়া পাঁচ ছয় জন ভারতবাসী একত্র ৩।৪ মাস মিশরে কাটাইলে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক আলোচনার এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত হইতে পারে। যাঁহারা মিশরতত্ত্ব (Egyptology) শিক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে মিশরে আসিবেন তাঁহাদের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে এখানে না পৌঁছানই ভাল। কারণ সেপ্টেম্বর মাস হইতেই দুনিয়ার শিক্ষিত ও ধনী লোক মিশরে আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আসিতে থাকেন। অবশ্য বৎসরের সকল সময়েই পণ্ডিত ব্যক্তিগণের গমনাগমন চলিতে থাকে। তবে ঐ কয়-মাসই মিশরের বিদেশীয় "যোগ"। সুতরাং ভারতবাসীদেরও ঐ সময়েই এই বিদ্যাক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।

একসঙ্গে ৫।৬ জন আসিতে পারিলেই উপকার বেশী হয়। কেহ প্রাচীন মিশরের ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করিবেন; কেহ পুরাতন বাস্তুবিদ্যা, চিত্রাঙ্কন ও মূর্ত্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবেন এবং সেই-সমুদয়ের নকলচিত্র গ্রহণ করিবেন; দেশের কৃষিশিল্পবাণিজ্য বুঝিবার জন্যও এক-জন লাগিয়া থাকিতে পারেন। এখানকার গাছগাছড়া ধাতু মৃত্তিকা প্রস্তর নদী খাল ইত্যাদিও বৈজ্ঞানিকের বিশেষ চিন্তার বিষয়। ফলতঃ,

প্রত্নতাত্ত্বিক, চিত্রকর, ধনবিজ্ঞানবিৎ, এঞ্জিনীয়ার, কৃষিতত্ত্ববিৎ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় পণ্ডিত সমবেত হইয়া কর্ম্ম করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে। পরস্পরের সাহায্যে মিশরের প্রাচীন কথা এবং আধুনিক অবস্থা সহজে বুঝা যাইতে পারিবে। বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ও সুবিধা হইবে।

এইরূপ এক পণ্ডিত-সংঘ মিশরে আসিলে মিশর হইতে বহু মূল্যবান পদার্থ অল্প কালের ভিতর ভারতে লইয়া যাইতে পারিবেন। ভারত-বর্ষের অনেক কথাও মিশরে ছড়াইয়া পড়িবে। অধিকন্তু জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ, আমেরিকান্ ও অন্যান্য জাতীয় পণ্ডিতমহলে ভারততত্ত্ব, ও ভারতীয় বিদ্যা, অতি সহজে প্রবেশলাভ করিবে।

যাঁহারা নিজ নিজ বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাঁহাদেরই অবশ্য এখানে আসা আবশ্যক। যাঁহারা চিত্র আঁকিয়া, গ্রন্থ লিখিয়া, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়া, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যোগদান করিয়া, এবং বৈষয়িক তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন তাঁহারা না আসিলে বেশী উপকার হইবে না। জগতের পণ্ডিত-সভায় বিচরণ করিবার জন্য ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ও সাহিত্যসেবীদিগের আগমনই কর্ত্তব্য। দুই এক জনের ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। আর কাহারও আরবী ভাষা এবং সাহিত্যের সহিত পরিচয় থাকিলে মুসলমানী যুগের মিশর বুঝিতে সাহায্য হইবে। দলের মধ্যে গায়ক এবং বাদক থাকিলে মন্দ হয় না, মিশরে ভারতীয় সঙ্গীত শুনা যাইতে পারিবে। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের সর্ব্ববিধ চিত্র প্রদর্শন করিবার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন এবং স্লাইড্স্ সঙ্গে রাখাও নিতান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় পণ্ডিতসংঘের এইরূপ মিশর-অভিযানে সর্ব্ব সমেত

১২,০০০৲ টাকা লাগিতে পারে। ইহার দ্বারা ভারতের যত দিকে যত উপকার হইবে তাহার তুলনায় এই খরচ অতি সামান্য। হিন্দুস্থানের জন-নায়কগণ চেষ্টা করিলে কি মিশর-তত্ত্ব আলোচনার জন্য এক অভি-যানের ব্যয় সংগ্রহ করিতে পারেন না?

পঞ্চদশ দিবস—আলেকজাণ্ডার ও মহম্মদ আলি

মহম্মদ আলির আলেকজান্দ্রিয়া দেখিলাম। একশত বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটা প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান ছিল। মহম্মদ আলির উদ্যোগে এই স্থানে এক অতি চমৎকার নগর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে।

মুসলমানেরা সপ্তম শতাব্দীতে মিশর দখল করেন। তখনও আলেক-জান্দ্রিয়া নগরীর প্রাচীন সমৃদ্ধি কথঞ্চিৎ ছিল। কিন্তু নূতন বিজেতারা সমুদ্রকূলের বাণিজ্যকেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া কাইরোতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই সময় হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। পরে ঊনবিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগে মহম্মদ আলি ইহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্য ও প্রাধান্য পুনরায় ফিরাইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। আজ বাস্তবিকই আলেক্-জান্দ্রিয়া পৃথিবীর অন্যতম ব্যবসায়-কেন্দ্র এবং ধনসম্পদের নিকেতন।

আলেকজাণ্ডার-প্রতিষ্ঠিত নগরীর চিতাভস্মের পার্শ্বেই আধুনিক মিশরের এই বন্দর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন গ্রীক সাম্রাজ্যের এই রাষ্ট্র-কেন্দ্র সমাজ-জীবন, বিদ্যাচর্চ্চা এবং ব্যবসায়ের আধার ছিল। দিগ্বিজয়ী বীর-পুরুষ প্রাচ্য-ও-প্রতীচ্য-সম্মিলনের উপায়স্বরূপই এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার জনগণের ভাববিনিময় ও কর্ম্মবিনিময়ের উদ্দেশ্যেই আলেক্জান্দ্রিয়ার সর্ব্বপ্রথম ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল।

মিশরের সঙ্গে গ্রীসের এবং গ্রীসের সঙ্গে পারস্য ও হিন্দুস্থানের সভ্যতাগত আদান প্রদান সাধন করিয়া এই জনপদ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সমগ্র জগতের চিন্তাবীর ও সাহিত্যসেবীগণ এই নগরে মিলিত হইয়া বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞান বিতরণ করিতেন। বিদ্বৎসমিতি, সাহিত্য-সম্মিলন, বৈজ্ঞানিক-পরিষৎ ইত্যাদি চিন্তা-কেন্দ্রে নানা দেশীয় তথ্যের তুলনা সাধিত হইত। এই কেন্দ্র হইতেই ভাবস্রোত প্রবাহিত হইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে নব নব আদর্শ ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিতরণে সহায়তা করিত।

মহম্মদ আলির নগরীতে ব্যবসায়ের ঐশ্বর্য্য দেখিলাম। আলেক-জাণ্ডারের নগরী অপেক্ষা ইহার সম্পদ কোন অংশে অল্প বিবেচনা করিবার কারণ নাই। কিন্তু আধুনিক নগরীকে সভ্যতা, শিক্ষা ও চিন্তার আন্দোলনের প্রস্রবণরূপে কোন হিসাবেই বর্ণনা করা যায় না। মানবে-তিহাসে প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়াই তাহার আধুনিক উত্তরাধিকারী অপেক্ষা অধিকতর আদর ও গৌরবের যোগ্য।

খৃষ্টীয় যুগের প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আলেক্জান্দ্রিয়া ধর্ম্ম-বিপ্লবের সুফল কুফল যৎপরোনাস্তি ভোগ করিয়াছে। আলেক্জাণ্ডারের পরবর্ত্তী গ্রীক টলেমিরা পুরাতন গ্রীক-মিশরীয় ধর্ম্মেই আস্থাবান্ ছিলেন। যখন ইহা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয় তখনও পুরাতন ধর্ম্মই প্রবল ছিল। এদিকে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতে থাকে। দুই ধর্ম্মাবলম্বী জন-গণের মধ্যে বহুবার কলহ ও সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম-দ্বন্দ্বে আলেক্-জান্দ্রিয়ায় একাধিকবার লোমহর্ষণ রক্তপাত সংঘটিত হইয়াছিল। কোন সম্রাটের আমলে খৃষ্টানদিগের দুর্গতি, কোন সম্রাটের আমলে প্রাচীন-ধর্ম্মাবলম্বীগণের দুর্গতি ঘটে। পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রীকো-রোমান মিশরীয় ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা ও বিদ্যালয় চিরদিনের মত ধ্বংস করা হয়। আলেক্জাণ্ডারের কীর্ত্তি নয় শত বৎসর ধরিয়া ভৌতিক

দেহে এই স্থানে বিরাজ করিতেছিল। গোঁড়া খৃষ্টান রোমীয় সম্রাট জাষ্টিনিয়ান তাহার শেষ চিহ্ন সমূলে উৎপাটন করিলেন।

এই গেল ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। তাহার পর হইতে আলেকজান্দ্রিয়ায় "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই!" ইহার পূর্ব্ব হইতেই রোমান সম্রাটেরা তাঁহাদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলকে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিতেছিলেন। আলেক্‌জান্দ্রিয়া অপেক্ষা এই নগরের প্রতিই তাঁহাদের বেশী অনুরাগ ছিল। বিদ্যা, ব্যবসায়, ধর্ম্ম, সভ্যতা, সকল বিষয়েই কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলকে তাঁহারা বিরাট কেন্দ্রে পরিণত করিতে উৎসাহী ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের ঔদাসীন্যে আলেক্‌জান্দ্রিয়া একটা সামান্য নগর মাত্রে পরিণত হইতেছিল। চতুর্থ শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় এই অবনতির যুগ চলিয়াছিল। পরে সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানেরা মিশর দখল করেন। তখন হইতে আলেক্‌-জান্দ্রিয়ার মৃত্যুকাল। খৃষ্টান কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল এবং মুসলমান কাইরো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ইহার ধ্বংসের কারণ হইল।

প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার কোন গৃহ এক্ষণে আর দেখা যায় না। স্থানে স্থানে দিল্লী, গৌড় প্রভৃতি নগরের ধ্বংসের চিহ্নের ন্যায় নানা চিহ্ন বর্ত্তমান ভূগর্ভস্থিত কবর, মন্দির, ইট, পাথর, স্তম্ভ, প্রাচীর, মূর্ত্তি ইত্যাদি দেখিয়া টলেমিরাজগণের, রোমান সম্রাটদিগের, এবং খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী জনসমূহের জীবনকথা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায় মাত্র। কিন্তু সেই বিরাট গ্রন্থালয়, সেই মিউজিয়াম ও সেই পরিষদ-মন্দিরের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না!

আধুনিক আলেকজান্দ্রিয়ায় একজন ইতালীয় পণ্ডিতের উদ্যোগে একটি মিউজিয়াম নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সংগ্রহালয় দেখিলেই মিশরে গ্রীক ও রোমীয় জীবনযাপনপ্রণালী বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন ফ্যারাও-

দিগের ধর্ম্ম, সমাজ, শিল্প ও সভ্যতা গ্রীক ও রোমান বিজেতাদিগের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এই সংগ্রহালয়ের মূর্ত্তি, স্তম্ভ, চিত্র ইত্যাদি বস্তুসমূহ হইতে তাহার পরিষ্কার ধারণা জন্মে। মিশরীয় গ্রীক সভ্যতা এবং মিশরীয় রোমক সভ্যতার পরিচয় পাইবার পক্ষে এই মিউজিয়াম দর্শনই প্রধান সহায়।

ভারতবর্ষেও এইরূপ কতশত নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে, কত শত জনপদ লোকশূন্য হইয়াছে। মিশরের ন্যায় হিন্দুস্থানেও এক নগরের চিতাভস্মের উপর দ্বিতীয় নগরের জনগণ জীবনযাপন করিয়াছে —পূর্ব্ববর্ত্তী নগরের মৃত্তিকাস্তূপের পার্শ্বে বা উপরে নূতন নগরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে মিশরে ও ভারতে যুগে যুগে একই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিন্যাস সাধিত হইয়াছে। কাইরো ও আলেকজান্দ্রিয়ার ন্যায় ভারতে প্রাচীনস্মৃতিপূর্ণ শত শত নগর বর্ত্তমানকালে দেখিতে পাই।

কিন্তু প্রাচীন মিশরে আর আধুনিক মিশরে আকাশপাতাল পার্থক্য। হিন্দুস্থানের প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালে সেরূপ প্রভেদ নাই।

ফ্যারাওদিগের মেম্ফিস মৃত্তিকায় মিশিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মিশরের আদর্শ, চিন্তা, সমাজ, ধর্ম্ম,সবই লুপ্ত হইয়াছে। পিরামিড, মাম্মি এবং স্ফিঙক্সের গঠনকারীদিগের অস্থিমজ্জা ধূলিরূপে পরিণত হইলে মিশরে গ্রীকো-রোমান-খৃষ্টীয় আদর্শের জীবনযাত্রাপ্রণালী অবলম্বিত হইল। এই দুই ধরণের মানবসমাজের মধ্যে আদর্শগত সাম্য ও ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। আবার খৃষ্টীয় রোমান স্তরের উপর সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান প্রভাবের যুগধর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছে। এই যুগধর্ম্মের কার্য্য এখনও চলিতেছে। কিন্তু ইহার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগধর্ম্মের আদর্শগত সম্বন্ধ নাই বলিলেই চলে। মিশরের প্রাচীন, মধ্যম এবং আধুনিক স্তরসমূহ পরস্পর সম্বন্ধহীনভাবে বিন্যস্ত। প্রাচীন মিশর চিরকালের জন্ত

বিদায় গ্রহণ করিয়াছে—আধুনিক মিশর প্রাচীনের কোন নিদর্শনই বহন করে না! মেম্ফিসের জীবন উত্তরাধিকারসূত্রে কাইরোতে বিন্দুমাত্রও নামিয়া আসে নাই। মহম্মদ আলির আলেকজান্দ্রিয়ায় আলেকজান্দারের ভাবুকতা, এবং টলেমিবংশীয়দিগের আদর্শ ক্ষীণভাবেও প্রভাব বিস্তার করে না।

কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীনে ও নবীনে প্রকৃত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আধুনিক হিন্দু প্রাচীনতম আর্য্যেরই বংশধর। নব নব শক্তি হিন্দুস্থানবাসীরা অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুস্থানের নব নব স্তর পরস্পর সম্বন্ধহীন—একই ক্রমবিকশিত বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা। প্রাচীনকালে যে অনুষ্ঠানের শৈশব-অবস্থা দেখিয়াছি, তাহারই বয়োবৃদ্ধি বর্ত্তমান কালে দেখিতে পাইতেছি। মুসলমান-প্রভাবে ভারতবর্ষে মিশরের ন্যায় একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্তর বিন্যস্ত হইতে পারে নাই। মুসলমানজাতি ভারতের আদর্শকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দু নরনারীর কিয়দংশ মাত্র মাঝে মাঝে মুসলমান রাষ্ট্রের অধীন হইয়াছে—কিন্তু তাহাতেও তাহাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয় নাই। বরং নূতনধর্ম্মাবলম্বী সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুসমাজ অভিনব উপায়ে স্বকীয় বিকাশ লাভ করিয়াছে। আধুনিক কালে খৃষ্টীয় প্রভাব ভারতবর্ষে প্রবলভাবে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু তাহাও ভারতের বিশেষত্ব নষ্ট করিতে পারে নাই। বরং ভারতের সনাতনী বাণীই নবযুগের নূতন আবেষ্টনের মধ্যে অধিকতর দৃঢ়তার সহিত প্রচারিত হইতেছে। ফলতঃ প্রাচীনের সঙ্গে মধ্য যুগের, এবং মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিকের জীবন্ত সম্বন্ধ ভারতবর্ষে দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন ভারতের সমাজ, ধর্ম্ম, বিদ্যা, সাহিত্য, ও শিল্প মরে নাই। প্রাচীন ভারত বর্ত্তমানের মধ্যে এখনও জীবিত আছে—এবং ভবিষ্য ভারতের অস্থিমজ্জা সৃষ্টি করিতেছে।

ফ্যারাওদিগের মিশর মরিয়া গিয়াছে। পীরামিড-গঠনকারী মিশরের কথা আজকাল প্রেত-তত্ত্ব মাত্র। কিন্তু প্রাচীন ভারতের কথা প্রেত-তত্ত্ব নয়—মরা জিনিষের আলোচনা নয়। ইহা জীবন-তত্ত্ব। সুতরাং মামুলি প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে ভারত-শিল্প, ভারত-কলা, ভারত-সমাজ, ভারত-ধর্ম্ম, ভারত-সাহিত্য আলোচনা করিলে চলিবে না। Egyptology বা মিশর-তত্ত্ব এক্ষণে একটা বিদ্যামাত্র। কিন্তু Indology বা ভারত-তত্ত্ব কেবল অন্যতম বিদ্যামাত্ররূপে বিবেচ্য নয়। ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী জীবন ও হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ এই ভারত-তত্ত্বের সঙ্গে গ্রথিত। সুতরাং মিশর-তত্ত্ব এবং ভারত-তত্ত্ব এক শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। মরা জিনিষের আলোচনায় কাহারও কিছু আসে যায় না। কিন্তু জীবন্ত পিতামাতার সমালোচনা বড় কঠিন ব্যাপার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মিশর-তত্ত্ব আলোচনা করিতে ভালবাসিবার ইহাই অন্যতম কারণ। কিন্তু ভারত-তত্ত্বের আলোচনায় তাঁহারা বেশী উৎসাহশীল নন। প্রাচীন মিশরের গৌরব বাড়াইলে বা কমাইলে আজ কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু প্রাচীনভারতের জাতীয় গৌরব বাড়াইলে বা কমাইলে আধুনিক ভারত-বাসীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠন সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য বা বাধা জন্মিবে।

মিশর দেখা হইয়া গেল। মিশরের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়াছি। ইহার নীল আকাশ ও মুক্তবায়ুর সংস্পর্শে চিত্তের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছি। ইহার শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্র দেখিয়া চোখ জুড়াইয়াছি। যেখানে গিয়াছি সেখানেই মিশরবাসীর দৃঢ় বাহু, শক্ত শরীর, সুপষ্ট অবয়ব, প্রশস্ত বক্ষ এবং দীর্ঘ আকৃতির সংস্রবে আসিয়াছি। দরিদ্র অশিক্ষিত ফেলা কৃষক হইতে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত 'বে,' 'পাশা' পর্য্যন্ত মিশরের সকল সমাজেই স্বাস্থ্য, সামর্থ্য এবং শারীরিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। রাস্তায় বাজারে ষ্টেসনে ট্রামে কোথাও দুর্ব্বলতা, ক্ষীণতা, অস্বাস্থ্য, রোগশীলতা

দেখি নাই। মিশরের প্রাসাদসমূহ, মিশরের রাজপথ, মিশরবাসীর পোষাক পরিচ্ছদ, মিশরবাসীর আদবকায়দা, সবই উচ্চ শ্রেণীর উৎকর্ষ বিজ্ঞাপক। প্রতিপদবিক্ষেপে মিশরের অতুল ঐশ্বর্য্য ও অসীম ধনসম্পদ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রতি পদবিক্ষেপে মিশরবাসীর ভোগ-বিলাসেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অন্নহীন, বস্ত্রহীন অথবা অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট, অর্দ্ধাবসনাবৃত দরিদ্রসমাজের ন্যায় কোন লোক-শ্রেণী মিশরে আছে কিনা সন্দেহ। নিতান্ত নিঃস্ব ভিক্ষাজীবী অনাহারশীর্ণ লোক মিশরে দেখিতে পাইলাম না।

বাহ্য জীবনের সকল সৌষ্ঠবই মিশরে পাইয়াছি। ভোগের দিক হইতে মিশরে আসিলে মিশর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। এই জন্যই বোধ হয় আরবীতে প্রবাদ রটিয়াছে—নাইলের জল একবার পেটে পড়িলে আবার ফিরিয়া মিশরে আসিতে হয়। মিশর বাস্তবিকপক্ষে স্বচ্ছন্দ-জীবন যাপনের এবং সুখভোগের আবাসভূমি।

কিন্তু মিশরের এই অতুল ঐশ্বর্য্যরাশির অভ্যন্তরেও আমি সুখী হইতে পারি নাই। কারণ এই বাহ্য সৌন্দর্য্য, বাহ্য দৃঢ়তা ও বাহ্য সম্পদের পশ্চাতে গভীরতর জীবনীশক্তির পরিচয় পাইলাম না। সর্ব্বত্রই মিশর-জননীর শোকতপ্ত নিঃশ্বাস মরুভূমির অগ্নিময় বায়ুর সঙ্গে অনুভব করিয়াছি। মিশরের উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে "পর দীপশিখা নগরে নগরে, তুমি যে-তিমিরে তুমি সে-তিমিরে।" মিশরের ধনসম্পদ মিশর-বাসীর সম্পত্তি নয়—মিশরবাসীর চরিত্রের গাম্ভীর্য্য নাই—মিশরবাসী ভবিষ্যতের পানে চাহে না।

বস্তুতঃ, মিশর স্বয়ংই সমস্ত-দুনিয়ার সম্পত্তিবিশেষ। পৃথিবীর সকল জাতিই মিশরে বসিয়া নিজ নিজ স্বার্থ পুষ্ট করিতেছে। মিশরবাসীর জীবন এই অসংখ্য জাতিসমূহের পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ষড়যন্ত্রের

প্রভাবে ঐক্যহীন, কৌশলহীন, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মিশরীয় জনগণের কোন এক আদর্শ বা লক্ষ্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। অন্যান্য জাতিরা মিশরবাসীর শিক্ষা, দীক্ষা, রাষ্ট্র, সমাজ ও চিন্তাপ্রণালীকে যে আকার দিতে চাহিতেছে প্রায় সেইরূপই সাধিত হইতেছে। এই কারণে মিশরে বসিয়া মিশরাত্মাকে পাইলাম না—অন্যান্য জাতিগণের ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাইলাম মাত্র। মিশরের এই বারোয়ারীতলায় ফরাসীর, ইংরেজের, গ্রীকের, জার্ম্মাণের আমেরিকানের, রুশের, তুরস্কের, সকলেরই গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছি। এই ঘোরতর তাণ্ডব ও বেসুর বেতাল নৃত্যগীতের মধ্যে খাঁটি মিশরবাসীর সুর অতি ক্ষীণকণ্ঠে প্রচারিত হইতেছে কিনা সন্দেহ। তাহা বুঝিতে হইলে অতি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পাকা সমজদার হওয়া আবশ্যক।

১৫শ।